লালবিহারী স্বীকার করিয়াছেন যে, "Babu Bankim Chandra Chatterjee is not only the most considerable but decidedly the best of the Bengalee novelists," কিন্তু গল্পাংশে যে অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছে এবং দোষহীনা কুন্দের উপর গ্রন্থকার যে অবিচার করিয়াছেন (Poetical Justice করেন নাই) তজ্জন্য গ্রন্থখানি যে নির্দোষ হয় নাই তাহাই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে লালবিহারী বাঙলা পুস্তকের সমালোচনা করিতেন। শুনা যায়, তিনি 'রিভিউয়ে' দীনবন্ধুর পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন এবং তাহাই নাকি দীনবন্ধুর ভোঁতারাম ভাট চরিত্রাঙ্কণের কারণ। কিন্তু দীনবন্ধু তদীয় 'সুরধুনী কাব্যে' লালবিহারীর প্রতিভার প্রশংসা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ডফ-স্মৃতি

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী Recollections of Alexander Duff বা 'ডফস্মৃতি' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথা অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাঙলার উপকথা

১৮৮১ লালবিহারী পঞ্জাব গাথার সঙ্কলয়িতা কাপ্তেন রিচার্ড কার্ন্যাক টেম্পলের উৎসাহে Folk Tales of Bengal নামে বাঙলার উপকথা সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি বোধ হয় লালবিহারীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক এবং তাঁহার স্মৃতি চিরদিন বঙ্গদেশে উজ্জ্বল রাখিবে। বাস্তবিক বিদেশীয় ভাষায় বাঙালি শিশুর শৈশব-স্বপ্ন-কথা যে এরূপ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পারে ইঁহা অনেকেরই কল্পনারও অতীত। এই পুস্তকখানি সর্বত্র যথোচিত সমাদরপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ইহার বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইবামাত্র নিঃশেষিত হইয়াছে।

লালবিহারীর পাণ্ডিত্য

লালবিহারী আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি কলেজের উচ্চতম শ্রেণী সমূহে ইংরাজী সাহিত্য ও প্রতীচ্য দর্শন শিক্ষা দিতেন। ঐ বিষয়ে তিনি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষাজ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক রো এবং ওয়েব্

সূচি

চিত্রসূচি

মন্মথনাথ ঘোষ

কাশীপ্রসাদ ঘোষ

কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ

যমুনা

(শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী)

শুন লো যমুনে অয়ি বরাননে,
কেন আর তুমি হাসনা?
কেন নাহি শুনি, কুলু কুলু, ধ্বনি,
কেন প্রেম গীতি গাহনা।।
তব তীরে আর কেন রাধিকার,
মানময়ী মুখ হেরিনা।
(শ্যাম) বসি পদতলে চূড়া বাঁশী ফেলে,
করিত কতই সাধনা।।
আসি গোপবালা নাহি করে খেলা
নাহি দেয় প্রেম চালিয়ে।
ধেনুগণ হায়, গোঠে নাহি যায়,
সেরূপ নাচিয়ে নাচিয়ে।।
মধু লভিবারে, আলি নাহি ফিরে,
কোকিল কুজন করেনা।
বসন্ত পবন, নাহি হরে মন,
ফুলবালা প্রেম ঢালেনা।।
মুরলীর তান, হরেনা পরাণ,
রাধা রাধা রবে বাজে না।
মুদিতা নয়নে, বিষাদিতা মনে
তাই কি লো, আছ বিমনা।।
যার প্রেম লয়ে, গরবে মাতিয়ে,
উথলে হৃদয় নাচিতে।
যার পরশনে, সার্থক জীবনে,
মধুর লহরী তুলিতে।।

সেই শ্যামরায়, কাঁদায়ে তোমায়
গেছে চিরতরে চলিয়ে।
কেন মিছে আর, ফেল আঁখি ধার,
পাবেনা সে দিন ফিরিয়ে।।
তোমারি মতন, বিগত জীবন,
ছিল লো, আমার যমুনা
সেই স্মৃতি লয়ে, হৃদয়ে আঁকিয়ে
দিবা নিশি থাকি মগনা।।

উপক্রমণিকা

আমাদের দেশে একটি বচন প্রচলিত আছে,—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।।

বাস্তবিক কামক্রোধাদি পশুবৃত্তির অধীন অসংখ্য জনগণের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি অতি দুর্লভ, প্রকৃত বিদ্বান তদপেক্ষা দুর্লভ। পরন্তু যে কবিত্ব শক্তির দ্বারা একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ অপূর্ব সৌন্দর্য ও আনন্দের রাজ্য সৃজিত করিয়া জনসাধারণকে তাহা উপভোগ করাইতে পারেন,—যে প্রতিভার দ্বারা তিনি জনসাধারণের চিন্তা ও ভাবরাজ্যে কল্যাণকর প্রভাব বিস্তারিত করিয়া তাহাদিগের মানসিক উন্নতি সংসাধিত করিতে পারেন—সেইরূপ কবিত্ব-শক্তি ও প্রতিভার অধিকারী প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। গত শতাব্দীতে আমাদের রত্নপ্রসবিনী বাঙলায় এইরূপ এক জন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি ঐশ্বর্যের মধ্যে পালিত হইয়াও বিলাসিতার পুষ্পাস্তৃত পন্থা পরিহার পূর্বক দেশচর্যার বন্ধুর পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন—নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে সমাজ ও স্বজাতির সেবা করিয়া দেশবাসীকে তাঁহার মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল আদর্শ প্রদান করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বরণীয় ব্যক্তির বিদ্যার বিমল বিভায় সমগ্র বঙ্গদেশ এক দিন গৌরবে উজ্জ্বল হইয়াছিল, এই প্রখ্যাতনামা কবির ধর্ম ও প্রীতিগীতি একদিন বঙ্গবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া অপূর্ব আনন্দ-রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল—এই চিরস্মরণীয় বাঙ্গালীর প্রতিভা কেবল তাঁহার দেশবাসীর নহে, ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসন্[১], হেনরি মেরিডিথ পার্কার[২], রবার্ট হ্যান্ডেল্ রাট্রে[৩], হেন্‌রি টরেন্স[৪], রেভারেণ্ড ডাক্তার আডাম্[৫], কাপ্তেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন[৬], হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান্ ডিরোজিও[৭], কুমারী এমা রবার্টস[৮], প্রভৃতি বিদেশীয় বাণীসন্তানগণের নিকট হইতে প্রীতিরও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এবং বিদ্যোৎসাহী গভর্নর-জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড[৯] ও তাঁহার বিদুষী সহোদরা মাননীয়া

কুমারী এমিলি ইডেনের[১০] প্রশংসার যশোমাল্য আর্জিত করিয়া বাঙালির জাতীয় গৌরব-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছিল। 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার পত্রের প্রবর্তক ও সুযোগ্য সম্পাদক, 'শায়ের' ও 'গীতাবলী'র প্রতিভাবান্ কবি, কাশীপ্রসাদ ঘোষের চরিত-কথা কীর্তনের জন্য সুদীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন নাই।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

হাবড়ার নিকটবর্তী পৈতাল গ্রামে রামনিধি ঘোষ নামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র তুলসীরাম ঢাকা নগরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিমকের কুঠীতে খাজাঞ্চীর কার্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জিত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠীর কার্য বন্ধ হইলে "দেওয়ান" তুলসীরাম কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় শ্যামবাজারে এক সুবৃহৎ বাটী নির্মিত করিয়া সপরিবারে তথায় আসিয়া বাস করেন। তুলসীরাম অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি বারাণসীধামে একটি শিবমন্দির ও ঢাকায় একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

তুলসীরামের দুই পুত্র—শিবপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ। শিবপ্রসাদের দুই পত্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠার গর্ভে স্বনামধন্য কাশীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠার গর্ভে কৈলাসনাথ, তারকনাথ ও শম্ভুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১২১৬ বঙ্গাব্দে ২২ শ্রাবণ দিবসে (৫ আগস্ট ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ) খিদিরপুরে তাঁহার মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্বাধিকারী মহাশয়ের ভবনে কাশীপ্রসাদ অকালে (সপ্তম মাসে) ভূমিষ্ঠ হয়েন। শৈশবে কাশীপ্রসাদ মাতুলালয়ে স্নেহে প্রতিপালিত হন।

শিক্ষা

বাল্যে কাশীপ্রসাদ তাৎকালীন রীত্যনুসারে বাঙলা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন। তখন ইংরাজী শিক্ষার এত সুবিধা ও সুযোগ ছিল না। তখন ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ বঙ্গবাসীকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত কিছুমাত্র উৎসুক ছিলেন না। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন দূরদর্শী বাঙালির অর্থে ও চেষ্টায় এবং ডেভিড হেয়ার ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যর হাইড ঈস্ট মহোদয়ের সহযোগিতায় ইংরাজী ভাষায় বাঙালিকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশীপ্রসাদ এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ইংরাজী শিক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার মাতামহ জামাতাকে অনুরোধ করিয়া হিন্দু কলেজে তিনশত টাকা জমা দেওয়ান। এই টাকা জমা দেওয়াতে

কাশীপ্রসাদ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ৮ অক্টোবর কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে অবৈতনিক ছাত্ররূপে গৃহীত হন।

বিদ্যালয়ে কাশীপ্রসাদ অসাধারণ অধ্যবসায়, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অপূর্ব মেধার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তিন বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই শ্রেণীতে তিনি কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারী তারিখে উচ্চ প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। বিদ্যালয়ে তিনি প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম পুরস্কার লাভ করিতেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের পরিদর্শক সুপণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন্ প্রথম শ্রেণীর বালকগণকে ইংরাজীতে পদ্য রচনার চেষ্টা করিতে বলেন। ছাত্রগণের মধ্যে একমাত্র কাশীপ্রসাদই ইংরাজী পদ্যরচনায় কৃতকার্য এবং ডাক্তার উইলসনের প্রশংসাভাজন হয়েন।

প্রথম ইংরাজী কবিতা রচনা

কাশীপ্রসাদের প্রথম ইংরাজী কবিতা "The young poet's first attempt" এই বৎসর আগস্ট মাসে লিখিত হয় ; কিন্তু উহা তাঁহার মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যালয়ে লিখিত কবিতার মধ্যে "Hope" নামক একটি কবিতা তাঁহার মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে কাশীপ্রসাদ ইংরাজী ভাষায় কিরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা সেই কবিতাটি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মিলের ভারতেতিহাস সমালোচনা

এই সময়ে বার্ষিক পরীক্ষার কিছু পূর্বে রচনার পরীক্ষা স্বরূপ ছাত্রগণকে একখানি ইংরাজী পুস্তকের সমালোচনা করিতে বলা হয়। কাশীপ্রসাদ জেম্‌স মিল বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ ভারতেতিহাসের প্রথম চারি অধ্যায়ের ভ্রম প্রদর্শন পূর্বক যে সুন্দর যুক্তিপূর্ণ ও নির্ভীক সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া সকলেই এই বালকের প্রতিভার যথোচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী দিবসে বড়লাট বাহাদুরের প্রাসাদে পুরস্কারবিতরণসভায় লর্ড আমহার্ষ্টের সম্মুখে কাশীপ্রসাদের প্রবন্ধটি পঠিত হয় এবং উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত হয়। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ ১৪ ফেব্রুয়ারী তারিখের গভর্ণমেণ্ট গেজেটে এবং পরে লণ্ডনে প্রকাশিত "Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependencies" নামক তৎকালপ্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রের সেপ্টেম্বর-সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। শেষোক্ত পত্রিকার ইংরাজ সম্পাদক উহা প্রকাশিত করিবার সময় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার মর্ম এই ·

"যখন মিস্টার মিল্ তাঁহার বৃটিশ ভারতের ইতিহাস' প্রণয়ন করেন তখন বোধ হয় তাঁহার মনে এরূপ কল্পনারও উদয় হয় নাই যে ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত এবং গভীর ও সর্বশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য জ্ঞানের অধিকারী একজন হিন্দু কর্তৃক তাঁহার গ্রন্থ সূক্ষ্মভাবে সমালোচিত হইবে এবং আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই এত শীঘ্র এরূপ প্রয়াস দেখিয়া নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইবেন। ইঙ্গ-হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাই প্রধানত এই দেশবাসীগণের এই অকস্মাৎ মানসিক উদ্দীপ্তির কারণ এবং আমরা সময়ে সময়ে এই ছাত্রদিগের রচনাদির যে নমুনা দিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে নিয়মিতরূপে এবং আগ্রহসহকারে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিয়া ইহাদের মানসিক উন্নতিসাধন করা কত সহজসাধ্য। পূর্বোক্ত সমালোচকের নাম কাশীনাথ ঘোষ এবং নিম্নে মিলের ইতিহাসের কিয়দংশের যে সমালোচনার সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইল তাহা তাঁহারই রচিত। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় বাইশ বৎসর এবং তিনি কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র।"

এই পত্রে হিন্দু কলেজের পুরস্কার-বিতরণ সভার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, বড়লাট-প্রাসাদে পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি ছাত্রগণ ইংরাজী গদ্যপদ্যের আবৃত্তি ও ইংরাজী সুপ্রসিদ্ধ নাটকাদির অভিনয় করিয়াছিলেন। কাশীপ্রসাদ সেক্সপীয়রের Merchant of Venice নামক সুবিখ্যাত নাটকের অভিনয়ে শাইলকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন।

কাশীপ্রসাদের প্রতিভাই সর্বপ্রথমে তখনকার সহৃদয় ইংরাজসমাজে বাঙালি জাতির অপূর্ব মানসিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া ভারতহিতৈষী ইংরাজগণকে এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহিত করিয়াছিল। ফলে অতি অল্প কালের মধ্যেই এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তৃত ও অপগত-গৌরব বাঙলার শ্মশানক্ষেত্র নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছিল। প্রতীচ্য জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকরশ্মিপাতে বাঙালি প্রতিভার অসংখ্য পারিজাত প্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। রামগোপাল, কৃষ্ণমোহন, প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল, হরিশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, প্রসন্নকুমার, রমানাথ, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি মনীষীগণ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশে এক নবজীবনের সঞ্চার করিয়া বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ছাত্রজীবন-সম্বন্ধীয় একটি গল্প

কাশীপ্রসাদের সাহিত্য ও দেশসেবার পরিচয় প্রদানের পূর্বে আমরা স্বর্গীয় ধর্মানন্দ মহাভারতী কর্তৃক লিপিবদ্ধ কাশীপ্রসাদের ছাত্রজীবন সম্বন্ধীয় একটি গল্প উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার গুরুপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিব।

'কাশীপ্রসাদ একদিন কলেজ হইতে মাতামহের বাটীতে আসিয়া নির্জনে কি চিন্তা করিতেছেন ; এমন সময়ে তাঁহার মাতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাশী তুমি কলেজে যাইতেছ, সাহেব মাস্টারেরা তোমাকে ভালবাসিতেছে তো?" বালক কাশীপ্রসাদ মৃদুমধুর হাস্য করিয়া উত্তর দিল,—"মাস্টারেরা এখনও আমাকে ভালবাসিতে শিখেন নাই। কিন্তু কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা আমি সত্বরে তাহাদিগকে শিক্ষা দিব।" প্রবৃদ্ধা মাতামহী হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি বালক, কেমন করিয়া সেই প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ বৃদ্ধদিগকে শিক্ষা দিবে?" বালক কিছুই উত্তর দিল না। কিছুকাল পরে মেধাবী কাশীপ্রসাদ যখন কলেজের সমুদায় বালককে পরাস্ত করিয়া উঠিল, যখন সাহেব মাস্টারেরা বুঝিতে পারিলেন, কাশীপ্রসাদ একজন সামান্য বালক নহে, তখন একদিন কাশীপ্রসাদের সুকোমাল শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"কাশী! আমরা তোমার শিক্ষক (গুরু), তুমি আমাদের ছাত্র (শিষ্য), অদ্য হইতে তোমার সহিত আমাদের গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ঘনীভূত হইল। আমরা ভালবাসি না বলিয়া তুমি আক্ষেপ করিয়াছ শুনিয়াছি, কিন্তু আজিকার দিবস হইতে তদ্রূপ আক্ষেপের আর কোনও কারণ রহিল না।" কাশী কহিলেন,—"গুরু শিষ্যের সম্পর্ক খুব গুরুতর হইলেও তাহা উচ্চ অঙ্গের স্নেহের পরিচায়ক নহে ; উচ্চ অঙ্গের স্নেহের পরিচায়ক হইলেও তাহা প্রকৃত প্রেমের পরিচায়ক নহে। স্নেহ হইতে প্রেম অনেক প্রভেদ।" সাহেব মাস্টারেরা এই গুরুতর দার্শনিক (Philosophic) কথার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া নীরবে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে, এক দিবস মধ্যাহ্নে কাশীপ্রসাদ কলেজে যাইতেছেন। পথিমধ্যে শুনিলেন,—"অদ্য কলেজ বন্ধ! প্রিন্সিপাল সাহেব ভয়ানক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায়বৎ শয্যাশায়ী হইয়া আছেন, দুই চারি জন ইউরোপীয় অধ্যাপক তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে গিয়া কলেরা রোগে ধরাশায়ী হইয়াছেন।" অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রিন্সিপালের বাসাবাটীতে কাশীপ্রসাদ গমন করিলেন। তথায় সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের নিষ্ঠীবন, পুরীষ, ন্যাক্কার, মূত্রাদি প্রভৃতি স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। রজনী প্রভাত হইলে, প্রিন্সিপাল এবং অধ্যাপকেরা রোগমুক্ত হইয়া যখন জানিতে পারিলেন, ছাত্র কাশীপ্রসাদের অনবরত চেষ্টায় এবং সেবা শুশ্রূষায় তাঁহাদের জীবন-রক্ষা হইয়াছে, তাঁহারা কাশীর মস্তকে হস্ত অর্পণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত কহিলেন,—"কাশী ! অদ্য হইতে আমাদের সহিত তোমার পিতাপুত্রের সম্পর্ক আরম্ভ হইল। ধরাধামে আমরা যত দিবস জীবিত থাকিব, তত দিবস পর্যন্ত তোমাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতে থাকিব এবং তোমার কল্যাণার্থ সমস্ত প্রাণের সহিত যত্ন করিব।" কাশীপ্রসাদ এই বলিয়া উত্তর দিলেন,—"মহাশয়গণ! পিতাপুত্রের সম্পর্ক খুব পবিত্র, কিন্তু এরূপ পবিত্র সম্পর্কেও যথার্থ প্রেম ঘনীভূত হয় না।" কাশীর কথায় তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া গেলেন, কিন্তু সে কথার কোনও

উত্তর দিলেন না। কলেজ পরিত্যাগের সময়, কাশীপ্রসাদ যখন তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন সাহেবেরা বলিয়াছিলেন, "কাশীবাবু ! এখন তুমি আমাদের আর ছাত্র নহ, এখন তুমি আমাদের সখা, আমাদের পারস্পরিক বন্ধুতা যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে" মৃদু-মধুর হাসিয়া কাশীপ্রসাদ কহিলেন,—"প্রভো ! বুঝিলাম এতদিনে আমাদের প্রেম প্রকৃত রূপে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। সখাভাবই প্রকৃত প্রেমের ভাব ; মনুষ্যের পারস্পরিক সখ্যতা পরিণামে ঐশ্বরিক সখ্যতার কারণ হইয়া উঠে।" কথা শুনিয়া অধ্যাপকদিগকে প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন,—"কাশীপ্রসাদের এই কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত"। সুপ্রসিদ্ধ ডেভিড হেয়ার বলিয়াছিলেন,—

"The spiritual sermon which Babu Kashi Pershad preached on that day appealed to my heart. I do not remember to have heard any such thrillingly eloquent and soul-stirring sermon from any Hindoo, not even from any Christian of Calcutta."*

সাহিত্য ও দেশ সেবা

কাশীপ্রসাদ অত্যন্ত স্বাধীনপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালি গভর্নমেন্টের অধীনে চাকুরীগ্রহণ করিলে যথাসম্ভব উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই করুণাদৃষ্টি থাকায় স্বাধীনপ্রকৃতির কাশীপ্রসাদের চাকুরীগ্রহণের প্রয়োজনও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। সুতরাং বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর দেশসেবা ও সাহিত্যসেবা তিনি তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া নির্ধারিত করিলেন।

ইংরাজী প্রবন্ধ ও কাব্যাদি

কাশীপ্রসাদের ইংরাজী সাহিত্য সাধনার প্রথম ফল, পুরাতন ইঙ্গ-ভারতীয় সাময়িক পত্রাদির আবর্জনার মধ্যে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'বেঙ্গল হরকরা' 'জন বুল,' লিটারারি গেজেট,' 'বেঙ্গল আনুয়্যাল' প্রভৃতি ইংরাজী সাময়িক পত্রে তাঁহার যে অসংখ্য প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল এ পর্যন্ত তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা হয় না। বোধ হয় এক্ষণে সে চেষ্টা অসম্ভব। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে Memoirs of Indian Dynasties নাম দিয়া তিনি গোয়ালিয়রের সিন্ধীয় বংশ, লক্ষ্ণৌয়ের নবাব বংশ, ইন্দোরের হোলকার বংশ, বরোদার গাইকোয়ার বংশ, নাগপুরের ভোঁসলা বংশ ও ভূপালের নবাব বংশের যে ইতিহাস প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। এই

গ্রন্থে তিনি স্বীয় নাম গোপন রাখিয়াছিলেন। প্রবন্ধগুলি প্রথমে ডি, এল, রিচার্ডসন সম্পাদিত Literary Gazette -এ প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল এই প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"Bristling with facts, some of which he had collected after considerable pain, industry and research and containing fair and accurate delineations of scenes and characters, these papers were highly appreciated by Indian critics."

এতদ্ব্যতীত কাশীপ্রসাদ রণজিৎ সিংহ ও অযোধ্যার নবাবেরও সংক্ষিপ্ত চরিত কথা লিখিয়াছিলেন। ডি, এল, রিচার্ডসনের "A treatise on flowers and flower-gardens" নামক পুস্তকের শেষভাগে দেশীয় ফুলের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কাশীপ্রসাদেরই সঙ্কলিত। "The Vision" নামে একটি উপন্যাস এবং On Bengalee poetry ও On Bengaliee Works and Writers নামে দুইটি প্রস্তাবও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত পুস্তকখানিতে ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় কবিগণের কাব্যাদি সমালোচিত হইয়াছিল। সমালোচন প্রসঙ্গে তিনি স্থানে স্থানে বাঙলার উদ্ধৃত অংশগুলির যে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর।

'শায়ের' ও অন্যান্য কবিতা

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে Shair and other Poems নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সহিত কাশীপ্রসাদের যশঃবিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই গ্রন্থখানি চিরস্মরণীয় গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নামে উৎসৃষ্ট হয়।

এই গ্রন্থে 'শায়ের' নামে একটি সুদীর্ঘ কাব্য, Hindu Festivals বা হিন্দুপর্বদিন নামে একটি কাব্য এবং কয়েকটি খণ্ডকবিতা আছে।

> শায়ের
>
> শায়ের কাব্যে একটি সন্ন্যাসী গায়কের (কবির) করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভূমিকায় কাশীপ্রসাদ লিখিয়াছেন যে, প্রথমে তিনি এই নাম 'Minstrel' রাখিয়াছিলেন কিন্তু উহা Beattie প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের উক্ত নামধেয় কাব্যের অনুকরণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় উহার নাম পরিবর্তিত করিয়া ঐ অর্থবাচক পারসীক শব্দে উহার নামকরণ করেন। পারসীক নাম দিবার তাৎপর্য এই যে, এই গ্রন্থের করুণকাহিনী হাসান নামক এক মুসলমান কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কাব্যের নায়ককে তাঁহার 'শায়ের' (কবি) বলিয়া অভিহিত করাই সঙ্গত।

'শায়ের' কাব্যখানি তিন সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গ ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইল্‌সন, দ্বিতীয় সর্গ জেম্‌স ইয়ং এবং তৃতীয় সর্গ হেনরী মেরেডিথ পার্কারের নামে উৎসৃষ্ট হয়। এই কাব্যের মঙ্গলাচরণটি অতি সুন্দর। উহার কিয়দংশের ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"প্রিয় মোর স্বদেশের বীণা!
ভারতের অতীত গৌরব!
সুমধুর সঙ্গীত যাহার,
আজি হায় হ'য়েছে নীরব!
একবার দেহ মোরে ওগো
স্পর্শিতে তোমার স্বর্ণতার
মুগ্ধকর সঙ্গীতের মধু
অঙ্গে অঙ্গে বিজড়িত যা'র।
প্রতিভার বরপুত্র কত,
তাহাদের মোহন পরশে
সুখসুপ্ত মাধুরী তোমার,
জাগাইয়া তুলিত হরষে ;
যদিও বিগত সেই দিন,
ব্যর্থ নহে এ প্রয়াস মম,
ক্ষুদ্র শক্তি এই করে যদি,
জাগি উঠে সুর ক্ষীণতম।"

এই কাব্যের স্থানে স্থানে এরূপ সুন্দর স্বভাববর্ণনা আছে যে, তাহা পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। উহার আদ্যোপান্ত অসাধারণ কবিত্ব ও ভাবুকতায় পূর্ণ।

হিন্দু পর্বদিন

'হিন্দু পর্বদিন' (Hindu Festivals) নামক কাব্যে দশহরা, রাসযাত্রা, কার্তিকপূজা, জন্মাষ্টমী, শ্রীপঞ্চমী, দুর্গাপূজা, দোলযাত্রা, কোজাগর পূর্ণিমা, ঝুলন যাত্রা, কালীপূজা ও অক্ষয় তৃতীয়া এই এগারটি হিন্দু পর্বের ইতিহাস ও উৎসব বর্ণিত হইয়াছে। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, এক দিন কোন বন্ধুর সহিত তাঁহার কবিতাবলী প্রকাশ সম্বন্ধে কথোপকথন হয়। এই বন্ধু তাঁহাকে জাতীয় বিষয় লইয়া জাতীয় ভাবপূর্ণ একখানি কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করেন। অন্য কোনও উপযুক্ত বিষয় মনে উদিত না হওয়ায়,

তিনি ডি, এল, রিচার্ডসনের Calcutta Literary Gazette-এ লিখিতে প্রতিশ্রুত হিন্দু পর্ব্বদিনের বিবরণ বিশিষ্ট কয়েকটি খণ্ড কবিতা রচনা করেন এবং উক্ত পত্রে প্রকাশিত করেন। এইগুলিই পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিতাকারে 'শায়ের' কাব্যের সহিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

খণ্ড কবিতা

তাঁহার কাব্য গ্রন্থে যে খণ্ড কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি ভাষার মনোহারিত্বে, ভাবের মাধুর্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে অননুকরণীয়। তাঁহার রচিত বাঙালি মাঝিদিগের 'সারিগান' বা গঙ্গা স্তোত্রটি এত সুন্দর যে, সুপ্রসিদ্ধ কবি ডি, এল, রিচার্ডসন বঙ্গীয় ছাত্রগণের আদর্শ কাব্য ব্যবহারার্থ সর্বোৎকৃষ্ট ইংরাজ কবিগণের আদর্শ কাব্য গ্রন্থাদির যে সংগ্রহপুস্তক সঙ্কলিত করিয়াছিলেন তাহাতে তরুণ বাঙালি কবি কাশীপ্রসাদের এই কবিতাটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। আমরা উহার ভাবানুবাদ নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম।—

নাবিকগণের গঙ্গা-স্তোত্র

সোনার নদি! সোনার নদি! উজল তোমাব বুকে
নেচে নেচে তবী মোদের চল্‌ছে কেমন সুখে।
সৌন্দর্য্যেরি গর্বভরে ভাসে মোদেব তরী ;
(যেন) পুষ্পরাগের আকাশমাঝে সাদা-পাখা পরী

সোনার নদি! সোনার নদি! শান্ত তোমার জলে,
মন্দ মন্দ শীতল সমীর সুধারধারা চলে,
তোমার বিশাল হৃদয়খানি স্বচ্ছ কাচের প্রায়
স্বভাব-বাণী দেহের শোভা দেখেন আসি তায়।
সোনার নদি! সোনার নদি! তোমাব স্রোতের পাশে
শীতল প্রবালকক্ষে রবি নামেন বিরাম আশে
উষায় আবার উদিত হ'য়ে কিবণ-কিবীট শিরে
বশ্মিজালে উজল করে দিবেন আকাশ ঘিরে।

সোণার নদি! সোণার নদি! সূর্য্য-কিরণ দল
তোমার শান্ত সলিলস্রোতে করছে রক্তোজ্জ্বল
নিম্নে তোমার সলিলরাশি কি সঙ্গীতে চলে !
উর্মিগুলি বক্ষে তব কি উচ্ছ্বাসে ঝলে !
সোনার নদি! সোনার নদি! আসছে সুধাকর
স্নিগ্ধ কিরণ উদ্ভাসিত আনন-মনোহর

কত কোটি গ্রহ তারা তোমারি পাশে যা'বে
অপ্সরা কিন্নর সবে তোমার গীত গা'বে।
সোনার নদি! সোনার নদি! সাঙ্গ মোদের পথ
মোদের ক্ষুদ্র গাঁয়ে মোরা এলাম নিরাপদ
নয়ন অন্তরালে ডুবে গেলেন দিবাকর
গঙ্গাদেবি! বিদায় আজি, আমরা যা'ব ঘর।

কাপ্তেন রিচার্ডসন কাশীপ্রসাদের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"Let some of those narrow-minded persons who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant and vulgar contempt read this little poem with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign language, but even in their own."

এই কবিতাটি তৎকালে ইংলণ্ডের বহু সাময়িক পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Fisher's Drawing Room Scprah Book নামক সুপ্রসিদ্ধ চিত্রপুস্তকে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত 'Indian Bard' বা 'ভারতের কবি' কাশীপ্রসাদের কার্তিক-বিনিন্দিত সুন্দর মূর্তির প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তক তৎকালে সকল সম্ভ্রান্ত ইংরাজের ড্রয়িং রুমে বা বৈঠকখানায় দেখা যাইত। কুমারী জে, ড্রমণ্ড কর্তৃক অঙ্কিত কাশীপ্রসাদের প্রতিকৃতির ষ্টীল এনগ্রেভিং আরও অনেক ইংরাজী চিত্রপুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল। কম্যাণ্ডার রবার্ট এলিয়ট কর্তৃক প্রণীত Views in India, China and on the Shores of the Red Sea নামক চিত্রগ্রন্থেও কাশীপ্রসাদের এই প্রতিকৃতি এবং বিদুষী ইংরাজকুমারী এমা রবার্টস কর্তৃক লিখিত ভারত-গৌরব কাশীপ্রসাদের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। কুমারী রবার্টসের লিখিত 'সংক্ষিপ্ত পরিচয়' হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব :—

"ইংরাজী সাহিত্য রসাস্বাদনে কাশীপ্রসাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং তিনি এই সময়েই কলিকাতার সাময়িক পত্রাদির অন্যতম লেখক হন। তিনি বাঙলায় সঙ্গীতাদি রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ রচনাই ইংরাজী ভাষায় লিখিত। তাঁহার ইংরাজী রচনাদি এরূপ ওজস্বিতা প্রসাদগুণ ও সচ্ছন্দগতি বিশিষ্ট যে বিদেশীয় ভাষায় কবিতা রচনা কিরূপ দুরূহ তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার রচনা দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন। কলিকাতার সাময়িক-পত্রাদি এই তরুণকবির কাব্যাদির যে উচ্চ প্রশংসা করেন তাহার ফলে 'শায়ের' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'শায়ের' সন্ন্যাসী গায়কের হিন্দুস্থানী প্রতিশব্দ। এই গ্রন্থই গ্রন্থকর্তাকে ভারতবর্ষে সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করে। ইংলণ্ডেও এই গ্রন্থের খুব আদর হইয়াছে। যেরূপ প্রতিকূল অবস্থায় এই কাব্য রচিত হইয়াছে, যে স্থানের আচার, ব্যবহার, ধর্মমত ও চিন্তাপ্রণালী আমাদের

সহিত সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন এরূপ সুদূর বিদেশের অধিবাসীর পক্ষে ইংরাজ কবিগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যেরূপ দুঃসাধ্য, তাহা বিস্মরণ হইলেও 'শায়ের' কাব্য চিরদিন সমাদরণীয় থাকিবে। ইংরাজী পাঠকগণের সমাদর লাভের জন্য কাশীপ্রসাদের যে সকল দাবি আছে, স্থানাভাব বশত তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান অসম্ভব। 'নাবিকগণের গঙ্গাস্তোত্র' নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি এরূপ উদ্দাম প্রাচ্যভাবসম্পদে সমৃদ্ধ যে এই তরুণ হিন্দুর কাব্যের পরিচয় দিবার জন্য অনেকেই উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে বোধ হয় এইটিই সর্বাপেক্ষা সুন্দর।"

সুকবি রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার চতুর্দশপদাবলীতে কাশীপ্রসাদের বিষয়ে লিখিয়াছেন :—

"ব্রিটনীয় ভাষা শিখি পরিচয় তার
দিলে তুমি ভাল রূপে, ঘোষজ সুজন!
গাঁথিয়া অপূর্ব, চারু কবিতার হার
ইংরাজী ভাষায়। শ্রুতি-পথ-বিমোহন
কবিতার ছটা তব। দূর বন-জাত
ফুল-ফুলকুলে যথা গাঁথে মালাকার
কমনীয় দাম (দাম প্রচুর তাহার)
ভুলাতে নয়ন, মন,—হারে পারিজাত।
তেমনি সাগর-পার বিদেশী ভাষায়
কবিতা মালিকা তুমি স্বগুণে গাঁথিলে
বঙ্গবাসী হয়ে। পরি অন্তর-গলায়
এ তব গুম্ফিত হার আনন্দ-সলিলে
সন্তরে পাঠক সদা ; সুধার ধারায়
তব যশঃ গায় সবে। সুকীর্তি রাখিলে।

আমরা কাশীপ্রসাদের কয়েকটি ইংরাজী কবিতার বঙ্গানুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অনুবাদগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। অনুবাদে মূলের ভাব ও সৌন্দর্য রক্ষা করা অসম্ভব, তবে আশা করি ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠকগণ ইহা হইতে কাশীপ্রসাদের কবিত্বশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন।

(১)

একটি নক্ষত্রের প্রতি

(ঝটিকার সময় লিখিত)

কি শোভন রূপে তুমি দে'ছ দরশন
আজি রাতে, হে উজ্জ্বল তারকা সুন্দর
নিম্নে মহাঝটিকার লীলা ভয়ঙ্কর
মহারণে মত্ত যেন ভীম প্রভঞ্জন।

দীপ্ত তুমি শোভিতেছ, স্মৃতির আলোক
জ্বলে যথা অতীতের দিনগুলি 'পরে
মানবের হৃদয়ের অমানিশা 'পরে
ভীম ঊর্মি তুলে যবে মর্মভেদী শোক।

নির্জন আকাশ মাঝে এসেছ একক
রজনীর একমাত্র আনন্দ-কারণ
নিরাশ হৃদয় মাঝে আসয়ে যেমন
শোকক্লিষ্ট মানবের—আশার আলোক।
উন্মত্ত পবনাহত মেঘগুলি আসি।
বার বার তব অঙ্গ করে আবরণ'
ভীষণ বিপদঝড়ে উদ্বেগের রাশি
আবরে যেমনি ক্ষীণ আশার কিরণ।

(২)

কোন বন্ধুর প্রতি

বোলোনা বোলোনা সখে যোগ দিতে মোরে
কলহাস্য-মুখরিত প্রীতি সম্মিলনে
সঙ্গীত, সুতান, নৃত্য, উলাস, যেখানে
একে একে হৃদয়কে সম্মোহিত করে।

কেন সখা কেন তুমি চাহ বিনাশিতে
অপরের হর্ষ, সুখ, মম দুঃখ দিয়ে,
কেন সখা কেন চাহ ভগ্ন এ হৃদয়ে
আনিতে উলাস, হর্ষ, কৃত্রিম সুখেতে।

দাও সখা, দাও মোরে থাকিবারে হেথা,
হৃদয় আমার আজি বিষাদ-প্রবণ
স্মৃতি উন্মোচিত করে কাল-আবরণ
আনে শোক-অশ্রুসিক্ত অতীতের কথা।

শিশির হ'লেও গত রেখে যায় তা'র
ঘোর ঘন কুজ্ঝটিকা, সেইরূপ মোর
অতীত হইয়া গেছে নয়নের লোর
ফেলে গেছে ছায়া তার আমার উপর।

(৩)

ভুলিতে কি পারি?

ভুলিতে কি পারি কভু সেই, হরষের, পুলকের হাসি,
লোহিতকোজ্জ্বল ওষ্ঠে তব, প্রেমে যাহা
উঠিত উদ্ভাসি?
গোলাপের সমুজ্জ্বল প্রভা মাখা ইন্দ্রধনুকের মত
উদিত হৃদয়াকাশে মম এবে হায় সঙ্গী বিরহিত।
আমার প্রণয়াকাশে তব আঁখি দুটি তারকার মত
ঢালিত প্রশান্ত জ্যোতি আর উচ্ছ্বসিত-প্রীতি
অবিরত
বর্ষিত অজ্ঞাতপূর্ব এক আনন্দের উলাসের স্রোত
সর্বমোহকারী শক্তি যা'র নাশিতে অক্ষম
শোক যত।
ভুলিতে কি পারি কভু সেই, চিরপ্রিয় ভুজযুগ তব,
পবিত্র সুন্দর আভাময় মৃণালের কমনীয় ভাব,
আনন্দের সুখবৃত্ত এক অঙ্কিত করিয়া হর্ষভরে
চুম্বন ও মধুহাসি ল'য়ে বেষ্টিত কণ্ঠের চারিধারে।

(৪)

ভুলিতে কি পারি কভু সেই প্রথম মিলন তব সাথ
নিশাশেষে দিবালোক সম, মোর কাছে হ'ল প্রতিভাত
বিদূরিত করিল তাহার আনন্দের কিরণ সম্পাতে
গভীর বেদনা দুঃখ যত নিরানন্দ এ হৃদয় হ'তে।
ভুলিতে কি পারি কভু সেই সুগভীর প্রণয় মোদের,
সূর্যকরোজ্জ্বল দিবা সম?—হায় আজি গর্ভে
অতীতের!—
সন্দেহের কাল মেঘ যথা ক্ষণতরে দেয় নাই দেখা—
সমুজ্জ্বল সুনির্মল যাহা পরিপূর্ণ সুখে ছিল মাখা।
ভুলিতে কি পারি কভু সেই সন্ধিক্ষণ আমা হ'তে
তোরে

সন্ধ্যা হ'তে দিবালোক সম, বিচ্ছিন্ন করিল
চিরতরে?
তথাপি কি মধুর সে শেষ, চন্দ্রকারোজ্জ্বলা সন্ধ্যা প্রায়
প্রশান্ত সুস্নিগ্ধ জ্যোতি যার, সমগ্র আকাশময় ভায়।

(৪)

বাসনা

আমি যদি হইতাম আভা গোলাপের
লাবণ্য এনেছে যাহা কপোলে তোমারি;
কি ঈপ্সিত ভাগ্য আহা হইত আমার
কি সুখ হইত মম, অয়ি সুকুমারি!
আমি যদি হইতাম হাসিটির মত
ভাসে যা' প্রবালরক্ত ওষ্ঠেতে তোমার,
মৃদুল মধুর যাহে কিরণসম্পাত
জাগায় কবির হৃদে আনন্দ অপার।
আমি যদি হইতাম মলয়-বাতাস
চুমিতাম তব মুখ খেলিতাম ঘিরি';
পড়িত যখন তব বিরহের শ্বাস
চুরি করি লইতাম মাধুরী তাহারি।
আমি যদি হইতাম পবিত্র শুভ্রতা,
বিরাজিত যাহা তব বক্ষ-পীনতায়;
আনিতাম অন্য হৃদে ঘোর-উন্মত্ততা,
রহিতাম নিরাপদে তোমার ছায়ায়।
আমি যদি হইতাম চন্দ্রের কিরণ,
তব দৃষ্টি মোর প্রতি নিতে আকর্ষিয়া;
আমি যদি হইতাম প্রেমের স্বপন,
তব হৃদে প্রীতি-চিন্তা দিতে জাগাইয়া!
না, না, না; চাহি না আমি হইতে এ সব,
চাহি না হইতে জড় চেতনা-বিহীন;
গাহিব কেমনে তবে যশোগীতি তব,
কীর্তিব চরিত্র তব পূত অমলিন।

চাহি আমি হইবারে স্বর্গের কিন্নর,
ধরি জ্যোতির্ময় দেহ কীর্তির ভুবনে ;
পবিত্র চরিত্র তব—সুষমা সুন্দর,
অমর অশ্রুতপূর্ব স্বরগের গানে।

(৫)

দুঃখ

দিবস রজনী কত শত
বিষাদে কেটেছে, দুঃখ! মোর ;
তথাপি পরীক্ষা কেন এত
হৃদয় ত বহুদিন তোর?
জীবনের সুখ আশা যত
বহুদিন করেছ হরণ ;
রেখে গেছ হৃদয় শুধু ত
শোকভার করিতে বহন।
বিস্মৃতি গিয়াছে ত্যজি মোরে
স্মৃতি শুধু আনে পূর্বব্যথা ;
ভগ্ন হৃদয়ের ধ্বংস পরে
বহ তুমি প্রভঞ্জন যথা।
প্রচণ্ড প্রকোপ তব আনে
ঘন কৃষ্ণ মেঘ উদ্বেগের ;
কিছু ত রাখনি এ হৃদয়ে—
মুক্তি কি দিবে না হৃদয়ের?
কোপ তব সম্বর, সম্বর,
বিশ্রাম প্রদান, ক্ষণতরে ;
ফুটুক জীবনে একবার
একটি গোলাপ হর্ষভরে।

বাঙলা গীতাবলী

কবি কাশীপ্রসাদ তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণের ন্যায় মাতৃ ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল ইংরাজী ভাষারই অনুশীলন করেন নাই। মাতৃভাষায় তিনি অনেকগুলি সুন্দর তাল মান সঙ্গত সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।
দুইটি ধর্মসঙ্গীত এস্থলে উদ্ধৃত হইল : —

(১)
ভৈরবী—আড়া

কি দিয়ে তুষিব তাঁরে বলে আপনার।
ফল ফুল যত দেখ সকলি তাঁহার।।
প্রচণ্ড প্রতাপী বীর, কীটের ক্ষুদ্র শরীর,
জীবনে, পতনে যিনি সদা নির্ব্বিকার।।

(২)
ভৈববী—আড়া

তুমি জান তব ইচ্ছা বিশ্বের কারণ।
ইন্দ্রিয়াগোচর নহে শাস্ত্রের অদরশন।।
উৎপত্তি পালন লয়, তোমার নিয়মে হয়,
কভু খণ্ডিবার নয় যতেক করি যতন।।

তাঁহার রচিত সরস্বতীর স্তবটিও কি সুন্দর :—

বাহার—আড়া

শ্বেত শতদলোপরে, শ্বেতাম্বর কলেবরে,
শ্বেতমালা গলোপরে, বিরাজে শ্বেত বরণী।
বেদাঙ্গ বেদান্ত তন্ত্র, নৃত্য গীত বাদ্যযন্ত্র,
সকলের মূলমন্ত্র, ব্রহ্মময়ী সনাতনী।।
চরণের কিবা শোভা, মধুলোভে মধুলোভা,
লোহিত কমল ভ্রমে ধায়।

সারদা শুভ বরদা, অজ্ঞানের জ্ঞানপ্রদা,
বিধাতার ধ্যেয় সদা, বেদমাতা নারায়ণী।।

কিন্তু কাশীপ্রসাদের প্রীতি-গীতিগুলিই তৎকালে সাধারণ কর্তৃক অধিকতর সমাদৃত হইয়াছিল। এইরূপ মধুরভাবপূর্ণ সঙ্গীত বাঙলা সাহিত্যে বিরল এবং নিধুবাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবির চিরসমাদৃত সঙ্গীতগুলির পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। এই সঙ্গীতগুলি খাঁটি বাঙলার—খাঁটি বাঙালির—হৃদয়-গীতি। কাশীপ্রসাদের 'গীতাবলী' এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু মদীয় পরমপূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত "প্রীতি-গীতি" নামক সুন্দর প্রেমসঙ্গীত সংগ্রহে কাশীপ্রসাদের চল্লিশ পঞ্চাশটি লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'প্রীতি-গীতি'র ভূমিকায় লিখিত হইযাছে—'কাশীপ্রসাদের সুমিষ্ট গীতাবলী সাধারণের যত পরিচিত হওয়া উচিত, তত পরিচিত নহে।' আমরা কাশীপ্রসাদের কতকগুলি সঙ্গীত এই স্থলে পুনরুদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে কাশীপ্রসাদের সঙ্গীত রচনাশক্তির পরিচয় প্রদান করিব এবং সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিব, এই সুমিষ্ট সঙ্গীতগুলি আজি এত অনাদৃত কেন?—

(১)
কালাংড়া—ঠুংরি

একি অপরূপ হেরিলাম, বিধুমুখী প্রাণ।
বল দেখি কোথা আছে, তাহার প্রমাণ?
জীবন হারিণী আর, সঞ্জীবনী সহ তার,
বিপরীত দুই গুণ, শোভে একস্থান।।

(২)
বারোঁয়া—ঠুংরি

যদি তারে আমি পাই।
লোক লাজ মান ভয় কিছু নাহি চাই।।
নয়ন পরাণ মন চাহে যারে প্রতিক্ষণ,
এমন সুখের ধন, সম কিছু নাই।।

(৩)
ঝিঁঝিট—আড়া

জীবন থাকিতে তারে ভুলিব কেমনে?
সতত বাসনা যারে রাখিতে নয়নে।।
শশাঙ্ক কলঙ্ক ত্যজে, তারে বদনে বিরাজে,
অমিয়. বরিষে ঘন মধুর বচনে।।

(৪)
ঝিঁঝিট—আড়া

হৃদয়ের রাজা হয়ে তুমি প্রাণধন!
নিদয় হলে কি বাঁচে প্রজার জীবন?
মনের বাসনা যত, সব তব অনুগত,
পুরাইয়ে মনোমত, রাজ্যের কর পালন।।

(৫)
ঝিঁঝিট—আড়া

হৃদয়ের রাজা তুমি কেবা তম সম।
একাধারে সবরূপ শোভা অনুপম।।
শশধর বদনেতে, সুখতারা নয়নেতে,
সুধামাখা বচনেতে, অতি মনোহর।।

(৬)
ঝিঁঝিট—আড়া

আশার নিবৃত্তি প্রাণ হয় কি কখন?
শতবার হেরে তবু বুঝে কি নয়ন?
বিশেষে ও বিধুমুখ, হেরিলে সতত সুখ,
তাহারে ভুলিতে পারে, কে আছে এমন?

(৭)

লাজ ভরে নয়নেতে কি শোভা হয়েছে প্রাণ,
হেরিয়ে মনঃ ভুলিল।
চঞ্চলা চপলা, জিনি চমকি চঞ্চলা,
কটাক্ষের খর ফলা হৃদয়ে পশিল।।

(৮)
খাম্বাজ—মধ্যমান

কি দোষ মন দিলে তার কাছে।।
হেরেছি তারে কি ক্ষণে সদা সশঙ্কিত মনে
দারুণ বিরহাগুণে, প্রাণ দহে পাছে।।

(৯)
কালাংড়া—একতালা

নয়নে যারে, লেগেছ সখিরে।
কেমনে পরাণ ধরে, প্রাণ ধনে নাহি হেরে
রহিতে পারিরে?
যদি তাতে থাকে দোষ, বল কি আমার দোষ?
আঁখি ক'রে মনোবশ, ভুলালে আমারে।।

(১০)
বেহাগ—আড়া

এ কেমন চোর বল নয়ন তোমার' প্রাণ।
চিত্ত মন কিছু নাহি থাকে আপনার।
অন্য অন্য চোর যারা, হেরিলে পলায় তারা,
এ চোর হেরিলে হরে, প্রাণ রাখা ভার।।

(১১)
জয়জয়ন্তী—আড়া

অনেক সাধের ধন, তুমি প্রাণ আমার।
কত ভালবাসি আমি কি কহিব তার।।
হেরিলে, বিধু বদন, যে সুখ হয় সাধন,
জানে তা আমার মন ; কে জানিবে আর।।

(১২)
ঝিঁঝিট—আড়া

আমার মনের কথা তুমি কি জাননা? প্রাণ !
ভালবাসি কি না বাসি, বুঝে কি বুঝনা?
হৃদয়ে যার বসত, মনঃ যার অনুগত,
তাহার কি অজানত, কেন এ ছলনা।।

(১৩)
গারা ঝিঁঝিট—আড়া

কত ভালবাসি, প্রাণ, বুঝব কেমনে?
মন দেখাইবার নয়, কি কব বচনে?
অপরের অগোচর, হয় হৃদয় ভিতর,
কিরূপে জানিবে পর, যে করে তার কারণে।।

(১৪)
ইমন কল্যাণ—আড়া

হেরিয়ে তোমার প্রাণ, ও বিধুবদন।
যেমন করয়ে মনঃ অতীত কথন।।
মনেতে যতেক হয়, ভাব প্রেম সুখোদয়,
বচনে সে সমুদয়, হয় কি বর্ণন?

(১৫)

খাম্বাজ—আড়া

জীবন জীবন তুমি, প্রাণের বাঞ্ছিত ধন।
কি কব সে হই দুঃখী, না হেরে বিধুবদন।।
বারি ছাড়া মীন হ'লে, কাতর হয় যেমন।
তব বিরহেতে হয়, আমার মন তেমন।।

(১৬)

তোমার কি দোষ প্রাণ, যে দোষ আমার।
আপনি দিয়াছি মনঃ সাধে আপনার।।
নিজ দোষে নিজ ধন, হারায়ে করি রোদন,
কি করিবে অন্য জন, কি দায় তাহার?

(১৭)

গারা ঝিঁঝিট—আড়া

প্রাণ গেলে প্রাণনাথ, আসিবে কি বল সই?
জীবন রহিত হ'লে আইলে কি ফল সই?
প্রাণাধিক ভাবি যারে, প্রাণেরে সেই প্রহারে,
বুঝি প্রাণ তোষিবারে, প্রাণ হত হ'ল সই।।

(১৮)

ইমনকল্যাণ—আড়া

ভাবিয়ে ভাবিয়ে সই, কি হলো আমারে।
মনে করি ভাবিব না, তবু ভাবি তারে।।
ভাবনার একি ভাব, স্বভাব হলো অভাব,
অভাব হয়ে স্বভাব, জীবন সংহারে।।

(১৯)

সুরট মলার—আড়া

পিরীতে যতেক সাধ, সফল কি সব হয়।
অনেক বাসনা সখি কেবল মনেতে রয়।।
মনের মত নিতান্ত যদি হয় প্রাণকান্ত,
দেশ কাল লাজ ভয় কভু পূর্ণ নয়।।

(২০)

সুরট মলার—আড়া

হেরিলে শীতল কভু হয় কি বিরহানল।
দরশনে সখি আরো, অধিক হয় প্রবল।।
যেমন দেখিয়ে ঘন, চাতকের কি কখন,
পিপাসার নিবারণ, হয় বিনে ধারাজল।।
মনের বাঞ্ছিত ধন, নিকটে থাকিতে মন,
হয় না শান্ত কখন, বিহীনে তার মিলন।।
বরঞ্চ আশাতে তার, লোভ হয়ে সরকার,
আকিঞ্চন বাড়ে আরো, হৃদয় করে বিকল।

(২১)

আলাইয়া—আড়া

এমন সময়ে প্রাণ কিরূপে বিদায় দিব।
ত্যজিয়ে জীবন ধন, কেমনে বল রহিব।।
প্রভাতের প্রভাবলে, হরিষে ভাসে সকলে,
কেবল কি দুঃখানলে, একাকী আমি জ্বলিব।।

(২২)

এই এসে কেন তুমি, বল যাই যাইরে।
তোমারে হেরিলে প্রাণে, কত সুখী হইরে।।

অলির যেমন রীতি, তোমার কি সেই নীতি
নহিলে চঞ্চল চিত, কি হেতু সদাই রে।।

(২৩)
পূরবী —আড়া

আজি কি সুদিন, সুদীনে সুদিন, তব দরশনে।
অধিন বলিয়ে প্রাণ, হয়েছে কি মনে।।
সদয় হইয়ে বিধি, আনি দিল হারা নিধি,
অঘটনে সুঘটন, বল কি কারণে।।

(২৪)
বারোঁয়া—ঠুংরি

কেন সাধিলে না তারে।
সে যে সখি মন দুঃখে, গেল মন ভারে।।
মান বশে অনুচিত, হইলেম রোষান্বিত,
এখন তার সহিত, মিলাতে কে পারে।।

(২৫)
ঝিঁঝিট—আড়া

যামিনী কামিনী হয়, উভয়ে মিলন।
একদা বিরাজি, করে সুখ বিতরণ।।
গগনেতে শশধর, নীচে কামিনী অধর,
অমিয় বরিষে তার, মধুর বচন।।
দেখ তুই সুখতারা, তাহার নয়ন তারা,
নিবিড় চিকুর তার, সম নবঘন।।
যেমন বিম্বের শোভা, খঞ্জনের মনোলোভা,
তার ওষ্ঠ হেরে ভোলে, তেমনি নয়ন।।
শশীর অমিয় তরে, যেমন চকোর করে,
প্রেম সুধা পানাশয়ে পুরুষ তেমন।।

দেশ সেবা—'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার'

কাশীপ্রসাদ কেবল কবি ছিলেন না, তিনি কর্মী ছিলেন। দেশহিতকর নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে তাঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছিল। দেশীয়গণের অভাব ও অভিযোগ রাজপুরুষগণকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত দেশীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত বিশুদ্ধ ইং রাজী সংবাদপত্র তিনিই সর্বপ্রথমে এতদ্দেশে প্রবর্তিত করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে দেশীয়গণের রাজনীতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'Reformer' (সংস্কারক) নামক একটি সংবাদপত্র প্রবর্তিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু উহা Mr. Crowe নামক একজন ইউরোপীয় সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইত। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের জ্ঞানান্বেষণ' এবং রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত Bengal Spectator' ইংরাজী বাঙলা উভয়বিধ ভাষাতেই লিখিত হইত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কাশীপ্রসাদ 'Hindu Intelligencer' নামে যে ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রবর্তিত করেন, উহাই দেশীয়গণ কর্তৃক, পরিচালিত সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্র। এই পত্রে কাশীপ্রসাদের বহু সুলিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কাশীপ্রসাদের অসামান্য জ্ঞান ছিল, সুতরাং দেশবাসীর অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে তাঁহার ন্যায় সক্ষম অতি অল্প লোকই ছিল। প্রতিভাশালী যুবকগণকে তিনি বাছিয়া লইতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে সাহিত্য ও দেশ সেবায় প্রণোদিত ও উৎসাহিত করিতে পারিতেন। 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সারের' স্তম্ভেই সর্বপ্রথমে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও স্বনামধন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শেষাবস্থায় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পালের প্রতিভা স্ফুরিত হয়—কাশীপ্রসাদের নিকট হইতেই তাঁহারা সর্বপ্রথমে তর্ক যুদ্ধের জন্য আবশ্যকীয় শক্তি সঞ্চয় করেন। কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন :

He took a delight in nursing the literary ambition of many a struggling educated native. Both Babu Hurish Chandra Mookerji and Girish Chandra Ghose learnt the art of journalistic warfare from him. Afterwards they founded organs of their own, but they always acknowledged their obligation to him. The present writer would be guilty of ingratitude, did he not acknowledge that he first fleshed his pen in the columns of the Hindu intelligencer.

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও সোমপ্রকাশের' প্রতিষ্ঠার পূর্বে কাশীপ্রসাদের 'হিন্দু ইন্টিলিজেন্সার' ও ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' বঙ্গীয় সমাজের উপর যে অসামান্য প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল তাহা এক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। তবে কাশীপ্রসাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি একেবারে নির্দোষ ছিল না। তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন বলিয়া অনেক প্রকারের

সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তাররূপ অশেষ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার আদৌ সহানুভূতি ছিল না। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের ধর্ম্মসভার সভ্য হইয়া তিনি বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁহার শক্তিশালী লেখনী সঞ্চালিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যাহা করিতেন তাহাতেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, তেজস্বিতা, গভীর আন্তরিকতা ও উচ্চ স্বদেশহিতাকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং বাহাদুর কর্তৃক সংবাদপত্রে উত্তেজনাপূর্ণ প্রবণাদি প্রকাশ রহিত করিবার জন্য Gagging act প্রচারিত হইলে কাশীপ্রসাদ Hindu Intelligencer পত্রের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। যদিও কাশীপ্রসাদ অত্যন্ত রাজভক্ত ছিলেন, তথাপি এইরূপ আইনের অধীন হইয়া পত্রসম্পাদনের অসুবিধা বোধ করিলেন। এই পত্রখানি বন্ধ করিবার আরও একটি কারণ ছিল। ইতোমধ্যেই তাঁহার সাহিত্য-শিষ্য হরিশচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রের প্রাণপণ সাধনার ফলে তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্র যৎপরোনাস্তি প্রতিষ্ঠা ও শক্তিলাভ করিয়াছিল। যে উদ্দেশ্যে কাশীপ্রসাদ Hindu Intelligencer পত্রের প্রবর্তন করেন, সেই উদ্দেশ্য এই Hindu Patriot পত্র দ্বারা আশাতীতরূপে সংসাধিত হইতেছিল ; সুতরাং তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিভৃতে সাহিত্যালোচনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার শেষ জীবন নিভৃতে সাহিত্যচর্চাতেই যাপিত হইয়াছিল।

'মুখার্জীস ম্যাগেজিন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'রেইস ও রায়তের' প্রবর্তক ও সুযোগ্য সম্পাদক সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'মুখার্জীস ম্যাগেজিন' নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রের প্রবর্তন করেন। উহাতে কাশীপ্রসাদের কতকগুলি নূতন কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

উপসংহার

পূর্বেই বলিয়াছি কাশীপ্রসাদ দেশহিতকর বহুবিধ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন, তবে সমাজে যাহাতে পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশ না করে তজ্জন্য আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে অনেকেই প্রাচ্য আচার ব্যবহারাদি নিতান্ত দূষণীয় বোধ করিতেন, অনেকে ইংরাজের দোষগুলির পর্যন্ত অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আদর্শ স্থানীয় ইংরাজের সুরুচি ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইলেও পাশ্চাত্য সভ্যতায় আনুষঙ্গিক কোনও দোষ কাশীপ্রসাদকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও জস্টিস অব দি পীস্ রূপেও তিনি অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। জনহিতকর সভাসমিতিতে তিনি প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া সহানুভূতি প্রকাশ

করিতেন কিন্তু নীরব কর্মী কাশীপ্রসাদ প্রায়ই বক্তার আসন গ্রহণ করিতেন না। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ৪ ডিসেম্বর তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' নামক সংবাদ পত্র দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্মৃতি সভায় তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া একটি প্রস্তাবের সমর্থনের জন্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কাশীপ্রসাদ দেখিতেও যেরূপ সুপুরুষ ছিলেন তাঁহার অন্তঃকরণও সেইরূপ সুন্দর ছিল। তিনি বিনয়ী মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। তিনি অতি সুগায়ক ছিলেন। ধর্ম ও ন্যায় নিষ্ঠায় তিনি আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। দানে তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন শান্তিময় ছিল না কিন্তু বাণীর চরণচ্ছায়ায় তিনি একটি শান্তিপ্রদ স্থান আবিষ্কৃত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। তিনি শেষাবস্থায় হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত সুবৃহৎ বাটীতে অবস্থান করিতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে—বাঙলার সাহিত্যিকগণের সেই চিরস্মরণীয় বৎসরে, যে বৎসরে "বঙ্গ-কবি-সিংহাসন" শূন্য করিয়া "বঙ্গের অনন্য কবি, কল্পনা-সরোজরবি" মধুসূদন পরলোকগমন করেন, যে বৎসরে সার্থকনামা দীনবন্ধু "ত্যজি জীবধাম, কবি কুঞ্জবনে স্বর্গে করিতে বিহার" গমন করেন, যে বৎসরে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক কিশোরীচাঁদ মিত্র স্বর্গধামে প্রয়াণ করেন, যে বৎসরের কথা স্মরণ করিয়া বাঙলার তরুণ কবি নবীনচন্দ্র কাঁদিয়াছিলেন।

"মধুসূদনের" শোকে বিবশা দুখিনী'
না হ'তে চেতন নেত্র মুদিল কিশোরী,
তাঁর শোক-অশ্রুজল না ছুঁতেই বক্ষঃস্থল
মাতৃকোল "দীনবন্ধু" গেল শূন্য করি ;
ঈশ্বর! তোমারই ইচ্ছা !—বঙ্গ অভাগিনী !"

সেই বৎসরেই অভাগিনী বঙ্গজননীর ভাগ্যে আরও অনেক দুঃখ ছিল। এই বৎসরের ১১ নভেম্বর দিবসে (১২৮৩ বঙ্গাব্দে ২৭ কার্তিক) কাশীপ্রসাদও সাধনোচিত ধামে গমন করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গমাতা আর কখনও এতগুলি সন্তানরত্ন হারাইয়াছে কি না সন্দেহ।

প্রতীচ্য শিক্ষাবিস্তারের প্রথমযুগে কাশীপ্রসাদ বাঙালির যে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, শতবর্ষ বাঙালি তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কাশীপ্রসাদ প্রমুখ মনীষীগণ আমাদের দেশের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার ভবিষ্যৎ বড়ই আশাময় বড়ই উৎসাহপ্রদ।

সূত্রাবলি

১ হোরেস হেম্যান উইলসন (জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৭৮৬ ; মৃত্যু ৮ মে ১৮৬০ খৃঃ) প্রায় বাইশ বৎসর কাল এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। মেঘদূত, বিষ্ণুপুরাণ, ঋগ্বেদ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থাদি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করেন। এদেশে টাকশালে উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। ইঁহার ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তখনকার ইংরাজী সমাজে আর কেহই ছিলেন না।

২ হেন্‌রী মেরিডিথ পার্কার (জন্ম ১৭৯৬ খৃঃ ; মৃত্যু ১৮৬৪) "The Draught of Immortality & other Poems" নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি এতদ্দেশীয় ইংরাজ কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন। ইনি কিছুকাল এ দেশের রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর ছিলেন।

৩ রবার্ট হ্যান্ডেন র‍্যাট্রে (জন্ম ১৭৮১ মৃত্যু ১৮৬০ খৃঃ) "The Exile & other poems" নামক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি সদর দেওয়ানী আদালতের অন্যতম বিচারক ছিলেন।

৪ হেন্‌রী টরেন্স (জন্ম ২০ মে ১৮০৬ ; মৃত্যু ১৬ আগষ্ট ১৮৫২খৃঃ) মুর্শিদাবাদে বড়লাটের এজেন্ট ছিলেন। Calcutta Star এবং অন্যান্য সংবাদপত্রের সম্পাদকতা এবং অনেকগুলি সদ্‌গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। কিছুকাল এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক এবং পরে উহার সরকারী সভাপতি হইয়াছিলেন।

৫ রেভারেণ্ড উইলিয়ম আডাম—রামমোহন রায়ের বন্ধু। এতদ্দেশীয় শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন।

৬ কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন—(জন্ম ২০ মে ১৮০১; মৃত্যু ১৭ নভেম্বর ১৮৬৫ খৃঃ) — হিন্দু কলেজের সুপ্রসিদ্ধ প্রিন্সিপ্যাল। Calcutta Literary Gazette ও Bengal Annual-এর সম্পাদনে এবং Literary Leaves, Literary Chitchat, Literary Recreation, Selections from British Poets প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণয়নে তিনি অপূর্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

৭ হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (জন্ম ১০ এপ্রিল ১৮০৯ ; মৃত্যু ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩১ খৃঃ) কৈশোরেই একখানি কবিতাপুস্তক এবং পরে Fukeer of Jungheera & other Poems নামক কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হয়েন। হিন্দু কলেজে কিছুকাল

শিক্ষকতা করিয়া রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাঙলার যুগপ্রবর্ত্তকগণের উপর অসামান্য প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ২২ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৮ এমা রবার্টস—(জন্ম ১৭৯৪ ; মৃত্যু পুণায় ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে) Oriental Scenes. Dramatic Sketches প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া ইনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিছুকাল Bombay United Service Gazette সম্পাদন করিয়াছিলেন। Scenes & Characteristics of Indostan, The East India Voyager প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থেও তাঁহার অসামান্য রচনাক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৯ লর্ড অকল্যাণ্ড—(জন্ম ২৫ আগষ্ট ১৭৮৪ ; মৃত্যু ১ জানুয়ারী ১৮৪৯) ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন।

১০ মাননীয়া এমিলি ইডেন (জন্ম ৩ মার্চ ১৭৯৭ ; মৃত্যু ৫ আগস্ট ১৮৬৯ খৃঃ) সহোদর লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের সহিত এতদ্দেশে আগমন করেন। ইনি অতি বিদুষী রমণী ছিলেন। Portraits of the People & Princes of India, Up the country Letters from India নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি দুইখানি উপন্যাস গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।
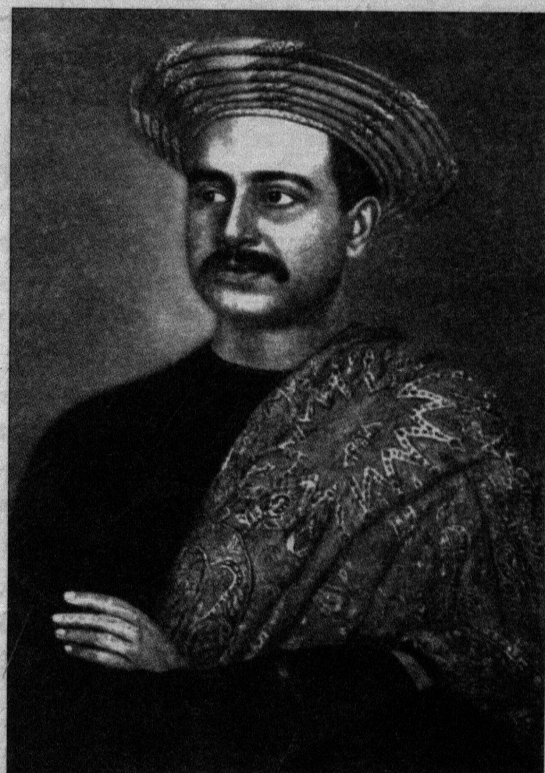
রমাপ্রসাদ রায়

নীরবকর্মী রমাপ্রসাদ রায়

উপক্রমণিকা

মার্তণ্ডের প্রখর কিরণজালে যখন ভূমণ্ডল জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে, উজ্জ্বলতম নক্ষত্রও তখন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আমাদের জাতীয় জীবনের যে যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি পিতা রামমোহনের সর্বতোমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, সেই যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পুত্র রমাপ্রসাদের প্রতিভার আলোকরশ্মি যে ম্লানভাবে প্রতিভাত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। নতুবা যে অসাধারণ বাঙালি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অপূর্বমনীষা ও অপ্রতিরুদ্ধ অধ্যবসায়ের ফলে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সর্বপ্রথমে দেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙালির যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে দেশবাসীর জন্য বিচারপতির পবিত্র সিংহাসন অধিকৃত করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনকথা, তাঁহার কীর্তি-কাহিনী, আজ বাঙালির নিকট বোধ হয় অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইত না ; মানব-স্বভাব-সুলভ সহস্র দুর্বলতা সত্ত্বেও মনীষী রমাপ্রসাদ রায় বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় সাহিত্যরথিগণের নিকট হইতে সসম্মান পূজা ও শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতেন না।

জন্ম

১২২৪ বঙ্গাব্দে ১২ শ্রাবণ (ইংরাজী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে,) রমাপ্রসাদ রায় জন্মপরিগ্রহ করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রের বংশপরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। আটবৎসর বয়ঃক্রমকালে বালক রামমোহনের প্রথমা স্ত্রীর দেহান্তর ঘটে। পরবৎসর তিনি বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কুড়মন পলাশি গ্রামে শ্রীমতী দেবী নাম্নী একটি বালিকাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার জীবদ্দশাতেই ভবানীপুরে কৃতনিবাস ৺মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী উমাদেবীকে বিবাহ করেন। মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে প্রথমে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন এবং রাধাপ্রসাদের জন্মের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। উমাদেবীর কোনও সন্তানাদি হয় নাই।

জন্মস্থান

রমাপ্রসাদের জন্মস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কিশোরীচাঁদ মিত্র একস্থানে লিখিয়াছেন যে, ক্ষীরপাই রাধানগরে রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। কৃষ্ণদাস পাল-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে উহার প্রতিবাদ করিয়া একজন লেখক লিখিয়াছিলেন, খানাকুল কৃষ্ণনগরে রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বোধ হয় রামমোহন রায়ের চরিতকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সত্য। নগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "বিধর্মী বলিয়া "রামমোহন রায় পুত্র রাধাপ্রসাদ ও পুত্রবধূর সহিত মাতা (তারিণী দেবী ওরফে ফুল ঠাকুরাণী) কর্তৃক পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে বাটী নির্মাণ করেন। উক্ত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।"

মহাপ্রাণ পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে বালক রমাপ্রসাদের চিত্তবৃত্তি প্রথম বিকশিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রামমোহন ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭ সেপ্টেম্বর দিবসে ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। রামমোহনের ইংলণ্ড গমনকালে রমাপ্রসাদ বালক মাত্র ছিলেন, তথাপি তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে তাঁহার পিতার স্নেহশীল ব্যবহারের আনন্দময়ী স্মৃতি তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়পটে চিরদিন সমুজ্জ্বল ছিল, এবং তিনি গৌরব-বিমিশ্রিত আনন্দের সহিত তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট, উত্তরকালে তাঁহার পিতার কথা বলিতেন।

শিক্ষা

রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে বালক রমাপ্রসাদ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং রামমোহনের বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড উইলিয়ম আড্যাম উহার পরিদর্শক ছিলেন। ইংলণ্ড গমনকালে রামমোহন রমাপ্রসাদকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ ও অকৃত্রিম সুহৃদ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। এই সময়ে রমাপ্রসাদ 'পেরেণ্ট্যাল অ্যাক্যাডেমি'তে প্রবিষ্ট হন। চিরস্মরণীয় য়ুরেশিয়ান কবি, দার্শনিক ও শিক্ষক হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রিয়বন্ধু মিষ্টার রিকেট্‌স্ এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই বিদ্যালয় এক্ষণে ডভ্‌টন্ কলেজ নামে পরিচিত। রমাপ্রসাদ কিছুকাল পরে রামমোহন রায় ও ডেভিড্ হেয়ারের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবেশলাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁহার প্রতিভা বিশিষ্টভাবে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার গভীর পাঠানুরাগ, অবিচলিত অধ্যবসায়, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সহপাঠীগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম অভিভাবক প্রিন্স দ্বারকানাথের সহবাসে তিনি যথেষ্ট মানসিক উন্নতি

সাধিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ একস্থানে লিখিয়াছিলেন : দ্বারকানাথ ঠাকুরের সবিশেষ সংসর্গ হওয়াতে অতি অল্প বয়সে তাঁহার মনুষ্য পরীক্ষা করিবার ও সহজে দুরবগাহ বিষয় সকল বুঝিয়া লইবার সবিশেষ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। বাস্তবিক, রমাপ্রসাদের বাল্যজীবনের উপর দ্বারকানাথ যে অপরিমেয় মঙ্গলময় প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহাই যে রমাপ্রসাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ডেভিড হেয়ার স্মৃতি-সমিতি

হিন্দু-কলেজে পাঠাবস্থায় রমাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ডেভিড্ হেয়ারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। রামমোহন রায়ের পুত্রকে ডেভিড্ হেয়ার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রমাপ্রসাদও মহাত্মা ডেভিড হেয়ারকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১ জুন দিবসে হেয়ার সাহেব পরলোক গমন করিলে উক্ত বৎসর ১৭ জুন তারিখে কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল কলেজের গৃহে একটি বিরাট সভা আহূত করেন। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র, কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তারা হেয়ারের গুণকীর্ত্তন করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অবশেষে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসমিতি সংগঠিত হয়। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং এই স্মৃতিসমিতির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।[১] এই সমিতির চেষ্টায় ডেভিড্ হেয়ারের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি প্রস্তুত হয় এবং প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সম্মুখে, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যস্থিত ভূমিতে স্থাপিত হয়।

রামমোহনের অর্থাভাব

দিল্লীর বাদশাহের কার্যানুরোধে ইংলণ্ড গমনকালে রামমোহন বাদশাহ প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে সুদূর প্রবাসে যে তিনি অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন একথা বোধ হয় অনেকের নিকটেই এক্ষণে অপরিজ্ঞাত। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত রামকমল সেনের জীবনীতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসনের কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৩৩

খৃষ্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে ডাক্তার উইলসন দেওয়ান রামকমল সেনকে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশের মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহা হইতে পাঠকগণ রামমোহনের তৎকালীন আর্থিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।—

> পূর্বে লিখিত একখানি পত্রে আপনাকে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর কথা লিখিয়াছি। তাহার পর মিস্টার হেয়ারের ভ্রাতার সহিত আমার সাক্ষাৎ ও উক্ত বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হয়। রামমোহন মস্তিষ্কের রোগে প্রাণত্যাগ করেন ; তিনি খুব পুষ্টাঙ্গ হইয়াছিলেন এবং যখন আমি তাঁহাকে দেখি তিনি স্থূলকায় হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বদনমণ্ডল অত্যধিক শোণিতপ্রবাহে রক্তিমাভ হইয়াছিল। তাঁহার যকৃত রোগ হইয়াছে এইরূপ সকলে অনুমান করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই রোগের জন্যই চিকিৎসিত হইয়াছিলেন—মস্তিষ্কের রোগের জন্য নহে। মানসিক উদ্বেগে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অর্থাভাব বশতঃ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন এবং অত্রত্য বন্ধুগণের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঋণগ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই তাঁহাকে যথেষ্ট ক্লেশস্বীকার করিতে হইয়াছিল, কারণ ইংলণ্ডের লোকেরা বরঞ্চ প্রাণ দিতে পারে তথাপি অর্থ হস্তান্তরিত করিতে চাহে না। অধিকন্তু, মিষ্টার স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট (যাঁহাকে তিনি তাঁহার সেক্রেটারিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন) তাঁহাকে বাকি বেতন বলিয়া অনেক টাকার দাবি লইয়া অত্যন্ত উত্যক্ত করিতেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে যদি তিনি সমস্ত প্রাপ্য টাকা না দেন তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ডে প্রকাশিত রামমোহনের পুস্তকাদি তাঁহার (স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণটের) স্বরচিত বলিয়া প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি যথার্থই তাহা করিয়াছেন।
>
> আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে মৃত্যুকালে রামমোহন রায় প্রায় তিন লক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া যান।

রমাপ্রসাদের চাকুরী গ্রহণ

রামমোহনের মৃত্যুর পর সংসারযাত্রা নির্বাহের সমস্ত ভার রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদের উপরেই পড়িল। রমাপ্রসাদ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা এবং জমিদারি সংক্রান্ত কার্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অগ্রজের সহিত পৈত্রিক জমিদারিও পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি জীবিকা অর্জনের অন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের চিরস্মরণীয় গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক একটি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। রমাপ্রসাদ ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে নদীয়ার ডেপুটী হন এবং পরে ক্রমান্বয়ে বর্ধমান, হুগলী ও চব্বিশ পরগণায় কার্য করেন। বাঙলা প্রদেশে

তৎকালে এই চারিটি জিলাই কি ঐশ্বর্যে, কি বিদ্যাগৌরবে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই সকল জিলায় কার্য করিয়া রমাপ্রসাদ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। জর্জ টয়েন্‌বির "A Sketch of the Administration of the Hooghly District from 1795 to 1845" নামক গ্রন্থপাঠে প্রতীত হয় যে রমাপ্রসাদ কিছুকাল হুগলী জিলায় কালেক্টরের কার্য করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে আর কোনও বাঙালি এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিবার অধিকার পান নাই। মিষ্টার টয়েনবি লিখিয়াছেন,—"The first Deputy Collector was Babu Rumapersad Roy, and I find that in 1842 he was in charge of the district during the Collector's illness—the first instance, probably, of a native Deputy Collector being in such charge." বর্ধমানে অবস্থানকালে মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মে। এখনও বর্ধমান রাজবাটীতে সযত্নরক্ষিত রমাপ্রসাদের সুন্দর তৈলচিত্র তাঁহাদিগের গভীর বন্ধুপ্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেকালের ডেপুটী কালেক্টরদিগের পদ যথেষ্ট সম্মানের ছিল। এই পদের গৌরবরক্ষার জন্য দেশীয় ডেপুটী কালেক্টরগণকে সিবিলিয়ান কালেক্টরদিগের ন্যায় জাঁকজমকে থাকিতে হইত। সুতরাং যাঁহারা প্রভূত পৈত্রিক ধনের অধিকারী না হইতেন এবং অসাধুবৃত্তি অবলম্বন না করিতেন, তাঁহারা এই পদ প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতেন বটে কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন না। 'প্রিন্স' দ্বারকানাথের সহবাসে রমাপ্রসাদের রুচি অতি উচ্চ আদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল। একজন অশীতিপর বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার 'আমীরি চাল' ছিল। যতই অধিক মূল্য হউক না কেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্যাদিই ক্রয় করিতেন ও ব্যবহার করিতেন। রমাপ্রসাদের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল, সুতরাং তিনি শীঘ্রই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

ব্যবহারজীব

এই সময়ে প্রখ্যাতনামা প্রসন্নকুমার ঠাকুর সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিয়া প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছিলেন। রমাপ্রসাদ চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নকুমারের ন্যায় স্বাধীনভাবে ওকালতি করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলেন। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের একজন লেখক লিখিয়াছেন যে রমাপ্রসাদের ওকালতিতে প্রবেশ করিবার সময় একটু গোলযোগ হইয়াছিল। এই সময়ে একটি নূতন নিয়ম প্রচলিত হয়, সেই নিয়মানুসারে প্রধান বিচারপতি জন্ রাসেল কলভিন্ তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র আনিতে বলেন। রমাপ্রসাদ তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত রামগোপাল

ঘোষকে এই বিষয়ে বলিলে, রামগোপাল অবিলম্বে ভারতবন্ধু ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নিকট গিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন তখন এ দেশের ব্যবস্থাসচিব ছিলেন এবং তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাঙলার ডেপুটী গভর্নর স্যর জন্ লিট্‌লারকে এই মর্মে পত্র লিখেন 'যদি নেলসনের পুত্র নৌ-বিভাগে কর্মপ্রার্থী হইতেন তাহা হইলে কি বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে বিফলমনোরথ করিতে পারিতেন? যদি রামমোহন রায়ের পুত্রকে বিচারালয়ে নিজের চেষ্টাতেও অর্থোপার্জন করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় গভর্নমেণ্টের কলঙ্কের বিষয়।" বেথুনের সুপারিশের ফলে রমাপ্রসাদের নাম উকিলশ্রেণীভুক্ত হয়। প্রথম বৎসর রমাপ্রসাদের তাদৃশ আয় হইল না, কিন্তু চাকুরীতে তিনি যে বেতন পাইতেন, দ্বিতীয় বৎসর ওকালতিতে তাহার দ্বিগুণ আয় হইল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট তিনি অনেক সাহায্য লাভ করেন। অন্যান্য পিতৃবন্ধুগণের সাহায্যে রমাপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রসন্নকুমার অবসর গ্রহণ করিলে রমাপ্রসাদ প্রধান বিচারপতি মিষ্টার জন রাসেল কল্‌ভিনের সুপারিশে লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক তাঁহার স্থানে সরকারি উকিল নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার আর প্রতিষ্ঠার সীমা রহিল না। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমস্ত প্রসার ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইলেন। যেরূপ দক্ষতার ও নিপুণতার সহিত তিনি কার্য করিতেন তাহাতে ইংরাজ বিচারকগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন। শিক্ষিত বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু মাননীয় জে, আর, কল্‌ভিন তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। আট বৎসর কাল কালেক্টরের কার্য করিয়া জমি ও খাজনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক নিয়মাদিতে তাঁহার অসামান্য জ্ঞান হইয়াছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ মোকদ্দমাই জমি ও খাজনা সংক্রান্ত। সুতরাং রমাপ্রসাদ অতি সুন্দরভাবে এই সকল মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা কিছুতেই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিতেন না। রমাপ্রসাদের অসাধারণ তর্কশক্তি ছিল এবং দুরূহ বিষয়গুলিকেও সরল ও সহজভাবে বুঝাইয়া দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি বাগ্মী ছিলেন না, কিন্তু শান্ত ও ধীরভাবে আপনার বক্তব্য বলিয়া যাইতেন, কখনও একটিও অনাবশ্যকীয় কথা বলিতেন না। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় বিচার-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন না। তিনি কিছুতেই উষ্ণ হইতেন না।

সদর দেওয়ানী আদালতের সর্বপ্রধান উকিলরূপে দেশীয় ও ইউরোপীয় নানা শ্রেণীর নানা প্রকারের ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার অমায়িক ও বিনয়নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপে তিনি সকল সমাজের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং সকল সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ইউরোপীয় ও দেশীয় সমাজের মধ্যে বন্ধুস্বরূপ ছিলেন। রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন যে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে আর কোনও বাঙালি

রমাপ্রসাদের ন্যায় ইউরোপীয় সমাজে এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

গুণগ্রাহিতা

রমাপ্রসাদ অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। ভবিষ্যতে যিনি হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই মনীষী দ্বারকানাথ মিত্রের জীবন-প্রভাতে রমাপ্রসাদই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া গুণগ্রাহী রমাপ্রসাদ তাঁহাকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন সে সাহায্য না পাইলে দ্বারকানাথ অত শীঘ্র প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। দ্বারকানাথের একজন চরিতকার রমাপ্রসাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :

> রমাপ্রসাদ বাবু সে সময়ে গভর্নমেণ্টের সিনিয়র উকিল এবং উকিলবারের প্রধান ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার ক্ষমতা অতুলনীয় ছিল, সুতরাং নূতন উকিলদিগের অনেকে তাঁহার সুনজরে পড়িবার চেষ্টা করিত। রমাপ্রসাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকলের উপর থাকিত, যোগ্য লোক পাইলে তিনি সন্তুষ্টমনে তাহাকে সাহায্য করিতেন। দ্বারকানাথ বারে প্রবেশের অল্পদিনমধ্যে রমাপ্রসাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন, রমাপ্রসাদবাবু ইহাকে বিশিষ্ট বুদ্ধিমান ও কাজের লোক দেখিয়া অনেক সময় নিজের সহকারী বা জুনিয়র করিয়া লইতেন।

রমাপ্রসাদেরই চেষ্টায় 'ব্যবস্থা দর্পণ' প্রণেতা দরিদ্র-সন্তান শ্যামাচরণ সরকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান অনুবাদকের পদলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাবু (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ওকালতির প্রথম অবস্থায় রমাপ্রসাদের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন।

রমাপ্রসাদের গুণগ্রাহিতার আর একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মৌলবী (পরে নবাব বাহাদুর) আবদুল লতিফ খাঁ জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট রূপে সেই ডিভিসনের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত করেন। তিনি জাহানাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার সময়ে রমাপ্রসাদের নেতৃত্বে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আবদুল লতিফকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎকালে অভিনন্দনপত্র প্রদানের প্রথা এতদূর বিস্তৃতিলাভ করে নাই। কিন্তু দেশের এইরূপ উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা গুণগ্রাহী রমাপ্রসাদের নিকট দোষাবহ মনে হইয়াছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে রমাপ্রসাদ আবদুল লতিফের উচ্চ-প্রশংসা করিয়া তৎসহিত অভিনন্দন পত্রটি প্রেরণ করেন। বিনয়ের অবতার আবদুল লতিফ যে প্রত্যুত্তর দেন তাহার শেষভাগে রমাপ্রসাদকে লিখিয়াছেন :

In conclusion allow me to state that if anything could add to the value of the address I am now acknowledging it is the act of the subscribers in making you the medium of its presentation.

শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহ

দেশে শিক্ষাবিস্তারে রমাপ্রসাদের অসীম আগ্রহ ছিল। ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্ট দৃষ্টে প্রতীত হয় যে বাঁশবেড়িয়ায় রমাপ্রসাদ একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। উহাতে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থের শিক্ষা প্রদত্ত হইত।[২]

শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এই পাঠশালার শিক্ষক এবং সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দুরীতি অনুসারে বেতন না লইয়া বিদ্যাদান করা হইত।

আলেকজাণ্ডার ডফ্ প্রভৃতি খ্যাতনামা খৃষ্টধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে হিন্দু বালকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত করেন।[৩] রমাপ্রসাদ দেবেন্দ্রনাথকে এই বিদ্যালয় স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং এই বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও রাজনারায়ণ বসু উহার পরিদর্শক ছিলেন।

শিক্ষা পরিষদ

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত একটি শিক্ষা পরিষদ এদেশে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিতেন এবং শিক্ষাবিষয়ক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতেন। রমাপ্রসাদ কিছুকাল এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষাপ্রবর্তনের প্রথম যুগে পরিষদকে বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। সে সকল প্রশ্নের সমাধানে মনীষী রমাপ্রসাদের সুচিন্তিত মন্তব্যাদি যে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার ভারত গভর্নমেণ্ট বাঙলা গভর্নমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন যে যুক্তপ্রদেশে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর গুণে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য সেইরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত করার ঔচিত্য সম্বন্ধে বাঙলা গভর্নমেণ্টকে বিবেচনা করিতে বলেন। বাঙলা গভর্নমেণ্টের অনুরোধে এই সময়ে রেভারেণ্ড জেম্স লঙ মুদ্রিত

বাঙলা পুস্তকাদির ও তাহার রচয়িতৃগণের নামের তালিকা সম্বলিত সুপ্রসিদ্ধ রিপোর্ট লিখেন এবং রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি শিক্ষাপরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের সুচিন্তিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। বর্তমান প্রস্তাবে রমাপ্রসাদের এই সকল মন্তব্যাদির (Minutes) পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে রমাপ্রসাদ উহার প্রথম 'ফেলো' বা সদস্য নির্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে তিনি ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রধান সদস্য ছিলেন। এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যও রমাপ্রসাদ যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

বেথুন স্মৃতিসভা

শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সহিত রমাপ্রসাদের অত্যন্ত সৌহার্দ্য ছিল। বেথুনের মৃত্যুর পর বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ২২ আগষ্ট দিবসে মেডিক্যাল কলেজের হলে একটি বৃহৎ সভা আহূত করেন। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি এই সভায় নিম্নোদ্ধৃত প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং বেথুনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে পঞ্চাশ টাকা দান করেন :

That this meeting desires to record its deep sense of the loss which the cause of education and the general advancement of the people of this country have sustained by the lamented death of the Hon'ble J.E.D. Bethune. From the day he landed in India to his last hour, his unceasing endeavours and best energies were devoted to the improvement of the Native mind and the elevation of the Native character. For the attainment of these noble ends, he made himself accessible to the humblest individual sacrificing his time, health and money with rare disinterestedness. Not satisfied with his exertions to advance the best interests of man in British India, he made it the project of his hourly thoughts and darling hopes to elevate woman in the social scale by that which only can be effectual to that end, education, with an earnestness, a self-devotion and a munificence which will ever live in the recollection of a grateful people.

বেথুন সভা

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাপরিষদের ও কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সম্পাদক ডাক্তার এফ্ জে মৌয়েট কতিপয় ইউরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতায়

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব ও শিক্ষা পরিষদের সভাপতি পরলোকগত ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মরণার্থে 'বেথুন সোসাইটী' নামক একটি সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগস্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। এই সভা এক্ষণে জীবিত নাই, কিন্তু এককালে ইহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল এবং এদেশের অনেক কল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার রোয়ার, ডাক্তার চিভার্স, কর্ণেল গুডউইন্, কর্ণেল ম্যালিসন, রেভারেণ্ড ডল, রেভারেণ্ড স্মিথ, হেনরী উড্রো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইউরোপীয়গণ এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র বসু, প্যাঁরীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সূর্য্যকুমার গুডিব্ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রলাল সরকার, নবীনকৃষ্ণ বসু, কালীকুমার দাস প্রভৃতি বাঙালি মনীষীগণের বাগ্মিতায় যখন সভাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত তখন উহার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! গভর্নর জেনারেল, লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এই সকল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য সভাগৃহে আগমন করিতেন। মধ্যে এই সভা একবার অতি হীনাবস্থায় পতিত হয়। এমন কি, উহা বিলুপ্ত হইবারও সম্ভাবনা হয়। এই সময়ে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে) সভার কয়েকজন হিতৈষী পুরাতন সভ্য সভাকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্‌কে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত করেন। ডাক্তার ডফ্ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহের সহিত এই সভার সভাপতিত্ব স্বীকার করেন। তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই উহাকে নূতন জীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কার্যের সুবিধার জন্য তিনি এই সভাকে ছয়টী শাখার বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক শাখার কার্য সুসম্পাদিত করিবার মানসে উপযুক্ত ও বিচক্ষণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া দেন। এই শাখাগুলি ও তাহার সভাপতি ও সম্পাদকদিগের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য :

শিক্ষা	সভাপতি—মিষ্টার হেনরী উড্রো সম্পাদক—বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র
সাহিত্য ও দর্শন	সভাপতি—মিষ্টার, ই, বি, কাউয়েল সম্পাদক—বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বিজ্ঞান ও শিল্প	সভাপতি—মিষ্টার এইচ, এস, স্মিথ সম্পাদক—মিষ্টার. জে রীজ্
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতি	সভাপতি—ডাক্তার নরম্যান চিভার্স পরে ডাক্তার ব্রুহাম সম্পাদক—বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু

সমাজবিজ্ঞান	সভাপতি—মিষ্টার জেম্স্ লঙ্ সম্পাদক—বাবু কালিকুমার দাস
এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি	সভাপতি—বাবু রমাপ্রসাদ রায় সম্পাদক—বাবু হরচন্দ্র দত্ত

শেষোক্ত শাখায় এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ক প্রশ্নাদির আলোচনা হইত। এই আলোচনায় এতদ্দেশীয় সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির প্রয়োজন বলিয়া, (ডাক্তার ডফের কথায়) "a native gentleman of the highest qualification"—রমাপ্রসাদ রায়কে উহার সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১৫ মার্চ দিবসে বেথুন সভায় মিষ্টার ওয়াইলি নামক একজন ইউরোপীয় "হ্যানামুন ও স্ত্রীশিক্ষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি ডাক্তার ডফ্ রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রেভারেণ্ড মিষ্টার সি, এইচ, এ, ডল্, রমাপ্রসাদ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালীকুমার দাস, সার বার্টল্ ফ্রেয়ার (পরে বোম্বাইয়ের গভর্নর) প্রভৃতি এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। রেভারেণ্ড ডল্ এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে, ধনী ও ক্ষমতাশালী হিন্দুগণ তাঁহাদের গৃহে খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে আপত্তি করিয়া থাকেন শুনা যায়, সেই কথা সত্য কি না। রমাপ্রসাদ ইহার উত্তরে বলেন যে আজিকালি সচরাচর কেহ সেরূপ আপত্তি করেন না। ত্রিশ বৎসর, এমন কি দশ বৎসর পূর্বেও এ বিষয়ে আমাদের যে সংস্কার ছিল এক্ষণে তাহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে গভর্নমেণ্ট যথোচিত সাহায্য করিতেছেন না বলিয়াই স্ত্রীশিক্ষা এদেশে তাদৃশ বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিতেছে না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৮ নভেম্বর দিবসে বেথুন সভায় ডাক্তার ডফ্ ঘোষণা করেন যে পরবর্তী এপ্রিল মাসে রমাপ্রসাদ রায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক শাখার কার্য বিবরণী পাঠ করিবেন। কিন্তু কোনও কারণবশত উহা ঐ বৎসর পঠিত হয় নাই। বেথুন সভার কার্যবিবরণী নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় এক্ষণে জানিতে পারা যায় না যে পরে রমাপ্রসাদ কোনও অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন কি না।

কল্‌ভিন স্মৃতিসভা

সদর আদালতের অন্যতম বিচারপতি মিষ্টার জন রাসেল কলভিন্ রমাপ্রসাদকে খুব স্নেহ করিতেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্নর হন। সিপাহীযুদ্ধের সময় তিনি যথেষ্ট কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম ও উদ্বেগে জরাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ

করেন এবং আগ্রা দুর্গে সমাহিত হন। রমাপ্রসাদ তাঁহার এই পরম উপকারকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে মেটকাফ হলে একটি সভা আহূত করেন এবং একটি মনোরম বক্তৃতা করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জেমস্ কল্‌ভিন্, এডভোকেট জেনারেল মিষ্টার উইলিয়ম রিচি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণও এই সভায় বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষ

রমাপ্রসাদ নীরবকর্মী ছিলেন, হুজুগপ্রিয় ছিলেন না। দেশহিতকর সভাসমিতির কার্যে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল কিন্তু তিনি নিষ্ফল রাষ্ট্রীয় আন্দোলনাদিতে যোগদান করিতে ভালবাসিতেন না বা বক্তারূপে প্রসিদ্ধিলাভের প্রয়াস পাইতেন না। প্রকাশ্য সভাসমিতিতে তিনি যে দুই একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার গভীর চিন্তাশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবের উচ্ছ্বাসে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়কে অভিভূত না করিয়া তিনি সুচিন্তিত মন্তব্যের দ্বারা তাহাদিগের মনকে মুগ্ধ করিতেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীদিগের সাহায্য কল্পে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২১ জানুয়ারী দিবসে চেম্বার অব কমার্স সভার গৃহে কলিকাতাবাসী একটি সাধারণ সভা আহূত করেন। এই সভায় রমাপ্রসাদই সর্বপ্রথমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ ও তন্নিবারণের প্রকৃত উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

> আমি স্বয়ং অনুধাবন করিয়া যাহা দেখিয়াছি এবং অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বাঙলা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সমাজে বর্তমান অবস্থায় বিলক্ষণ প্রভেদ আছে ! বাঙলার সর্বত্র প্রাচুর্য, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সর্বত্র দারিদ্র্য ও অভাব পরিলক্ষিত হয়। সত্য বটে, স্থানে স্থানে প্রভূত ঐশ্বর্যশালী ভূম্যধিকারী পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু তাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া পঞ্চাশ বা একশত মাইল দূরে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল মাত্র অভাব ও দারিদ্র্যে প্লাবিত। এই সভায় একজন একটি কাল্পনিক বিপদের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে সেরূপ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারীদিগের সাহায্যে কোন ফল ফলিবে না। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি এইরূপ বিপদ আসে তাহা হইলে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বর্তমান সময়ে বা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ন্যায় উহা তত ভীষণ আকার ধারণ করিবে না। উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় ভূমিকর সংক্রান্ত ব্যবস্থার ফলে সেখানে জমিদারশ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে—জমিদারগণ কেবল মাত্র পত্তনিদারে পরিণত হইয়াছেন, এবং যদিও আমি বলিতেছি না যে প্রধানত সেই দেশের ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার দোষেই এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তথাপি আমার স্থির বিশ্বাস যে তত্রত্য অধিবাসিগণের সুখ-দুঃখের সহিত এই রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থা অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত আছে এবং গভর্নমেণ্টের এই সকল ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা অবশ্যকর্তব্য।

লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সার

এই সময়ে রমাপ্রসাদ বৎসরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করিতেছিলেন। লর্ড ক্যানিং ও স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট রমাপ্রসাদকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কোনও নূতন বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে জটিল প্রশ্নাদি উত্থাপিত হইলে তাঁহারা রমাপ্রসাদের অভিমত জানিতেন এবং অধিকাংশ স্থলে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। Civil Procedure Bill, Rent Bill, Sale Law, Penal Code, Criminal Procedure, Limitation Laws, Income Tax Act প্রভৃতি অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে তিনি গভর্নমেণ্টের অনুরোধে তাঁহার অভিমত ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভা তাঁহার মন্তব্যের দ্বারা অনেক উপকৃত হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের যে বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি মিষ্টার বোফোর্টের স্থানে লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সারের পদে নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্বে কোনও বাঙালি এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। এই পদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিয়াও তিনি ওকালতী করিতেন।

"ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী"

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। এই সময়ে তিনি বিশ্রামের জন্য মধ্যে মধ্যে আলমবাজার বা রাণীগঞ্জের উদ্যানবাটিকায় সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু রমাপ্রসাদের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অলস ভাবে সময় অতিবাহিত করা অসম্ভব। তিনি এই সময়ে আইনগ্রন্থাদির টীকা প্রণয়ন করিতেন। এই সময়ে How we are governed নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন করিয়া তিনি "ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী" নামক একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত করিতে স্বর্গীয় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীকে সাহায্য করেন। পুস্তকখানি সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যরূপে নির্ধারিত ছিল। এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে রমাপ্রসাদ কতদূর সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা পুস্তকখানির ভূমিকাদৃষ্টে প্রতীত হয়। এই গ্রন্থখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের আদেশানুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট লর্ড ক্যানিং-এর অনুমতি লইয়া রমাপ্রসাদকে এই সভার

অন্যতম সদস্য নির্বাচিত করেন। এই সভায় আরও তিনজন দেশীয় সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও অতি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও মৌলবী (পরে নবাব) আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের যোগ্যতায় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন দেশীয় সদস্যই রমাপ্রসাদের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় রমাপ্রসাদের কার্য সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন :

> In the Legislative Council of Bengal to which he was nominated on its formation as a Government member, we may say that he was the only man who shewed mettle at all. He approached the questions before it with an intelligence, an appreciation of public wants and feelings, a sagacity, boldness and an authority that certain knowledge and strong intellect always give, which not only defied opposition in the Council, but challenged admiration out of it.

ক্যানিং স্মৃতিরক্ষা সভা

করুণার অবতার লর্ড ক্যানিং-এর ভারত পরিত্যাগকালে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের ব্যবস্থার জন্য দেশবাসীগণ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারী দিবসে টাউন হলে একটি বিরাট সভা আহূত করেন। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া একটি মনোরম বক্তৃতা করেন। এই প্রস্তাবে ক্যানিং-এর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তির জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডের কোনও উপযুক্ত শিল্পীর নিকট বসিতে অনুরোধ করা হয়। কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত রমাপ্রসাদের ইংরাজী বক্তৃতাটির মর্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

> ' আমি তৃতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি এবং অতীব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতেছি। রাজকর্মচারী বলিয়া এইরূপ সাধারণ সভায় সাধারণ অবস্থায় আমি যোগদান করিতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমি সেরূপ কোনও সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি না। আমার মনে হয় যে কোন ব্যক্তি রাজকর্ম গ্রহণ করিলেই যে তাহাকে জাতীয়ত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে, সকল সৎ ও মহৎ ভাবের অনুভূতি বিসর্জন দিতে হইবে, ন্যায়পরতা ও মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত হইতে হইবে এবং যাঁহারা ন্যায়ত আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এইরূপ যুক্তি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ! ভদ্র মহোদয়গণ, আমরা আজ একটি বিশেষ এবং অসাধারণ কার্যোপলক্ষে সমবেত হইয়াছি। শাসনকার্যের অবসানে গৃহপ্রত্যাগমনোন্মুখ গভর্নর জেনারেলকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদানের জন্য এই বিশাল রাজধানীর অধিবাসীগণ

যে এই প্রথম সমবেত হইলেন তাহা নহে। বহুবার আমরা এই উদ্দেশ্যে পূর্বে সম্মিলিত হইয়াছি ! কিন্তু মহাশয়গণের স্মরণ থাকিতে পারে যে সেই সকল সভা ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত, ইউরোপীয়গণ কর্তৃক আহূত এবং ইউরোপীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। আজিকার এই বিরাট সভা ভারতবাসীর দ্বারা আহূত। ইহা কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের সভা নহে, শাসক সম্প্রদায়ের ইঙ্গিতে এই সভা আহূত হয় নাই। পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আজিকার এই সুন্দর সন্ধ্যায় ভারতবর্ষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রকে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন।

ভদ্র মহোদয়গণ, যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলেও এই ক্ষুদ্র বক্তৃতায় ভারতবর্ষের জন্য লর্ড ক্যানিং যে প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। সে সকল কার্যের পুনরালোচনা করিলে হয়ত আপনারা এমন কিছু দেখিতে পাইবেন না যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায় বা হৃদয় বিমুগ্ধ হয়। বিরাট অথবা গৌরবময় যুদ্ধ সংঘটিত ও বিজিত হইয়াছে, বিশাল রাজ্যবিস্তৃতি ঘটিয়াছে, তাঁহার শাসনকালে আপনারা হয়ত এরূপ ঘটনার কথা শুনিতে পাইবেন না, কিন্তু মহাশয়গণ, লর্ড ক্যানিং এমন কতকগুলি স্থায়ী উন্নতি সাধিত করিয়াছেন, আপনাদের কল্যাণের জন্য, আপনাদের প্রিয়তম অধিকারগুলি রক্ষার জন্য, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য, এমন অত্যাবশ্যকীয় কার্যসমূহ অনুষ্ঠিত করিয়াছেন, যে সে সকলের আলোচনা করিলে আপনারা এবং আপনাদের উত্তরপুরুষগণ ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারক বলিয়া লর্ড ক্যানিং-এর নাম চিরদিন পূজা করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান দেখিবেন। কোনও জাতির ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই—ভারতবর্ষের সেই মহাসঙ্কটকালে তিনি কিরূপে আমাদিগকে এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্ববর্তী বক্তাদের পর আমাকে কি তাহা পুনরায় বিবৃত করিতে হইবে? যখন ইউরোপীয়দিগের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যখন আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর মধ্যে কয়েকজন মাত্র ভ্রান্ত ব্যক্তির নৃশংস কার্য তাঁহাদিগকে প্রতিহংসাগ্রহণে ও বৈরনির্যাতনে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন এই মহাপুরুষের অদম্য সাহস, অবিচলিত ন্যায়পরতা, সংযম ও মনুষ্যত্ব, অগণ্য নির্দোষীকে অকাল ও কলঙ্কিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল, মহারাজ্ঞীর রাজভক্ত লক্ষ লক্ষ প্রজা তাহাদের জীবন ও হৃতসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাঁহারই কৃপায় আজি আমরা এই বৃহৎ সভায় স্বাধীন নাগরিকরূপে বিদ্যা ও ঐশ্বর্যের গৌরব লইয়া সমবেত হইতে সমর্থ হইয়াছি। মহাশয়গণ, ইহা তাঁহার শাসনকালের অন্ধকারময় দুর্দিনের কথা—যাহাকে হিন্দুমতে তাঁহার শাসনের লৌহযুগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি তাঁহার শাসনকালের সুবর্ণযুগের কথা—সুদিনের কথা—স্মরণ করেন তাহা হইলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে দেশের মধ্যে শান্তি ও ঐক্যস্থাপন এবং ভারতবর্ষের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের দ্বারা তাঁহার শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসর বিশেষিত হইয়াছে। অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ নীরব এবং কামানের মুখ বন্ধ হইবামাত্র লর্ড ক্যানিং সকলকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে না দেখিয়া (হয়ত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা সে

অবস্থায় দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না) অসাধারণ মহত্ত্বসহকারে ধীর ও শান্তভাবে, রাজভক্ত ও রাজদ্রোহীদিগকে ন্যায়পরতা অথবা করুণার সহিত বিচার পূর্বক যথাযোগ্যভাবে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

"মহাশয়গণ, অযোধ্যার বাজেয়াপ্ত ভূ-সম্পত্তি প্রত্যর্পণের কথা সেই প্রদেশের নূতন বন্দোবস্তের কথা, শিশুহত্যা নিবারণের কথা স্মরণ করুন, অথবা স্বধর্মানুসারে এতদ্দেশীয় রাজা মহারাজাদিগের দত্তক পুত্রগ্রহণের প্রতিবন্ধকাদি বিদূরিত করিবার কথা স্মরণ করুন, অথবা বিচারবিভাগের সংস্কারের কথা, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে জীবন ও সম্পত্তি নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে দিবার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যবিধি প্রণয়নের কথা, শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহদানের কথা, অর্থশাস্ত্রসম্মত নিয়মানুসারে ইউরোপীয় মূলধনের আমদানী করিয়া দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির কথা স্মরণ করুন, এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষার চেষ্টার কথা, ভূমিস্বত্ব ও পতিত জমি বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির কথা স্মরণ করুন, আপনারা দেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষের কল্যাণই লর্ড ক্যানিং এর চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল। তাঁহার শাসনকার্যের সর্বপ্রধান কীর্তিস্তম্ভ—যাহাকে ভ্রান্তলোক 'নেটিভ' রাজ্যশাসন প্রণালী বলেন—সেই জাতীয় রাজ্যশাসন পদ্ধতি প্রচলনের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই পদ্ধতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লর্ড ক্যানিংএর শাসনকালেই উহা প্রচলিত হয়। ভূম্যধিকারী এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে দেশ, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে দেশের উন্নতি বিধানের জন্য দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়া তিনি ভারতবর্ষে একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত করিয়াছেন এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় সর্বোচ্চ রাজকার্যে দেশীয়দিগকে ইউরোপীয়দিগের সহিত সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি কখনও কল্পনাও করিতে পারিতেন, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাঁহাদের কি তাহা শুনিবার সম্ভাবনা ছিল, যে রাজা দিনকর রাও বা রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের ন্যায় দেশবাসী বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি ও লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের সহিত সাম্রাজ্যশাসন সভায় একত্রে উপবেশন করিয়া সেই অতুল প্রতাপান্বিত শাসনকর্তাদিগকে দেশহিতকর বিষয়ে পরামর্শ দিবেন?

"ভদ্রমহোদয়গণ, এই সকল এবং এইরূপ কার্যের দ্বারা লর্ড ক্যানিং মহারাজ্ঞীর সাম্রাজ্যে শান্তি, সুখ, সন্তোষ ও রাজভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য, তাঁহার সদনুষ্ঠান সমূহের স্মৃতিরক্ষার জন্য, তাঁহার বিচক্ষণ এবং উদার নীতি দ্বারা পরিচালিত সৎকার্যের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য আমরা অদ্য এইস্থানে সমবেত হইয়াছি, এবং ইহা আশা করা যায় যে, আমরা অদ্য এই সভায় যাহা করিব এবং সঙ্কল্প করিব তদ্দ্বারা জগতকে দেখাইতে পারিব যে সুশাসনকর্তার সৎকার্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে এবং তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে ভারতবর্ষ কখনই পশ্চাদপদ নহে !

"মহাশয়গণ, যে মহাত্মাকে আমরা শোকাকুলিত হৃদয়ে বিদায় দিতেছি তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত কি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হওয়া উচিত তাহা আমি কল্পনা

করিতে অক্ষম। কিন্তু যে প্রস্তাবটি আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে তাহা গ্রহণ করিতে বলিবার সময় আমি আগ্রহের সহিত এই অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা যে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবেন তাহা যেন লর্ড ক্যানিংএর উপযুক্ত হয়, তাঁহার মহৎ এবং প্রশংসনীয় কার্যের উপযুক্ত হয় এবং ভারতবর্ষ ও তাহার লক্ষ লক্ষ অধিবাসী, যাহাদের প্রতিনিধিরূপে আপনারা এস্থানে সমবেত হইয়াছেন, তাহাদের উপযুক্ত হয়।

লর্ড ক্যানিংকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার জন্য এই সভায় যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নির্বাচিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ অন্যতম। রমাপ্রসাদ লর্ড ক্যানিং -এর স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং স্মৃতিরক্ষার জন্য পাঁচশত টাকা দান করিয়াছিলেন।

গ্রাণ্ট স্মৃতিরক্ষা সমিতি

দুই মাস পরে সর্বজনপ্রিয় লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর স্যর জন্ পিটর গ্রাণ্টকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে যে সকল দেশনায়ক তৎসমীপে গমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যেও রমাপ্রসাদকে দেখিতে পাওয়া যায়। রমাপ্রসাদ তাঁহার স্মৃতিরক্ষা সমিতির অন্যতম সদস্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি

পূর্বে এদেশে সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট নামক দুইটি সর্বপ্রধান বিচারালয় ছিল। সদর আদালত বা কোম্পানির আদালতে মফঃস্বল কোর্টের মোকদ্দমার আপীল শুনা হইত। এই আদালতে বিচারপতিদিগের দেশের আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন বলিয়া এতদ্দেশীয় বিচারকগণের মধ্য হইতে ইঁহারা নির্বাচিত হইতেন। সুপ্রিমকোর্টের বা মহারাজ্ঞীর আদালতের বিচারপতিগণ বিলাত হইতে আসিতেন। বলা বাহুল্য, এই দুই আদালতের বিচারপতিদের মধ্যে প্রায় মনোমালিন্য ঘটিত। দুইটি বিচারালয় একত্র করিয়া একটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে একবার উঠিয়াছিল কিন্তু কোন কারণ বশত উহা স্থাপিত করা তখন যুক্তিযুক্ত বোধ হয নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্যর চার্লস উড্ পার্লিয়ামেণ্টে হাইকোর্ট স্থাপনের কথা পুনরায় উত্থাপিত করেন এবং বিচারপতি নিয়োগ সম্বন্ধেও নূতন নিয়মাদি প্রবর্তিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মহাত্মা লর্ড ক্যানিং তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ উদারতার সহিত "expressed a decided opinion that Native Judges well trained, were as well qualified as any other persons to take their places by

the side of English Judges in the High Court."

রমাপ্রসাদের অপূর্ব প্রতিভা দেখিয়াই যে লর্ড ক্যানিং তাঁহার এই অভিমত গঠিত করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। লর্ড এল্‌গিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মাননীয় টি, জে, হভেল-থার্লো (Hon'ble T, J. Hovell-Thurlow) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "The Company and the Crown" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

> On its (High Court) bench two new and startling precedents had been adopted. Natives were to be appointed to this high tribunal, with power to judge our countrymen in criminal as well as civil cases ; and for the first time, natives of high rank became entitled to the same emoluments as their English colleagues. * * * The statutes of the Court had been thus liberally framed, bearing in view a man of proved integrity and parts, Ramapersad Roy was a name, at the very sound of which corrupt vakeels or pleaders quitted court. He was without price, and the office had been made for him ; but ere the letters patent had reached Calcutta he had died. Shumbhoonath Pundit Roy Bahadoor indeed was found to reap the honours invented for another ; but the new High Court went forth shorn of is greatest ornament.

প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও অবশেষে এই বৎসর পার্লিয়ামেণ্টের নূতন বিধি দ্বারা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা মঞ্জুর হইল এবং একজন দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করিবারও আদেশ আসিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। রমাপ্রসাদ অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন না যিনি এই পবিত্র ধর্মাধিকরণে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড এল্‌গিন্‌ তাঁহাকে এই পদের জন্য মনোনীত করিলেন এবং মাননীয় মিষ্টার হ্যারিংটনকে দিয়া রমাপ্রসাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে ভারতসম্রাজ্ঞী তাঁহাকেই এই উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তখন অত্যধিক পরিশ্রমজনিত রোগে রমাপ্রসাদ মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন। দেশবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা দেখিয়া রমাপ্রসাদের আনন প্রফুল্ল হইল। তিনি হ্যারিংটনকে ধন্যবাদ দিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "আমি এখন উচ্চতর বিচারালয়ের সম্মুখে যাইতেছি। নিয়োগ পত্র লইয়া আমি কি করিব?"[৪]

পরলোকগমন

বাস্তবিক ব্যবস্থাপক সভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য, লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সারের পরিশ্রমসাধ্য কার্য, সদর আদালতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবের কার্য, এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্যের গুরুভারে রমাপ্রসাদ বহুদিন হইতেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি দিন রাত্রি

তিনি কর্মে নিরত থাকিতেন। মানুষের শরীরে কত সহ্য হয়? ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি যকৃতরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। ডাক্তার ওয়েব, ডাক্তার গুডিব, ডাক্তার ম্যাক্‌রে, ডাক্তার গুপ্ত, সূর্য্যকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি শহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের প্রাণপণ চেষ্টাতেও রোগের উপশম হইল না। বাহির সিমুলিয়ার বাটী হইতে চৌরঙ্গীতে স্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া চিকিৎসা করা হইতে লাগিল। যখন রোগে শয্যাগত তখনও রমাপ্রসাদ দেশের কথা ভুলেন নাই। তিনি আত্মীয় বন্ধুগণকে সংবাদপত্র পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে বলিতেন এবং জনহিতকর অনুষ্ঠানাদির সংবাদ লইতেন। যখন ইংলিশম্যানের টেলিগ্রাম লর্ড ক্যানিং-এর মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিল, তখন রমাপ্রসাদের নয়নে অশ্রু দেখা দিল। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভারতবর্ষ তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারাইয়াছে!" সেইদিন হইতে তাঁহার মনে একপ্রকার ধারণা হইল যে তাঁহারও মৃত্যুকাল আসন্ন। তাঁহার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাননীয় মিষ্টার হ্যারিংটন, মাননীয় মিষ্টার রেকস, প্রফেসর লীজ, মিষ্টার কক্রেন্ প্রভৃতি সুপ্রিম কৌন্সিলের সদস্য, জজ, গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারী, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক হইতে সামান্য ব্যক্তি পর্যন্ত রমাপ্রসাদের সকল শ্রেণীর বন্ধু ও প্রতিভাপূজকগণ তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য সংবাদ লইতে লাগিলেন। কিন্তু দেশবাসীর ও বিদেশবাসীর শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতির আধার, রমাপ্রসাদের কাল পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১ আগষ্ট (১৮ শ্রাবণ ১২৬৯ বঙ্গাব্দে) শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বঙ্গদেশ একটি প্রকৃত সন্তান রত্ন হারাইলেন।

স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা

রমাপ্রসাদের মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ শোকে কাতর হইয়াছিল। ইংলিশম্যান, হরকরা প্রভৃতি ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্রও উচ্চকণ্ঠে তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'সোম-প্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে প্রতীত হয় যে এদেশে রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনেরও চেষ্টা হইয়াছিল :

> ঢাকাপ্রকাশে বরিশাল হইতে একজন লিখিয়াছেন, তত্রত্য উকিল বাবু বিশ্বেশ্বর দাসের যত্নে তাঁহার বাটীতে রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণার্থ এক চাঁদা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮০০্ টাকা উঠিয়াছে, রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণার্থ কি চিহ্ন করা হইবে, সভা এখনও তাহা স্থির করেন নাই। এই টাকা ভারতবর্ষীয় সভার নিকটে প্রেরিত হউক। হরিশ সমাজ-গৃহ[৫] নির্মিত হইলে তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ বাবুর এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি, আরও অধিক টাকা সংগৃহীত হইলে তাঁহার প্রস্তরময়ী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি করা কর্তব্য হরিশ সমাজ-গৃহকে আমাদিগের জাতিসাধারণ মৃতস্মরণার্থ গৃহ করা কর্তব্য। (সোমপ্রকাশ ১০ ভাদ্র ১২৬৯)

কিন্তু এ পর্যন্ত কোথাও রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহার স্মৃতিচিহ্নের অভাব যে আমাদের জাতীয় কলঙ্কের বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।[৬]

রমাপ্রসাদের উত্তরাধিকারিগণ

রমাপ্রসাদের প্রথমা সহধর্মিণী অতি অল্পবয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রমাপ্রসাদ ঁমৃত্যুঞ্জয় আগমবাগীশের কন্যা দ্রবময়ীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে সন ১২৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন এবং সন ১২৫৭ সালের কার্ত্তিক মাসে কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীমোহনের জন্ম হয়। ১৩০৩ সালের ১০ চৈত্র (২২ মার্চ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) হরিমোহনের মৃত্যু হয়। তিনি কোনও পুত্রসন্তান রাখিয়া যান নাই, তাঁহার কন্যার বংশধরগণ তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। প্যারীমোহনও সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহারও কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চরিত্র

রমাপ্রসাদ বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্তিস্বরূপ ছিলেন। পিতামাতার প্রতি ভক্তিতে রমাপ্রসাদ আদর্শস্থানীয় ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত করিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল। রামমোহনের পরম বন্ধু রেভারেণ্ড উইলিয়ম আডামকে তিনি জীবনচরিত লিখিতে অনুরোধ করেন এবং দশ সহস্র মুদ্রা পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু আডাম সাহেবের ভারতবর্ষে পুনরাগমনের পূর্বেই রমাপ্রসাদ পরলোকে গমন করেন। রমাপ্রসাদ মনীষী ও মনস্বী পুরুষ ছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে লিখিয়াছেন, "তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি কেবল বুদ্ধিবলেই এতদূর সম্মান, গৌরব ও যথেষ্ট অর্থ (কেহ বলে ২০, কেহ বলে ৩০ লক্ষ টাকা) অর্জন করিয়াছিলেন! তাঁহার স্বভাব বিনীত ও নম্র ছিল, এই গুণে কি য়ুরোপীয়, কি এদেশীয় অনেক প্রধান লোকের সহিত তাঁহার সবিশেষ আত্মীয়তা ও বন্ধুতা জন্মে।" রমাপ্রসাদের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রস্তাব হইতে উপরিলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় রমাপ্রসাদের চরিত্রের দোষগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

> কিন্তু তাঁহার স্বভাবগত একটি অনুষ্ণতা দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হইত। এই অনুষ্ণতা দোষ নিবন্ধনই তাঁহার প্রকৃত মনস্বিতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি কয়েকটি সদগুণের অসদ্ভাব ছিল।

*** তাঁহার অল্পমাত্রও সৎক্রিয়াসাহস ছিল না, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পিতা হিন্দুসমাজে খ্যাতিলাভ বাসনা পরিত্যাগ ও অন্য অন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বদেশের ধর্ম ও আচার ব্যবহারাদিগত দোষ সংশোধন চেষ্টা করিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় লইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; তিনি অসার, অপদার্থ ও অসতের নিন্দা ও কটুবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া অকুতোভয়ে যে সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়া যান রমাপ্রসাদ তাঁহার পুত্র হইয়া কেবল এক সৎক্রিয়াসাহস বিরহে সেই পথের পথিক হইতে পারিলেন না। প্রত্যুত তিনি সেই প্রাচীন পঙ্কময় ভগ্নপথের পথিক হইয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ঘৃণাব পাত্র হইয়াছিলেন।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে অপূর্ব তেজস্বিতা ও অদ্ভুত সৎক্রিয়া-সাহস দ্বারা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশাচারের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া বিধি স্বদেশহিতকর সমাজ সংস্কারাদি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের সেইরূপ তেজ বা সৎক্রিয়ার সাহস ছিল না। দেশের কল্যাণকর সকল অনুষ্ঠানের সহিত গভীর সহানুভূতিসত্ত্বেও রমাপ্রসাদের সকল কার্যেই তাঁহার সংযম, মিতাচার ও রক্ষণশীলতা পরিলক্ষিত হইত। এই রক্ষণশীল ভাব যে তাঁহার গভীর চিন্তাপ্রসূত ইহা অনেকেই বিস্মৃত হইতেন। আমাদের বোধ হয় যে বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা, উদারতা ও বিবেকানুবর্তিতা যিনি আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সমাজ-সংস্কারপ্রয়াসী সম্পাদক দ্বারকানাথ, রমাপ্রসাদের চরিত্র অতি কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, এমনকি, তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অনেক সময়েই দেখা যায় যে উষ্ণ স্বভাববিশিষ্ট সংস্কারকগণ নির্ভীকভাবে বিবেকের আদেশ অনুপালন করিতে গিয়া, দেশের চিরানুসৃত আচার ব্যবহারাদি প্রবলভাবে আক্রমণ করিতে গিয়া, এরূপ বাধাপ্রাপ্ত হন যে তাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিসত্ত্বেও তাঁহারা ঈপ্সিত সংস্কার প্রবর্তিত করিতে সমর্থ হন না, অথচ শান্ত ও সংযতভাবে সেই সকল সংস্কারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, ধীরে ধীরে সুশিক্ষা দ্বারা কুসংস্কার সমূহ বিদূরিত করিয়া দূরদর্শী নীরবকর্মীরা বিনা বাধায় ক্রমে ক্রমে সমাজে সেই সকল সংস্কার সাধিত করিতে পারেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় সমাজ সংস্কারকগণও অনেক সংস্কারের প্রবর্তনে ইচ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক বিচক্ষণ নীরবকর্মীদের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতভাবে সমাজে সেই সকল সমাজ-সংস্কার প্রবর্তনের বাসনা যে বলবতী হইয়া উঠিতেছে একথা কে অস্বীকার করিবে? দূরদর্শিতাজনিত সংযমের ভাব অনেক সময়েই দূর হইতে সৎক্রিয়াসাহসের অভাব বলিয়া অনুমিত হয়।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রমাপ্রসাদের যে সৎক্রিয়াসাহসের অভাব বা রক্ষণশীলতা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) রমাপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র, তত্ত্ববোধিনী সভার একজন প্রধান সভ্য, এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ন্যাসরক্ষক ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার স্বর্গগতা বিমাতার আত্মার সদ্‌গতির জন্য হিন্দুমতে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মধ্যমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে রামমোহন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হিন্দু আচারানুসারে জননীর মুখাগ্নি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা সহধর্মিণীর[৭] মৃত্যুর বহুপূর্বেই রামমোহন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। লোকাপবাদ তুচ্ছ করিয়া, জননী যে ধর্মে বিশ্বাস করিতেন সেই ধর্মের অনুযায়ী আচার পদ্ধতি অনুসারে মাতৃভক্ত রমাপ্রসাদ তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর আত্মার তুষ্টিবিধান করিয়া যে বিশেষ দোষ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু এই বিষয় লইয়া তখন দেশে মহা আন্দোলন হইয়াছিল। একদিকে সংস্কারপ্রিয় ব্রাহ্মগণ রমাপ্রসাদের এই রক্ষণশীলতা দেখিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, অপরদিকে অতিরক্ষণশীল হিন্দু দলপতিগণ "বিধর্মী" রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদের হিন্দুধর্মানুযায়ী ক্রিয়ায় যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। "নুড়িঘাটা"র (পাথুরিয়া ঘাটার) "*** (খেলাত) চন্দ্র ঘোষ" প্রভৃতি অতিরক্ষণশীল হিন্দু দলপতিগণ রমাপ্রসাদের মাতৃশ্রাদ্ধে বিঘ্ন ঘটাইবার কিরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন, সর্বত্র এই বিষয় লইয়া কিরূপ আন্দোলন হইয়াছিল, লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে অবশেষে রমাপ্রসাদ কিরূপে মাতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় "হুতোম প্যাঁচার নক্সায়", লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে, আমাদের কেবল একটি কথা মনে হয় যে রমাপ্রসাদ উপনিষদের ধর্মগ্রহণের সহিত হিন্দুসমাজের চিরানুসৃত আচারাদি পদদলিত না করিয়া কি আমাদের একটি অমূল্য উপদেশ দিয়া যান নাই ; তিনি কি শিক্ষিত হিন্দুসমাজকে দেখান নাই যে দেশাচার লঙ্ঘন না করিয়াও প্রকৃত ব্রাহ্ম হওয়া যায় এবং ব্রাহ্ম সমাজকে দেখান নাই যে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? এই ইঙ্গিত ব্রাহ্মসমাজ বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ আজি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় কলুষিত ও গৃহবিচ্ছেদে ভগ্নবল হইয়াছে। পক্ষান্তরে, হিন্দুসমাজ এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া রমাপ্রসাদকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া, যে উদারতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই ফলে আজিও আচারনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রকৃত ব্রাহ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, শান্ত ও সংযতভাবে যে সংস্কার ধীরে ধীরে সমাজের হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে তাহার ফল বহুকাল স্থায়ী হয়। রমাপ্রসাদ জানিতেন সমাজ ভাঙিলেই সমাজ গঠিত হয় না।

(২) বিধবা বিবাহে রমাপ্রসাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রেও জানিতেন যে গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থা দ্বারা, বা প্রলোভনের দ্বারা, এতদ্দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা সম্ভবপর নহে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহিত, সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের সহিত, ভবিষ্যতে ইহা প্রচলিত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উহার প্রচলন অসম্ভব।

এ সম্বন্ধে তাঁহার মত যে খুব সমীচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেই তাঁহার দূরদর্শিতাজনিত অনুষ্ণতাকে সৎক্রিয়াসাহসের অভাব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তীরও প্রচার আছে। 'সঞ্জীবনী'তে কোনও লেখক একবার লিখিয়াছিলেন :

> শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ হয়। তখন কলিকাতার অনেক বড়লোক, এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন। লজ্জার বিষয় এই যে কেহই উপস্থিত হন নাই। এই বিবাহের পূর্বে তিনি স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন, "আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহ স্থলে নাই গেলাম?" এই কথা শুনিয়া ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওটা ফেলে দাও।" এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।

এতৎ সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "প্রকৃতি"তে লিখিয়াছিলেন

আমার পিতৃদেব গোপীনাথ রায় চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন তিনি (রমাপ্রসাদ), বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কহিয়াছিলেন, "আমার পিতা, সমাজ-সংস্কারের কসুর করেন নাই। তাতে তো কোনই ফল ফলে নাই। অতএব আর চেষ্টা পাওয়া বৃথা।" এই বলিয়া বিধবা বিবাহের সভায় যাইতে তিনি অস্বীকৃত হন। বিদ্যাসাগর ও রমাপ্রসাদবাবুর কথোপকথন সময়ে বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, পণ্ডিত কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের নিকটেও এই কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম।

"সংবাদ প্রভাকর"-এ প্রথম বিধবা-বিবাহের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় যে বিবাহস্থলে রমাপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং 'সঞ্জীবনী'র লেখকের গল্পে আস্থাস্থাপন করা যায় না। বিধবা-বিবাহে যে রমাপ্রসাদের সহানুভূতি ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ বিষয়েও রমাপ্রসাদ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপ্রণীত 'বহুবিবাহ' নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন : লোকান্তর নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়।

রামমোহন যে পথে গিয়াছিলেন রমাপ্রসাদ সে পথের পথিক হন নাই সত্য। কিন্তু তিনি "প্রাচীন পঙ্কময় ভগ্নপথের" পথিক না হইয়া নূতন পথে চলিলে কি সেই ভগ্ন-পথের সংস্কার সাধিত হইত? "ভগ্নপথে"র সংস্কার করিতে গেলে কি সেই পথে থাকিয়াই ধীরে ধীরে তাহার উন্নতি করিতে হইবে না?

পিতার তেজস্বিতার অধিকারী না হইলেও যে রমাপ্রসাদ শক্তিমান স্বদেশহিতৈষী ও বুদ্ধিমান নীরবকর্মী ছিলেন একথা সকলেই জানিতেন। বিদ্যাসাগরের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, "রমাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদে বিদ্যাসাগর অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, শক্তিপূজকের চিরকালই পূজনীয়। বিদ্যাসাগর প্রকৃত শক্তি-সেবী। রমাপ্রসাদ রায়ও প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি রমাপ্রসাদবাবুর বিয়োগ জন্য দুঃখিত হয়েন।"

রমাপ্রসাদ যে শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন একথা কে অস্বীকার করিবে। কৈশোরেই তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমনের সময় সমাজে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা ও রাজকার্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ছিলেন না, কিন্তু তিনি এতগুলি সদ্‌গুণের আধার ছিলেন যে তিনি চিরদিন তাঁহার দেশবাসীর স্মরণীয় থাকিবেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত The Company and the Crown নামক সুলিখিত গ্রন্থে লর্ড এলগিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিস্টার হভেল্‌-থার্লো রমাপ্রসাদের অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বাল্যকালে 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সহবাস নিবন্ধন তিনি লোকচরিত্রজ্ঞ, বিনয়ী, সদালাপী ও মিষ্টভাষী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের সুরুচিরও তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল গুণে এবং অদ্ভুত আতিথেয়তায় বিমুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার সহিত অকৃত্রিম সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য ইউরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুদিগের নামোল্লেখ করা দুঃসাধ্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র, রামলোচন ঘোষ, রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ, রেভারেণ্ড সি, এইচ, এ, ডল, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পিতৃবন্ধু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মাতুল মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্রকে তিনি তাঁহার সম্পত্তির এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদের অনন্যাসাধারণ মনীষা ও মনস্বিতা, অবিচলিত উৎসাহ ও অধ্যবসায়, অপূর্ব পরিশ্রমশীলতা ও কার্য্যদক্ষতা দেশবাসীর গৌরবময় আদর্শ হওয়া উচিত। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, দেশব্রত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তৎপ্রবর্তিত ও তৎসম্পাদিত "বেঙ্গলী" পত্রে রমাপ্রসাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের চরিত্র সমালোচনার উপসংহারে আমরা সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া পুনরায় বলি : "He was second to none of his contemporaries in point of genius, sound legal acquirements, sterling commonsense, breadth of view and genuine sympathy for the just rights of the ryots of this presidency."

সূত্রাবলি

১ অন্যান্য সদস্যের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য : রাজা কৃষ্ণনাথ রায়, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বৈকুণ্ঠ নাথ রায়চৌধুরী, রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দিগম্বর মিত্র, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, দীননাথ দত্ত, ব্রজনাথ ধর, প্যারীচাঁদ মিত্র। হরচন্দ্র ঘোষ এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

২ There is an English School at Bansbaria an ancient seat of Hindu learning, supported by Babu Debendra Nath Tagore and Rama Prasad Ray, the sons of distinguished fathers. It is established for the diffusion of vedantic principles."

৩ যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানিতে চাহেন তাহারা ১৮৩৮ শকের বৈশাখের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন।

৪ অমর কবি দীনবন্ধু তদ্বিরচিত 'সুরধুনী' কাব্যে রমাপ্রসাদের অকালমৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন :

> "আইন পারগ রমাপ্রসাদ প্রবর
> সাধিতে স্বদেশ হিত ছিলেন তৎপর।
> প্রথমে বিচারপতি সেই বিজ্ঞ হয়,
> অস্তমিত হ'ল কিন্তু না হতে উদয়,
> অভিষেক দিনে গেল শমন ভবনে,
> কোথা রাম রাজা হয় কোথা গেল বনে।"

৫ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, হিন্দু পেট্রিয়টের স্বদেশপ্রেমিক সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ একটি সমাজগৃহ নির্মিত হউক। Federation Hall যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হইবার কথা হয় উহাও সেই উদ্দেশ্যে নির্মিত হইবার কথা হয়। কালীপ্রসন্ন বাটী নির্মাণের জন্য দুই বিঘা পরিমিত জমি এবং অর্থসাহায্য প্রদান করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। এই সমাজ গৃহে লর্ড ক্যানিং এর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি ও স্যার জন পিটার গ্রাণ্টের তৈলচিত্র রক্ষিত হইবারও প্রস্তাব হয়। কিন্তু হরিশ-স্মৃতি-সমিতি অন্যরূপে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

৬ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সুকিয়া স্ট্রিটের একটি ক্ষুদ্র অপরিসর গলির নাম "রমাপ্রসাদ রায়ের লেন" রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাকে রমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন বলা যায় না।

৭ রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে Asiatic Journal-এ তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত অথচ বহুতথ্যপূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তাহা পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে, রামমোহন কিছুকাল হইতে তাঁহার কনিষ্ঠা সহধর্মিণীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। ধর্মমতের বিরোধই কি এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কারণ?
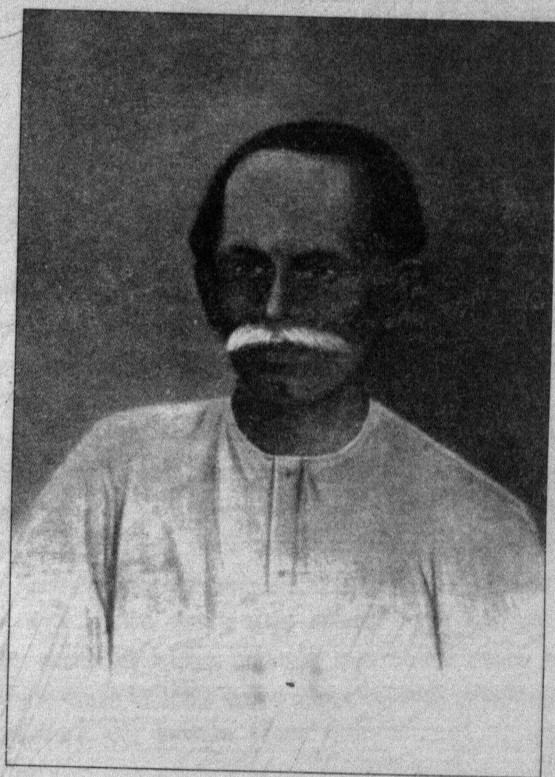
অক্ষয়কুমার দত্ত

মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত

উপক্রমণিকা

বাঙলা সাহিত্যের পবিত্র তপোবনে যে সকল জ্ঞানযোগী জীবনব্যাপী একাগ্র সাধনা দ্বারা বঙ্গবাণীর প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—তাঁহাদের জাতির সমক্ষে অনন্তকালের জন্য এক জ্যোতির্ময় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের স্থান অতি উচ্চে।

যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমণ্ডলী বাঙলা সাহিত্যের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া অভিনব ব্যাকরণ ও বানান সম্মত নূতন 'বাংলা' ভাষার সৃষ্টির সূত্রপাত করিতেছেন, তখন অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে আলোচনা হয়ত কালোপযোগী না হইতে পারে, কিন্তু প্রায় একশতাব্দীকাল যাঁহার রচনা পাঠ করিয়া ভেদ-বুদ্ধিবিরহিত বঙ্গবাসী মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়াছে, মাতৃভাষায় একদিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির বিদ্যা এবং অপরদিকে মৌলিক গবেষণা প্রসূত জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়াছে, তাঁহার জীবন ও অনুষ্ঠিত কার্যের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়ত কোনও কোনও পাঠকের মানস নয়নের সমক্ষে বাঙলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল পরিচ্ছেদের একটি অর্ধ-বিস্মৃত পৃষ্ঠা উদঘাটিত করিতে পারে।

জন্ম—(১৮২০ খৃষ্টাব্দ)

নবদ্বীপের দুই ক্রোশ উত্তরে চুপী নামক গ্রামে এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বঙ্গজ কায়স্থকুলে সন ১২২৭ সালের ১ শ্রাবণ (ইং ১৮২০ খৃষ্টাব্দ) অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন।

অক্ষয়কুমারের পিতা পীতাম্বর অতি সদাশয়, পরোপকারী ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি সামান্য বাঙলা জানিতেন এবং খিদিরপুরের টালিগঙ্গা নালার কুতঘাটের কেশিয়ার ও দারোগা ছিলেন। ইনি ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরমোহন দত্ত প্রভৃতির সহিত খিদিরপুরে

মনসাতলাতেই প্রায় অবস্থান করিতেন। হরমোহন দত্ত তৎকালে সুপ্রিমকোর্টে মাস্টার অফিসের বড়বাবু ছিলেন এবং তাঁহার আয়ও যথেষ্ট ছিল। হরমোহন তাঁহার পিতৃব্য পীতাম্বরের দয়াতেই শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং পরে সংসারের সমস্ত ব্যয়ভার সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমারের জননী দয়াময়ী কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী ইঁটলে গ্রাম নিবাসী রামদুলাল গুহের কন্যা। দয়াময়ী যথার্থই দয়াময়ী ছিলেন। তিনি হৃদয়ের নানা রমণীয় গুণগ্রামে বিভূষিতা ছিলেন। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা অতুলনীয় ছিল।

অক্ষয়কুমার তাঁহার জনকজননীর বিবিধ সদ্গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা (১৮২৫-১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ)

তৎকালীন প্রথানুসারে পঞ্চম বর্ষে অক্ষয়কুমারের "হাতে খড়ি" হয়। ইহার পূর্বেই তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত পুত্রগণকে পাঠশালায় যাইতে দেখিলে 'আমি লিখবো' 'আমি লিখবো' বলিয়া বায়না ধরিতেন। শৈশবে একদিন রৌদ্রের প্রখর তেজ দেখিয়া জননী পাঠশালায় সেদিন যাইতে নিষেধ করিলে অক্ষয়কুমার বলিয়াছিলেন, 'সকলের মা বলে, লিখ্তে যা, লিখ্তে যা, আমার মা বলেন, লিখ্তে যাস্নে, যাস্নে, যাস্নে।'

দশ বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্যন্ত অক্ষয়কুমার চুপীর পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং চাণক্য শ্লোকাদি মুখস্থ করেন।

স্বগ্রামেই তিনি আমিউদ্দীন নামক জনৈক মুন্সীর নিকট ফারসীভাষা এবং গোপীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

খিদিরপুরে আগমন এবং ইংরাজী শিক্ষা (১৮৩০-৩৯ খৃষ্টাব্দ)

দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অর্থাৎ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হরমোহন দত্ত তাঁহাকে খিদিরপুরে আনয়ন করেন এবং জয়কৃষ্ণ সরকার নামক জনৈক ইংরাজী শিক্ষকের নিকট তাঁহার ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু শিক্ষকের বাটীতে অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত শিক্ষা করিতে অসুবিধা বোধ হওয়ায় তিনি ভবানীপুর খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক পরিচালিত 'ইউনিয়ন স্কুলে' প্রবিষ্ট হন। ইঁহাদের বিদ্যালয়ে সেকালে বেতন দিতে হইত না, এমন কি পাঠ্যপুস্তকও বিনামূল্যে পাওয়া যাইত। কিন্তু সেকালে খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ পরিচালিত বিদ্যালয়ে বালকগণকে প্রেরণ করা নিরাপদ ছিল না। পাছে বালকগণকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়, এ আশঙ্কা সর্বদাই হিন্দু অভিভাবক-

গণকে বিচলিত করিত। হরমোহনও এই আশঙ্কার বশবর্তী হইয়া অক্ষয়কুমারকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইলেন, এবং কিছুদিন স্বয়ং ও পরে সময়াভাববশত তাঁহার অধীনস্থ একজন কেরানি দ্বারা অক্ষয়কুমারকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহাতে অক্ষয়কুমারের জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না। অবশেষে তাঁহার আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য করিয়া হরমোহন ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে অক্ষয়কুমারের পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তখন ট্রামগাড়ির প্রচলন হয় নাই, শেয়ারের গাড়িও দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল, সুতরাং দর্জিপাড়ায় অক্ষয়কুমারের পিতৃস্বস্রেয় রামধন বসুর বাসায় থাকিয়া তিনি পড়াশুনা করিবেন, ইহা স্থির হইল। অবশ্য হরমোহন শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী তখন স্বনামধন্য গৌরমোহন আঢ্য দ্বারা পরিচালিত হইত এবং উহার ছাত্রগণ যাহাতে স্বদেশ ও স্বধর্মের অনুরাগী হয়, তদ্বিষয়ে আঢ্য মহাশয়ের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অথচ উক্ত বিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রতীচ্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদির যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়েও সেরূপ হইত কি না সন্দেহ। এই বিদ্যালয় হইতেই হাইকোর্টের সর্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজনীতি বিশারদ কৃষ্ণদাস পাল, রেইস এণ্ড রায়তের স্বনামধন্য সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাদের প্রতিভা শাণিত করিয়া লইয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার যখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে প্রবিষ্ট হন, তখন উহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি—হার্ম্যান জেফ্রয় ; ইনি ব্যারিস্টার ছিলেন। কিন্তু অপরিমিত পানদোষের জন্য ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করিতে না পারিয়া দুঃস্থ দশায় পতিত হন। গৌরমোহন ইহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে অল্পবেতনে স্বীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইনি য়ুরোপীয় বহু ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ইঁহার একজন ছাত্র তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে প্রমত্ত অবস্থাতেও বিদ্যালয়ে আসিয়া ইনি এরূপ অনর্গল ইংরাজী কাব্যাদি হইতে আবৃত্তি করিতেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া ছাত্ররা যথেষ্ট উপকৃত হইত। তিনি বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের একটি বিতর্ক সভারও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহাতে নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের আলোচনা হইত।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে প্রবেশকালে অক্ষয়কুমারের বয়ঃক্রম প্রায় ষোল বৎসর, কিন্তু তখনও তিনি ইংরাজী ব্যাকরণও রীতিমত পড়েন নাই, ইংরাজী বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতেও শিখেন নাই। সেইজন্য গৌরমোহন তাঁহাকে বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করিতে চাহেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের ক্লাসে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার

নির্বন্ধাতিশয্যে গৌরমোহন তাঁহাকে প্রার্থিত পঞ্চম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া লন। অক্ষয়কুমার কঠোর পরিশ্রম সহকারে পাঠ অভ্যাস করিয়া ছয় সাত মাস পরে বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। গৌরমোহন ইঁহার অধ্যবসায় ও পাঠানুরাগ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া দিলেন। অক্ষয়কুমার এই শ্রেণীতে পাঠ কালে পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত ইংরাজী সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থও হার্ম্যান জেফ্রয়ের সাহায্যে পাঠ করেন। এই সময়ে ইঁহার পিতা পীতাম্বর বিষয় কার্য ত্যাগ করিয়া ঁকাশী যাত্রা করেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের বেতন অনেকদিন বাকী পড়িয়াছিল, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রের প্রতি অবিচার করা হইবে ভাবিয়া অক্ষয়কুমার বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু গৌরমোহন চিরদিন প্রতিভাশালী বালকগণকে শিক্ষালাভে সাহায্য করিতেন, তিনি বিনা বেতনে তাঁহাকে পড়াইতে স্বীকৃত হন।

পিতৃবিয়োগ (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ)

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে অকস্মাৎ একদিন সংবাদ আসিল, পীতাম্বর ঁকাশী লাভ করিয়াছেন। হরমোহন অশ্রুপূর্ণলোচনে ভ্রাতাকে এই সংবাদ দিলে ঊনবিংশতি বর্ষ বয়স্ক অক্ষয়কুমার ধীরভাবে গীতার উপদেশ স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পিতা তাঁহার দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে দুঃখ কি?

বিদ্যালয় ত্যাগ ও স্বকীয় চেষ্টায় জ্ঞানার্জন (১৮৩৯)

পিতৃবিয়োগের পর অক্ষয়কুমার বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কারণ, জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রের গলগ্রহ হইয়া থাকা আর উচিত নহে, একথা তাঁহার বুদ্ধিমতী জননী তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ইতোমধ্যে অক্ষয়কুমারের পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে আগড়পাড়া নিবাসী রামমোহন ঘোষের কন্যা নিমাইমণির (শ্যামামণির) সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

অক্ষয়কুমার বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানার্জন স্পৃহা অধিকতর বলবতী হইল। তিনি আজীবন ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে "অক্ষয়কুমার নিজে নিজে যে লেখাপড়া শিখেন, সেই লেখাপড়া হইতে আমরা অন্তত লক্ষ লোক লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছি বা শিখিতেছি।"

দর্জিপাড়ায় অবস্থান কালে অক্ষয়কুমার কোনও এক শুভ মুহূর্তে "শব্দকল্পদ্রুম" রোপয়িতা রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা শ্রীনাথ ঘোষ, দৌহিত্র

আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং অমৃতলাল মিত্রের সহিত পরিচিত হন। ইঁহাদের সাহায্যে এবং রাজা রাধাকান্তের অপূর্ব গ্রন্থাগারে পাঠের সুযোগ লাভ করিয়া অক্ষয়কুমার উচ্চ গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যে অনন্যসাধারণ জ্ঞান লাভ করেন। এইরূপে বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কনিক্‌সেকশন্, ক্যালকুলাস, জ্যোতিষ, যন্ত্রবিজ্ঞান, বারি বিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, শারীরবিজ্ঞান, ফ্রেনলজি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যেও তিনি প্রগাঢ় জ্ঞান সঞ্চয় করেন। অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন,—"ইঁহারা আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, আপনাদের ভূরি ভূরি পুস্তক আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, ও আমার জন্য অকাতরে ও অক্লিষ্টচিত্তে কতই পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন!" সেকালে শিক্ষিত বাঙালিরা ইংরাজী প্রবন্ধাদি লিখিয়া ও ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ইংরাজী রচনা দ্বারা ইংরাজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা বাঙালির পক্ষে দুরাশা মাত্র, ইহা অক্ষয়কুমার বুঝিয়াছিলেন। বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা উচিত, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি অবসর কালে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের নিকট এবং চুপী নিবাসী গোপীনাথ ভট্টাচার্যের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। শিক্ষাকালে তিনি মধ্যে মধ্যে সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতেন। একটি শ্লোকে তাঁহার মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় :

"প্রত্যক্ষ দেবা মাতুশ্চরণং কমলায়তে। অঙ্গুল্যশ্চ দলায়ন্তে মনোমে ভ্রমরায়তে।।"

অর্থাৎ, "মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহার চরণ কমলে অঙ্গুলিরূপ পাপড়ি আছে। আমার মন এই পদ্মের ভ্রমর।"

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াই অক্ষয়কুমার চাকুরী পান নাই, ইহা তাঁহার সাংসারিক দুর্ভাগ্যের কারণ হইলেও সাহিত্যের সৌভাগ্য। কারণ এই বেকার অবস্থাতেই তিনি বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধন করিবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন।

প্রথম বাঙলা রচনা (১৮৩৪-৩৯)

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপনাদি লাভের জন্য 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মধ্যে মধ্যে অক্ষয়কুমারের জ্যেষ্ঠ-তাত-পুত্র হরমোহনের নিকট যাইতেন। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত অক্ষয়কুমার পরিচিত হন। তখন 'প্রভাকরে'র প্রভূত আদর। অক্ষয়কুমার কৈশোরে পদ্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে "অনঙ্গমোহন" নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। উহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আদর্শে রচিত, 'কামিনীকুমার' প্রভৃতি কাব্যের ন্যায় এবং তৎকালীন বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যের পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ। অবশ্য ইহা অক্ষয়কুমারের দোষ নহে,

কোন কিশোর-বয়স্ক কবিই কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। কিন্তু এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অক্ষয়কুমার অপরিণত বয়সেই মাতৃভাষার সেবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। দর্জিপাড়ায় অবস্থানকালে তাঁহার বাসার নিকটস্থ নরনারায়ণ দত্তের বাটীতে একটি "বাঙলা ভাষানুশীলনী" সভা হইত। এই সভাতে ঈশ্বর গুপ্ত ও অক্ষয়কুমার উভয়ের প্রায় উপস্থিত থাকিতেন এবং গুপ্ত কবির সাহচর্যে অক্ষয়কুমারের সাহিত্যানুরাগ বর্ধিত এবং সাহিত্যেসেবাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। কারণ, গুপ্ত কবি তরুণ লেখকগণকে সর্বদা উৎসাহিত করিতেন,-—বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, দ্বারকানাথ প্রভৃতি অনেক তরুণ লেখকই তাঁহাব নিকট উৎসাহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

একদিন অক্ষয়কুমার প্রভাকর কার্যালয়ে গুপ্ত কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেদিন ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয়ের সহকারী অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া গুপ্ত কবি অক্ষয়কুমারকে 'ইংলিশম্যান' পত্র হইতে একটি অংশ বাঙলায় অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আমি কখনও গদ্য লিখি নাই, আমি লিখিতে পারিব না।" প্রভাকর সম্পাদক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, তুমি পারিবে, নতুবা বলিতাম না।" অগত্যা অক্ষয়কুমার তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। গুপ্ত কবি তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া বলিলেন, উহা সুন্দর হইয়াছে। এরূপ সুন্দর গদ্য তাঁহার বহুদিনের অভিজ্ঞ সহকারীও লিখিতে পারেন না। বলা বাহুল্য, গুপ্ত কবির এই প্রশংসা বাক্যে অক্ষয়কুমার যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে গদ্য প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা

(১৮৪০) ভূগোল রচনা (১৮৪২)। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানোন্নতিসাধন, তথ্যানুসন্ধান, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে উহা ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হয়। ঈশ্বর গুপ্ত তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন। তিনিই অক্ষয়কুমারকে এই সভায় লইয়া গিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন এবং অক্ষয়কুমারকে উক্ত সভার সভ্য করিবার প্রস্তাব করেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই সভার উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অক্ষয়কুমার প্রথমে ৮ পরে ১০ এবং তৎপরে ১৪ বেতনে উহার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। অক্ষয়কুমার এই পাঠশালায় বর্ণমালা, ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যায় অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে ভূগোল সম্বন্ধীয় ভাল বাঙলা গ্রন্থ ছিল না। অক্ষয়কুমার ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই অভাব দূরীকরণের জন্য একখানি ভূগোল প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন।

যখন বাঙলা ভাষায় ভৌগোলিক পরিভাষা প্রস্তুত হয় নাই, তখন একক এই কার্য সুসম্পন্ন করা যে কতদূর কষ্টসাধ্য ছিল, তাহা এখন হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবেড়িয়ায় স্থানান্তরিত হয়। অক্ষয়কুমার এই সময়ে উক্ত পাঠশালায় ৩০. বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গেলে উৎকৃষ্ট পুস্তকাগারের অসম্ভাবজনিত জ্ঞানার্জনের অসুবিধা হইবে বলিয়া তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয় তৎপদে অভিষিক্ত হন।

নীতি তরঙ্গিণী সভা (১৮৪২)

এই সময়ে টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর বরাহনগরস্থ বাটীতে "নীতি তরঙ্গিণী" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উহার অন্যতম প্রধান সভ্য ছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমারকেও উক্ত সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া ছিলেন। এই সভায় অক্ষয়কুমার অনেকগুলি নীতিগর্ভ সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

"বিদ্যাদর্শন" (১৮৪২)

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার টাকী নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় "বিদ্যাদর্শন" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদিত ও প্রচারিত করেন। কিন্তু উহা ছয় মাসের অধিককাল জীবিত ছিল না।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩-৫৫)

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হয়। উহার সম্পাদক নির্বাচন ভার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর অর্পিত হয়। মহর্ষি উক্ত পদের প্রার্থিগণকে 'বেদান্ত ধর্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্মের ও সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ' এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া এক একটি সন্দর্ভ রচনা করিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিতে বলেন এবং অক্ষয়কুমারের সন্দর্ভটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তাঁহাকেই উক্ত পদে বরণ করেন। উক্ত পদের বেতন ৩০. ধার্য হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের স্বনামধন্য পুত্র রমাপ্রসাদ রায় প্রকাশ্যভাবে এই পত্রিকার জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করেন।

এসিয়াটিক সোসাইটির ন্যায় তত্ত্ববোধিনীর একটি Paper Committee বা প্রবন্ধ পরীক্ষা-সমিতি ছিল। এই সমিতি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় কোন্ কোন্ প্রবন্ধ প্রকাশিত

হইবে, তাহা বিচার করিতেন এবং প্রবন্ধাদির কিরূপ সংশোধন বা সংস্কার আবশ্যক, তাহা নির্দেশ করিয়া দিতেন। এই সমিতিতে পাঁচজন প্রবন্ধ পরীক্ষক থাকিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'সেকাল-আর এ-কাল'-এর রাজনারায়ণ বসু, রাজা স্যর রাধাকান্তের দৌহিত্র সদ্বিদ্বান আনন্দকৃষ্ণ বসু, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি সুধীগণ কোন না কোন সময়ে এই সমিতিতে ছিলেন। এই সকল সুবিজ্ঞ মহোদয়ের উপদেশ ও সংশোধনের ফলে অক্ষয়কুমারের রচনা অতি বিশুদ্ধ ও উপাদেয় হইয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,—ঈশ্বর জ্ঞান প্রচার করা। কিন্তু অক্ষয়কুমার উহাতে ধর্ম বিষয় ব্যতীত সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে সারগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যে এক যুগান্তর আনয়ন করিলেন। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্যে নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি দুই বৎসর নিয়মিতভাবে শিখিতে যাইতেন। তিনি স্বচেষ্টায় ফরাসী, জার্মান, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বাদশ-বর্ষকাল তিনি সুযোগ্যভাবে পত্রিকা সম্পাদন করিয়া বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার যথোচিত পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। তাঁহার গম্ভীর ও ওজস্বিনী ভাষা, পাঠকগণকে মুগ্ধ করিত। শিক্ষিত সমাজের নেতা, "এজুরাজ" রামগোপাল ঘোষ একবার তত্ত্ববোধিনীর এক সংখ্যা পাঠ করিয়া আনন্দোদ্বেলিত কণ্ঠে সতীর্থ রামতনু লাহিড়ীকে বলিয়াছিলেন— "রামতনু ! রামতনু ! বাঙলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখিয়াছ?—এই দেখ!" সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন, এই সময় অক্ষয়কুমার "অগাধ ও অকাতর পরিশ্রম করিয়া, ইউরোপের প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, ও ধর্মনীতি এবং ভারতের প্রত্নতত্ত্ব আলোড়িত করিয়া, সামান্য অসামান্য সকলরূপ রত্নোদ্ধার করত, তত্ত্ববোধিনীকে বিবিধ ভূষায় ভূষিত, এবং উজ্জ্বলীকৃত করিতে লাগিলেন।" পুনশ্চ,— "নব মুঞ্জরিতা ওজস্বিনী বঙ্গভাষা,—বিবিধ, তত্ত্বে সমৃদ্ধিশালিনী তত্ত্ববোধিনী এবং সাহিত্য পরিপালনে ব্রতী অক্ষয়কুমার দত্ত,—এই তিনটি প্রায় একই পদার্থ বলিলেই চলে। একের জীবনী জানিলেই সেই দশ বৎসর কালের তিনের জীবনী জানা হয়।" বঙ্গ সাহিত্যের ঐতিহাসিক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নও লিখিয়াছেন :—'অক্ষয়বাবু যে উৎকৃষ্ট বাঙলা গদ্য রচনার রীতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই তাহা সম্যক্ প্রকাশিত হয়। দেশের হিতকর, সমাজের সংশোধক, বস্তুতত্ত্বের নির্ণায়ক, কত কত জ্ঞানগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ যে তৎকালে ঐ পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। 'চারুপাঠ,' 'ধর্মনীতি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তক সকলের অধিকাংশই সর্বপ্রথমে ঐ পত্রেই প্রচারিত হয়। তাঁহার ঐ সকল রচনা পাঠ করিবার জন্য গ্রাহকেরা ব্যগ্রভাবে

পত্রিকা প্রকাশের দিনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং অনেকে তাঁহার উপদেশের অনুবর্তী হইয়া আপন আপন আচার ব্যবহারের সংশোধন করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন দ্বারা অক্ষয়বাবুর আয় কিছু অধিক হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্যান্তর পরিহারপূর্ব্বক নিয়তই উহার উন্নতি বর্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন।

সেকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভাষা বিশুদ্ধ বাঙলা গদ্যের আদর্শস্থানীয় ছিল। কলেজের ছাত্রগণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে ভাষা শিক্ষা করিতেন। উহা পাঠ করিতে তাঁহারা উপদিষ্ট হইতেন।

চিন্তাশীল লেখক রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে অক্ষয়কুমার যে সকল প্রস্তাব লিখেন, "তাহা বঙ্গভাষাকে অতি সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছে। অক্ষয়কুমার প্রণীত বাহ্যবস্তু ও ধর্মনীতি তাঁহার সর্বোত্তম গ্রন্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রাচীন হিন্দুদিগের বাণিজ্য, পাণ্ডবদিগের অস্ত্র শিক্ষা, কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা প্রভৃতি তাঁহার স্বকপোল রচিত প্রস্তাবই তাঁহার সর্বোত্তম রচনা। দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা এখনো স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। অক্ষয়বাবু বর্তমান বঙ্গভাষার একজন প্রধান নির্মাতা।"

বাস্তবিক অক্ষয়কুমারের উপরে লিখিত মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ 'থিসিস'-এর অনেক উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষার এই প্রধান নির্মাতার এই মৌলিক প্রবন্ধগুলির দুই একটি কি তাঁহাদের অমূল্য ও দুর্মূল্য পাঠ্য পুস্তকগুলিতে সন্নিবিষ্ট করিতে পারেন না?

অক্ষয়কুমার যে দ্বাদশবর্ষকাল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, সেই সময় পত্রিকার সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল গিয়াছে। অক্ষয়কুমার কিন্তু এই পত্রিকা সম্পাদন দ্বারা ৩০্ হইতে ৪৫্ এবং পরে ৪৫্ হইতে ৬০্ টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইয়াছিলেন। ইহা অতিরিক্ত পাইয়াছিলেন কেবল কঠোর্ মানসিক পরিশ্রমজনিত জীবন-সহচর ভয়ঙ্কর শিরোরোগ।

হিন্দুবিশ্বপ্রেমোদ্দীপনা সভা (১৮৪৩)

প্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক, বক্তা ও দেশনায়ক কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আলয়ে Hindu Theophielanthropic Society বা হিন্দু বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভা নামে এক সভা স্থাপন করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার ন্যায় ইহারও উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বর, পরলোক, সত্য ও সুখ সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত ও উন্নত অভিমত প্রচার করা। হিন্দুগণকে পরমাত্মা এবং সত্যরূপে ঈশ্বরকে পূজা করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং সৃষ্টিকর্তা, স্বজাতীয়গণ এবং

আপনাদিগের প্রতি যে সকল নৈতিক ও পবিত্র কর্তব্য আছে, তাহা পালন করান ইহার অভিপ্রেত ছিল। কলিকাতা রিভিউ নামক সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈমাসিকের তৃতীয় ভাগের ৫ম সংখ্যায় আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Transition states of the Hindu Mind নামক প্রবন্ধে তত্ত্ববোধিনী সভা ও এই বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভার কার্যবিবরণীর তুলনায় সমালোচনা করিয়া শেষোক্ত সভার উদারতার ও উচ্চতর আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ রাজকার্যানুরোধে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে এই সভা বিলুপ্ত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বর গুপ্ত এবং অক্ষয়কুমার এই সভায় বাঙলা প্রবন্ধাদি এবং ডাক্তার ডফ্, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ইংরাজী প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই সভার কার্য বিবরণীতে কতকগুলি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল।

সে ধীরে ধীরে মুক্ত জানালার দিকে অগ্রসর হইয়া দুই হাতে গরাদে ধরিয়া বাহিরের ঘন অন্ধকারে বহুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। দুর্যোগ ক্রমশই বাড়িতেছিল। বৃষ্টির ঝাঁট বায়ুপ্রবাহে সবেগে গবাক্ষপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। মুখে চোখে সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ শীকর-সংঘাতে চমকিত হইয়া আনন্দ চাহিয়া দেখিল, বিছানাটি সিক্ত হইয়া গিয়াছে এবং খোলা গীতাখানির অবস্থাও তদ্রূপ। তাড়াতাড়ি গবাক্ষগুলি বন্ধ করিয়া যে যেমন গীতাখানি তুলিতে যাইবে, তখনই তাহার দৃষ্টি পড়িল গীতার পৃষ্ঠায়—

"সর্বধর্মন্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

মনের চিন্তা, কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্বন্ধে সমস্যা—সেই মুহূর্তে কে যেন সমাধান করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ অদূরবর্তী 'ডেস্কের' পার্শ্বে বসিয়া সে একখানা পত্র লিখিতে বসিল। কম্পিত হস্তে লিখিয়া ফেলিল—

"প্রভা, চলিলাম। কর্তব্যের আকর্ষণ অবহেলা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আশীর্বাদ করি, সুখী হও! যে উদ্দেশ্য তোমার অন্তরে উন্মেষিত, তাহাই তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ, শান্তি ও সহায়।

সন্ন্যাসী—আনন্দ।"

লেখা শেষ হইলে সেখানি খামে আঁটিয়া তাহার উপরে প্রভার নাম লিখিয়া 'ডেস্কের' উপর রাখিয়া দিল। অতঃপর মুখ তুলিয়া চাহিতেই চোখে পড়িল—ঘরের কোণে আল্‌নায় তাহার আলখাল্লাটি ঝুলিতেছে। কম্পিতপদে উঠিয়া সেটা গায়ে চাপাইল, কম্বলটা কাঁধে ফেলিল, কমণ্ডলুটাও খুঁজিয়া হাতে লইল ; তারপর ত্রস্তভাবে ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, বারান্দায় কেহ নাই, প্রভার ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে সেই আলোকিত ঘরটির দিকে চাহিয়া রহিল, দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর কোণে অশ্রু সঞ্চিত হইল, কয়েক ফোঁটা গণ্ডবাহিয়া গড়াইয়াও পড়িল, তাহা মুছিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া—এই অদ্ভুত সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া—

সেই গভীর রাত্রির ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া—সেই গভীর রাত্রির নিবিড় দুর্যোগের মধ্যেই রাস্তায় নামিয়া পড়িল—কর্তব্যের প্রেরণায়—তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১ জুন এতদ্দেশবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু "ইংরাজী শিক্ষার পিতা" প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার পরলোক গমন করেন। তাঁহার অসংখ্য ছাত্র ও গুণমুগ্ধ ভক্ত তাঁহার সমাধিতে স্মৃতিশিলা এবং তাঁহার মর্মরময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যাহাতে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন কৃতজ্ঞ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে সমুজ্জ্বল থাকে, তজ্জন্য কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রতি বৎসব সেই স্মরণীয় দিবসে একটি স্মৃতিসভা আহূত করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং তাঁহার উদ্যোগে "হেয়ার বার্ষিক উৎসব সমিতি" গঠিত হইল। এই সমিতির উদ্যোগে প্রতিবৎসর ১ জুন একটি স্মৃতি সভা আহূত হইত এবং উহাতে হেয়ারের গুণকীর্তন ও ভারতবাসীগণের মানসিক বা নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত বা প্রবন্ধ পঠিত হইত। প্রথম দুই-তিন বৎসর ইংরাজীতেই বক্তৃতা হইত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার বাঙলা ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়া এই নিয়ম ভঙ্গ করেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল,—"শিক্ষা দ্বারা হিন্দুদিগের মনের কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।" উহাতে ডেভিড হেয়ারের নিকট আমরা কতদূর ঋণী তাহা তিনি বিশদভাবে বর্ণিত করেন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী হয়িয়াছিল। বিখ্যাত যশস্বী রামগোপাল ঘোষ এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের বক্তৃতার পর কিশোরীচাঁদ মিত্র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উহার প্রশংসা করেন। তিনি যাহা বলেন তাহার মর্ম এই, "সভাপতি মহাশয়, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আমার বন্ধুবর যে প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন, তাহা যে তাঁহার হৃদয় ও মনের সদ্‌গুণরাশির উপযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আপনারা আমার সহিত একমত হইবেন। যে বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অতি প্রয়োজনীয় এবং অতি নিপুণতা, ওজস্বিতা এবং সহানুভূতির সহিত রচিত হইয়াছে। উহাতে রচনার বিশুদ্ধতা, লালিত্য ও ভাবৈশ্বর্যের যে বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বাঙলা লেখকগণের রচনার মধ্যে সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। সচরাচর বাঙলা রচনায় যে অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার ভারাক্রান্ত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় উহা তাহা হইতে বিমুক্ত। যাঁহার নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা কীর্তন করিবার জন্য আমরা অদ্য প্রদোষে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি এই ওজস্বিনী বক্তৃতায় প্রদত্ত হইয়াছে।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু এইমাত্র বলিয়াছেন যে হেয়ার সাহেব তাঁহাদেরই অন্যতম, যাঁহারা সমগ্র জগৎকে তাঁহাদের স্বদেশ এবং সমগ্র মানবজাতিকে তাঁহাদের স্বদেশবাসী বলিয়া মনে করেন। আমাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহার সমুচিত প্রশংসা করিতে পারা যায় না। আমাদিগকে নবজীবনে উদ্বোধিত করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল এবং উদ্দেশ্য সাধানার্থ তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্প সিদ্ধিই তাঁহার সকল আশা ও

আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র ছিল। যদি আমি বলি, ইংলণ্ড, ইউরোপ, এমন কি পৃথিবী যে সকল বিশ্বপ্রেমিকের জন্মদান করিয়াছে, তন্মধ্যে ডেভিড হেয়ার অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন—তাহা হইলে আমার বোধ হয় আমি অতিশয়োক্তি দোষে দোষী হইব না। তাঁহার অদম্য কর্মশক্তি দেশের মানসিক উন্নতির সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া বিজয়মণ্ডিত হইয়াছিল, তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অসাম্প্রদায়িক উদার পরহিতৈষণা বিদেশীয় জাতির উন্নতিকল্পে উৎসর্গিত হইয়াছিল, সে সৎকার্য কাহাকেও যশের অধিকারী করে না কিন্তু এরূপে গৌরবে মণ্ডিত করে যে তাহার উজ্জ্বল প্রভার নিকটে রাজ-মহিমা ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়, এরূপ আন্তরিক সুখ প্রদান করে যে তাহার তুলনায় ইন্দ্রিয় সুখ তুচ্ছ মনে হয়। কিন্তু এস্থলে—হেয়ার সাহেবের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্তগণের এই সভায় তাঁহার উদার বিশ্বপ্রেমের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

যে বক্তৃতাটি আমরা এই মাত্র শ্রবণ করিলাম তাহা অত্যন্ত উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। বাঙলা ভাষায় লিখিত বলিয়া উহা কম মর্মস্পর্শিনী হয় নাই। সভাপতি মহাশয়, আমি জানি যে আমাদের শিক্ষিত বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকের নিকট বাঙলা সাহিত্য নিতান্ত অনাদৃত ; যাহা কিছু মাতৃভাষায় লিখিত হয় তাহা যেন তাঁহাদিগের রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চতম কল্পনা, গভীরতম ভাবসমূহ বাঙলা ভাষায় সজ্জিত হইলেই যেন প্রাণহীন, ভাবহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই কুসংস্কার দ্রুতভাবে বিনষ্ট হইতেছে এবং আমাদের দেশের ভাষা, আমাদের শৈশবের ভাষা, যে ভাষার সহিত আমাদের সর্ব্বপ্রথম চিন্তা ও ভাবসমূহ বিজড়িত—সেই বাঙলা ভাষা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অনতিবিলম্বে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবেন।"

অক্ষয়কুমার দত্তের এই বক্তৃতাটির বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, খ্যাতনামা ইংরাজী-নবীসগণও তাঁহার বক্তৃতার পর মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ডেভিড হেয়ারের বার্ষিক স্মৃতি সভায় অক্ষয়কুমারের পর মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজনারায়ণ বসু, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই ইংরাজনবীস নব্য বাঙ্গালীদের সমক্ষে বঙ্গভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সর্বপ্রধান নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর দুইজনের প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। একজন ভক্তিমার্গাবলম্বী রাজনারায়ণ বসু, অপর জন জ্ঞানমার্গাবলম্বী অক্ষয়কুমার দত্ত। পূর্বে বেদান্তদর্শনের মতই ব্রাহ্মসমাজের মত ছিল। অক্ষয়কুমার বহু বৎসর তর্ক-বিতর্ক দ্বারা দেবেন্দ্রনাথকে বুঝাইয়া দেন যে বেদ ঈশ্বর প্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র হইতে পারে না এবং দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বেদের

আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে স্বভাবকে ধর্ম পুস্তক রূপে প্রতিপন্ন করত ব্রাহ্মধর্মকে স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন। অক্ষয়কুমার এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাও অনাবশ্যক এইরূপ মত প্রচার করিতেন। তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালীতে অনাবশ্যক এইরূপে তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করেন,—

কৃষকের পরিশ্রমের ফল শস্য অর্থাৎ পরিশ্রম = শস্য কৃষকের পরিশ্রম ও প্রার্থনার ফল ও শস্য অর্থাৎ

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য

অতএব প্রার্থনার ফল—শূন্য।

অক্ষয়কুমার বলিতেন, বিজ্ঞানই প্রকৃত নিশ্চিত জ্ঞানের আকর, সুতরাং বিজ্ঞান-লব্ধ প্রাকৃতিক নিয়মই মানবের কার্যের নিয়ামক হওয়া উচিত।

অক্ষয়কুমারের সকল মত ভক্তিমার্গাবলম্বী ব্রাহ্মগণ গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাঁহার উদার ও সুচিন্তিত অভিমতসমূহ তাঁহাদের সশ্রদ্ধ আলোচনার বিষয় হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে আত্মপরীক্ষায় প্রণোদিত করিয়াছিল।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ও তৎপর বৎসর জর্জ কুম্ব্ বিরচিত 'কন্‌স্টিটিউশন অব ম্যান্' নামক ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বনে অক্ষয়কুমার "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। জগদীশ্বরের বিশ্বরাজ্য পালন সংক্রান্ত নিয়ম, কোন নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার ও কোন নিয়ম লঙঘন করিলে কিরূপ অপকার—ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের বিচার ও মীমাংসা সকল ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি মূলের অবিকল অনুবাদ নহে। এতদ্দেশীয় আচার ব্যবহার প্রভৃতির সংস্কার সাধনোদ্দেশে অনেক প্রয়োজনয় বিষয়ের আলোচনা উহাতে করা হইয়াছে। অল্পবয়স্ক, বৃদ্ধ, উৎকট রোগগ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের বিবাহে অকর্তব্যতা, আমিষভক্ষণ ও সুরাপানের অবৈধতা প্রভৃতি উহাতে সুন্দর যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্ তাঁহার একখানি গ্রন্থে অক্ষয়কুমার দত্তের পাণ্ডিত্য ও লিপিকুশলতার উচ্চ সুখ্যাতি করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সেকালে বিদ্যালয়সমূহে ও বিদ্যালয়ের বাহিরে সযত্নে পঠিত হইত এবং অসাধারণ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন "বাহ্যবস্তুর প্রচার যুবকদলের মধ্যে এক নবভাবকে উদ্দীপ্ত করা। ইঁহার প্ররোচনাতে অনেকে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করেন, এবং সামাজিক নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে এক অভূত পরিবর্তন উপস্থিত হয়। বাস্তবিক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই সময়ে বঙ্গসমাজের নেতৃগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন।"

অক্ষয়কুমার স্বয়ং এই সময়ে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করেন। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্রের অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"দুই-তিন মাস হইল আমি মৎস্য মাংস গ্রহণ করি নাই, কিন্তু অদ্যাপি পরীক্ষার অবস্থা যাইতেছে। সুরাপান করা ত অভ্যাস নাই, কিন্তু কোনও বিষয়ে কৃতপ্রতিজ্ঞ হই নাই। আর শুনিয়াছেন, এ তরঙ্গ অনেকদূর পর্যন্ত গিয়াছে। বর্ধমানের রাজা প্রায় তিন দিন পর্যন্ত মৎস্য মাংস ভক্ষণ করেন নাই লিখিয়াছেন। এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, যদি তাহা আহার না করিলে কোন বিঘ্ন ঘটনা না হয়, তবে একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন। বিধবাদিগেবই জয়, কেবল আতপ তণ্ডুল অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু আমাদের বড় বাবু[১] সে ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। ফলত মৎস্য মাংস বর্জ্জিত না হইলে উপচিকীর্ষা বৃত্তিকে সর্বতোভাবে চরিতার্থ করা হয় না।"

প্রায় এই সময়েই অক্ষয়কুমার চারুপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে। এই দুইখানি পুস্তকের পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন নাই। কারণ, অনেকেই বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থদ্বয় হইতে বিশুদ্ধ বাঙলা রচনা পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছেন, এবং নানা বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এই গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ চারু পাঠে প্রকাশিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে কয়েকটি পূর্বে সংবাদ প্রভাকরে ও কতকগুলি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল, অবশিষ্টগুলি গ্রন্থকার এই পুস্তকের জন্যই নূতন রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থ সংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙলা পাঠ্য পুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি ঐ বিষয়ে যেমন সর্বপ্রথম, তেমনই সর্বোৎকৃষ্ট। এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে, যে কত নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গ্রন্থকার ইংরাজী গ্রন্থ হইতেই ঐ সকল বিষয় সঙ্কলন করিয়াছেন সত্যকথা, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, উহা ইংরেজির অনুবাদ। বিজ্ঞাপনে স্বীকার না থাকিলে কিয়ৎকাল পরে উহা মূল রচনাই হইয়া যাইত। অক্ষয়বাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষরূপ অধিকার ছিল না, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে এ সকল রচনা প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞের লেখনী হইতে নির্গত হয় নাই, তাঁহার রচনা যেমন সরল, তেমনই মধুর, তেমনই বিশুদ্ধ তেমনই জ্ঞানপ্রদ। তিনি অতি দুরূহ বিষয় সকলও চিত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক এমন সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন যে, পাঠ মাত্র সে সকল পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়। অধিক আর কি বলিব, তাঁহার দুই ভাগে চারুপাঠ বাঙলা শিক্ষার্থী বালকদিগের জ্ঞানরত্নের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ।

১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একটি আত্মীয় সভা স্থাপিত করেন। তিনি উহার সভাপতি এবং অক্ষয়কুমার উহার সম্পাদক হন। অক্ষয়কুমার এই সভায় বাঙলায় উপাসনা কার্য প্রবর্তিত করিতে চাহেন। এ বিষয়ে মহর্ষির সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হয়। তিনি তখন রাখালদাস হালদার মহাশয় কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত খিদিরপুর ব্রাহ্মসমাজে বাঙলায় উপাসনা প্রণালী প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা পান। এই সময়ে 'ধর্মোন্নতি সংসাধন

বিষয়ক প্রস্তাব' নামে তিনি একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। একবার এই সভায় মহর্ষি "ঈশ্বর সর্বশক্তিমান" বলিলে অক্ষয়কুমার প্রতিবাদ করিয়া বলেন "সর্বশক্তিমান নন, বিচিত্র শক্তিমান।" এইরূপ মত বিরোধের জন্যই সভা উঠিয়া যায়।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ (বোধ হয় নবপ্রতিষ্ঠিত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণের অনুরোধে) "বাষ্পরথারোহীদের প্রতি উপদেশ" নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উহাতে অক্ষয়কুমারের নাম সংযোগ দেখা যায়।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একদিন ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাস্থলে অক্ষয়কুমার হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। নানারূপ শুশ্রূষায় তিনি সুস্থ হন। দুই দিন পরে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে বসিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিবার সময় তিনি মস্তকে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করিলেন এবং লেখনী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৮৫)

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৬ জুলাই কলিকাতা নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন ৩০০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এবং অতিরিক্ত দুইশত টাকা বৃত্তি লইয়া এই বিদ্যালয়ের তত্ত্ববধায়ক হইলেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে অক্ষয়কুমারকে নিযুক্ত করিতে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণকে পরামর্শ দিলেন এবং তদনুসারে অক্ষয়কুমার ১৫০্ বেতনে নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ইতপূর্বে পত্রিকা দ্বারা মাতৃভাষার উন্নতি সাধন জন্য তিনি কোনও উচ্চপদ গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে নানা কারণে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণেচ্ছুক হইলেন। কিন্তু পত্রিকার সঙ্গে একবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন না, উহা তাঁহার প্রাণের জিনিস। মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয় নর্ম্যাল স্কুলে তাঁহার সহকারী হন। অক্ষয়কুমার ভূগোল-ইতিহাস প্রভৃতির অধ্যাপনা করিতেন। তৎকালে বিজ্ঞানবিষয়ক ভাল গ্রন্থ না থাকায় তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'পদার্থবিদ্যা : জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ হইয়াছিল এবং বহু বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম্-এ উপাধিকারী লেখকের পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকের সমালোচনাকালে 'বঙ্গদর্শন' অক্ষয়কুমারের গ্রন্থখানি যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর তাহা অকুণ্ঠিতভাবে বলিয়াছিলেন।

সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী সভা

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে শেষভাগে কলিকাতার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রসিদ্ধ লেখক, বাগ্মী ও দেশনায়ক কিশোরীচাঁদ মিত্র তদীয় ভবনে বাঙলার সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী সভা নামক এক সভা স্থাপিত করেন। ঐ সভা তিন চারি বৎসর কাল জীবিত ছিল এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহু বিবাহ নিবারণ, চড়কপূজায় বাণফোঁড়া ও গঙ্গাযাত্রা প্রথা রহিতকরণ ; স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, কৃষিবিষয়ক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় বহুবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, কিশোরীচাঁদ মিত্রই সর্বপ্রথম বহু বিবাহ প্রথা নিবারণের জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সভার সভাপতি, কিশোরীচাঁদ ও অক্ষয়কুমার উহার সম্পাদক, এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজা দিগম্বর মিত্র, গৌরদাস বসাক, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উহার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। সভার কার্যবিবরণীপাঠে প্রতীত হয় যে, অক্ষয়কুমার এই সভায় খুব উৎসাহ সহকারে কার্য করিয়াছিলেন।

স্বাস্থ্যভঙ্গ ও তাহার কারণ

দুঃখের বিষয় অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অক্ষয়কুমারের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়াছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আগস্ট মাসে তিনি অর্শ ও অজীর্ণ রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, শিরোরোগও বৃদ্ধি পাইল। তিনি প্রথমে এক বৎসরের জন্য এবং পরে আরও ছয়মাস করিয়া দুইবাব অবকাশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অগ্রজ সুপণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে অক্ষয়কুমার অধ্যাপকের পদ একেবারে পরিত্যাগ করেন ; 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ তিরোহিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় তত্তবোধিনী সভার সভ্যগণ তত্ত্ববোধিনী ও বঙ্গ সাহিত্যের জন্য তাঁহার প্রশংসনীয় কার্য স্মরণ করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে যতদিন অক্ষয়কুমার সুস্থ ও সচ্ছন্দশরীর হইয়া পুনরায় পরিশ্রমক্ষম না হন ততদিন সভা হইতে তিনি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাসিক পাইবেন।

কিন্তু অক্ষয়কুমারের গ্রন্থাদির আয় যখন তাঁহার জীবিকা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট বোধ হইল, তখন তিনি স্বেচ্ছায় এই বৃত্তিগ্রহণে বিরত হন।

অক্ষয়কুমারের পীড়ার পর তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্বক নানা স্থানে বায়ুপরিবর্তন করিতে যাইতেন। বঙ্গের নানা পল্লীতে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও কিছুদিন করিয়া অবস্থান করিতেন। তিনি 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'

রচনাকালে মৎস্য মাংস আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু রোগাক্রান্ত হইবার পর চিকিৎসকগণের উপদেশে পুনরায় মৎস্য মাংস আহার করিতে আরম্ভ করেন। এতদুপলক্ষে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,—

আমিষ অবিধি বোলে, যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল।।
নোদে শান্তিপুর ফিরে ফিরিয়া হুগলি।
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলি।।
নিরামিষ আহারেতে, ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড, মাথামুণ্ড লিখে।।
কোথা তার "বাহ্যবস্তু" মানব প্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তার, বিষম বিকৃতি।।
উদরের রোগে আর, অর্শে পায় দুঃখ।
দিবানিশি মাথা ঘোরে, সদাই অসুখ।।
মত চালাবার তরে লিখিলেন বই।
এখন সে লিখিবার শক্তি তাঁর কই?
কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় ঘুরে।
রচনার কালে আর, কথা নাহি স্ফুরে।।
মাংস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার।
কিছুদিন করিলেন বিপরীত তার।।
শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল।
ভাসালেন বলবুদ্ধি, হাসালেন দল।।
সমাজ হাসিছে তাঁর ভাব এঁচে এঁচে।
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি, বঁসিলেন কেঁচে।।
দায়ে পোড়ে পূর্বভাব ধরিলেন পিছু।
শুধু মাছ মাস নয়, আরো আছে কিছু।।
সমুদয় ফুটে লেখা না হয় বিহিত।
মসলা চলেছে কত পাণের সহিত।।
ছেড়ে দেও ছেলে খেলা, ফেলে দেও "কুম"।
মাস মাছ ভাত খেয়ে সুখে দেও ঘুম।।
করোনাকো ধুমধাম টুমটাম আর।
ছিঁড়ে ফেল "বাহ্যবস্তু" সে মত অসার।।
মাখিতেছ "বিষ্ণুতেল" তাই মাখ গায়।
আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে দায়।।

পাকতেল মাখ আর নিত্য কর স্নান।
সেরূপ আহার কর যা হয় বিধান।।
কোটি কোটি গ্রন্থকার লিখেছেন যাহা।
"কুম" ধোরে একা কেন কাটো তুমি তাহা?
মনে কর যতদিন সৃষ্টির বয়েস।
ততদিন আছে এই মতের আদেশ।।
দ্রব্যের যে গুণ হয় সব যায় জানা।
যাহে যার রুচি কেন তুমি কর মানা?
দেশ, দেহ, রোগ ভেদে, খাদ্যের বিধান।
কেমনে করিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ?
গুরু হোয়ে উপদেশে করিয়াছ গোঁড়া।
মিছে মতে আনিয়াছ গোটা কত ছোঁড়া।।
তোমার হইয়া চেলা, গুরু যারা বলে।
তারা যেন এই মতে আর নাহি চলে।।
ওহে ভাই যদি চাও নিজ উপকার।
অক্ষয়ের মতে তবে চ'লো নাকো আর।।
শেষে তুমি চেলা হও, মন করি কষা।
আগে গিয়ে দেখে এসো গুরুজির দশা।।
সেই গুরু গুরু হয়, গুরু বোধ যার।
গুরু নিজে লঘু হোলে কিসে হবে পার?

গুপ্ত কবি রহস্য করিয়া উপরিধৃত কবিতায় "ঘুরতেছে মাথামুণ্ড মাথামুণ্ড লিখে" প্রভৃতি যে সকল পংক্তি লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া কোন কোন পাঠক হয়ত মনে করিতে পারেন যে অক্ষয়কুমারের রচনার প্রতি বুঝি গুপ্তকবির শ্রদ্ধা ছিল না। এরূপ ধারণা' নিতান্ত ভ্রান্ত। অক্ষয়কুমার যখন রোগাক্রান্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন, তখন গুপ্তকবি "সংবাদ প্রভাকর"-এ লিখিয়ছিলেন :

হে পাঠকপুঞ্জ! এই সময়ে এই স্থলে মৃতবৎ হইয়া লিখিতেছি যে, আমার অতি স্নেহান্বিত প্রাণাধিক বন্ধু 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদক ও কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, যাঁহাকে অদ্বিতীয় লেখক বলিলে বলা যায়, যিনি অপার রচনামৃত বৃষ্টি করিয়া বহু ব্যক্তির মানস-ক্ষেত্র আর্দ্র করিয়াছেন, আমি যাঁহাকে অগ্রে শিষ্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া এইক্ষণে গুরু বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা করি, এই মানসিক শ্রমের অধীন হইয়া সেই অক্ষয়ের দৈনিক বল অক্ষয় করিতে পারিল না। এইক্ষণে প্রাণাধিক এমত দুর্বল ও এমন অশক্ত যে প্রায় আপনাতেই আপনি নাই। পূর্বে যিনি লেখনী ধারণ করিয়া অতি সহজে অনায়াসেই অনবরত সর্ব-শিব-কর বিষয় সকল অভ্রান্ত রচনা

করিতেন ; এইক্ষণে তিনি এমত অশক্ত যে, দুইটি কথা একত্র করিয়া লিখিতে হইলে, অতিশয় প্রমাদ ঘটিয়া উঠে। পূর্বে যিদি ক্ষণমাত্র নয়ন মুদ্রিত করিয়া, অতি অভাবনীয় ভাব সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক পুলকে পরিপূরিত হইতেন, অধুনা সেই ভাবের নিমিত্ত সেই ভাবে একবার নয়ন মুদ্রিত করিতে হইলে, একেবারেই নয়ন মুদ্রিত করিতে হয়। পূর্বে যিনি বহুজন-বেষ্টিত পণ্ডিত-মণ্ডিত প্রকাশ্য সভায় দণ্ডায়মান হইয়া, নির্ভয়ে মুক্ত-কণ্ঠে প্রকট বদনে দোষ-হীন সুধাময় সুললিত সাধু শব্দে সৎবক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃ সকলের শ্রুতি-বদনে পীযূষ বর্ষণ করিয়াছেন, মানস হরিয়াছেন, সংপ্রতি সাধারণ শব্দ সংযোগ করিয়া, সামান্য রূপে কথা কহিতেও তাঁহার কষ্ট বোধ হয়। আহা কি বিলাপের ব্যাপার!*** একান্ত চিত্তে এই প্রার্থনা করি, অক্ষয়ের দেহ অক্ষয় হউক, অক্ষয় হউক,—হে জগদীশ্বর ! তুমি শীঘ্রই তাঁহার মঙ্গল কর। তিনি শীঘ্রই অরোগী হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপনার আসনে আরূঢ় হইয়া মনের সুখে পূর্ববৎ কার্য নির্বাহ করত আমাদিগের আনন্দকর হউন। অক্ষয় যে কি গুণের মানুষ, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিয়া কি জানাইব? তাঁহার ন্যায় গুণান্বিত দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রায় বিদ্যমানাভাব।

নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াও অক্ষয়কুমার পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। পারিবারিক অশান্তির জন্য তাঁহার মনও সুস্থ ছিল না। সেইজন্য তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে গঙ্গাতীরে একবিঘা ভূমি ক্রয় করিয়া সেইস্থানে নিজ রুচি অনুযায়ী একখানি গৃহ নির্মাণ ও উদ্যান রচনা করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করিলেন। এই নির্জন "শোভনোদ্যানে" অক্ষয়কুমার একাকী তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী[২] "শোভনোদ্যানে"র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

"ক্ষুদ্র একটি উদ্যান-মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দ্বিতল ভবন ; কিন্তু সেও এক অদ্ভুত কাণ্ড ; কোন সহৃদয় ব্যক্তি সেই উদ্যানটি দেখিয়া বলেন, এইখানি চতুর্থ ভাগ চারুপাঠ ; বাস্তবিক চারুপাঠই বটে। নানাবিধ দেশী-বিদেশী, পার্বতীয় সাগর-তটস্থ তরুলতা, গুল্ম, বল্লরী সেখানে বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে পাশাপাশি কাছাকাছি রোপিত, অথচ কেমন এক অপূর্ব কবিত্বে শ্যামল সৌন্দর্যে সরল মাধুর্যে—সমস্তই মণ্ডিত। এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনী, মরিচ, কর্পূর, হিঙ্গু, সাগু, ভূর্জপত্র—কত গাছই সেখানে আছে ; আবার কোথাও একটি লতা-বিতান, কোথাও একটি তরু কুঞ্জ, কোথাও পুষ্প-শয্যা, কোথাও পুষ্প-বাটিকা। যেন এগজিবিশনের জন্য জীবন্ত তরুলতার সংগ্রহ হইয়াছে ; সে উদ্ভিদের অক্ষর যোজনা করিয়া স্বভাবের একখানি মহাকাব্য রচিয়াছে ; যেন কোন মহাঘটক বিজ্ঞানে কবিতায় বিবাহ দিয়া স্বভাবের একটি নিভৃত বাসর ঘরে নবদম্পতীকে বসাইয়া দিয়াছে।

এই উদ্যানমধ্যস্থ দ্বিতল ভবনে অক্ষয়কুমারের বসিবার ঘরটি—কি বলিব ? বলি—পঞ্চম ভাগ চারুপাঠ। উদ্যানে উদ্ভিদবিদ্যা মূর্তিমতী, গৃহে সাঙ্গোপাঙ্গ ভূতত্ত্বজ্ঞান জাজ্বল্যমান। নানাবিধ শঙ্খ শম্বুক, প্রবাল পঞ্জর, প্রস্তর পুঞ্জ, জীব-কঙ্কাল, ধাতু-নিঃস্রব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থামত চারিদিকে সসজ্জিত রহিয়াছে ; আর উপর নিউটন, হক্সলী,

ডারউইন, মিল, মহাত্মা রামমোহন রায়কে মধ্যবর্তী করিয়া এই সকল অদ্ভুত সজ্জা এক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। চারিদিকে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক মানচিত্র। একখানি চিত্রপটে চিত্রিত আছে,—

"অফসোসকে দিলকো কবল খিলনে ন পায়া।
কোয়ি দিনকে চলে যাতেহেঁ মাটীকে তলে হম।।

আমার এই হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইতে পাইল না, এইটি মনস্তাপের বিষয়। কিছুদিনের মধ্যেই আমি ধূলিসাৎ হইতে চলিলাম।"

অন্য কেহ হইলে এইরূপ দুরারোগ্য শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া পুনরায় মস্তিষ্ক চালনা করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক অক্ষয়কুমার মৃত্যুকালাবধি যথাসাধ্য বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া মাতৃভাষাকে অনুপম রত্নালঙ্কারে ভূষিতা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। 'সুধীরঞ্জন'-এর দ্বারকানাথ রায় বঙ্গভাষার মুখে বলাইয়াছিলেন—

"কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয়কুমার।।
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়।।"

সত্য সত্যই তাহাই। রুগ্ন শরীরেও তিনি 'চারুপাঠ ৩য় ভাগ" নামে আর একখানি সন্দর্ভ পুস্তক ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। রামগতি ন্যায়রত্ন এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

> ৩য় ভাগ চারুপাঠও ১ম ও ২য় ভাগের সমানই কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে ; জনসমাজে ইহারও আদরের সীমা নাই। তবে এখানি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত 'স্বপ্নদর্শন' নামক প্রস্তাবগুলিতে কয়েকটি প্রগাঢ় বিষয়ের ব্যাপক বর্ণনা আছে এবং গুরুতর প্রাকৃতিক ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল স্থলেও অক্ষয়বাবুর লেখনী যেরূপ সরলতা সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা করিতে ত্রুটি করে নাই। এই পুস্তকের রচনা ও ভাব-গাম্ভীর্য কিরূপ উপাদেয় হইয়াছে তাহা সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা উহার অন্তর্গত 'মিত্রতা', 'জীববিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা' এবং 'সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য' নামক প্রস্তাব তিনটি অন্তত একবারও পাঠ করেন।

বলা বাহুল্য অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ তিন খণ্ডেরই অনেকগুলি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল এবং উহা সে কালের বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তকাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান

অধিকৃত করিয়াছিল। কিন্তু উহা কেবল উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক বলিয়া সাদরণীয় নহে, উহার ন্যায় জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যগ্রন্থও অতি বিরল।

অক্ষয়কুমারের শরীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-স্পৃহা কমিল না, কার্য করিবার ইচ্ছা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :

> আশ্চর্য জ্ঞানস্পৃহা! আশ্চর্য কার্যশক্তি! ইহার পরে এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধিক কি তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক সুবিখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এই অবস্থাতেই সংকলিত। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রাতঃকালে, সুস্নিগ্ধ সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোনও দিন একঘণ্টা কোনও দিন দেড়ঘণ্টা করিয়া মুখে মুখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া লইত, এইরূপ করিয়া এ সকল মহাগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল !

উপাসক সম্প্রদায়

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমারের বহু বৎসরের সাধনার ফল উপাসক সম্প্রদায়ের ১ম ভাগ এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। অনেকের ধারণা যে উহা উইলসনের ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র ! এ ধারণা নিতান্ত-ভ্রান্ত। অক্ষয়কুমারের জীবনচরিতকার পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি দেখাইয়াছেন যে উইলসনের গ্রন্থে মাত্র ৪৫ প্রকার উপাসক সম্প্রদায়ের কথা লিখিত আছে, কিন্তু অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে ১৮২ প্রকার উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু বিদেশীয় বলিয়া উইলসনের গ্রন্থে অনেক মারাত্মক ভুল আছে। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থের উপক্রমণিকা (প্রথম ভাগে ১০৬ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় ভাগে ২৮২ পৃষ্ঠা) তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ও গবেষণার পরিচয় দেয়। অক্ষয়কুমারের এই গ্রন্থপাঠ করিয়া কি বিদেশীয় কি স্বদেশীয় কি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবগণ তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, সুচিন্তিত যুক্তি ও অপূর্ব রচনা কৌশলের পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। আচার্য ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছিলেন, আপনার মৌলিক গবেষণা দ্বারা আবিষ্কৃত তথ্যগুলি বহুমূল্য এবং তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করেন। একবার ম্যাক্সমূলার রামমোহন রায় প্রণীত 'তোহফতুল মোহদীন' নামক পারসীক গ্রন্থের এক প্রতিলিপি চাহিয়া পাঠাইলে অক্ষয়কুমার রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। এতৎসম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধারযোগ !—

"আপনার অনুগ্রহপত্র ও তোহফতুল মোহদীনের শেষ প্রুফ এক দিবসেই প্রাপ্ত হইয়া প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি, এই প্রুফ শ্রীমান মূলরের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি।

অনুগ্রহপূর্বক আপনার বন্ধুর লোকের দ্বারা উল্লিখিত পার্সী গ্রন্থের প্রতিলিপি করাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলে তাহাও আমি ভট্টজির নিকট যত্নপূর্বক প্রেরণ করিব। উক্ত তোহফতুল মোহদীন নামক পারসীক পুস্তকখানি কোন স্থানে ও কোন সময়ে প্রকাশিত হয়, আপনি যদি কিছু জানেন লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন।"

বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মনিয়ার উইলিয়মস্‌ও অক্ষয়কুমারকে লিখিয়াছিলেন যে আপনার দুইখণ্ড গ্রন্থে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ও গবেষণালব্ধ তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। উহা আমার অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয় এবং আমার পুস্তকাগারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবে।"

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"আপনার দীর্ঘকালব্যাপী রোগের জন্য দেশের কি অপার ক্ষতি হইয়াছে। তজ্জন্য আমি যত সন্তপ্ত এত আর কেহই নহে।"

রাজনারায়ণ বসু 'উপাসক সম্প্রদায়' পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

আপনার উপহার দত্ত 'উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় খণ্ড' প্রাপ্ত হইয়া কি পর্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। প্রথমত তো উহার প্রকাণ্ড আকৃতি দেখিয়া চক্ষুস্থির হইল। তাহার পর, উহাতে প্রদর্শিত পাণ্ডিত্য ও স্থানে স্থানে বাগ্মিতা ও কবিত্ব দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। অন্য লোকে সুস্থ শরীরে যাহা না করিতে পারে আপনি তাহা রুগ্ন শরীরে করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে উক্ত গ্রন্থে আপনার শরীরের বর্তমান অবস্থা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে চক্ষে জল আইসে। এই পুস্তকখানি দেখিয়া কত পুরাতন কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল, তাহা বলিতে পারি না। বেকন যথার্থই বলিয়াছেন 'Old love can never be forgotten.' রামমোহন রায়ের পাষাণপূর্তি এখনো হইল না বলিয়া আমাদিগের জাতিকে যে গালি দিয়াছেন, তাহারা সে গালি খাবার উপযুক্ত।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ উপক্রমণিকার শেষ অংশে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক উল্লিখিত রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে ঔদাসীন্য প্রকাশে বাঙালিকে অক্ষয়কুমার এইরূপে গালি দিয়াছেন :

> "এটি যদি একটি খ্যাতাপন্ন ইংরাজের প্রতিমূর্তি নির্মানের সংকল্প হইত, তাহা হইলে কত নানাপদস্থ ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব, কত রাজ্যশূন্য রাজোপাধিকের রাজস্বভাগ, কত কর্মচারিত্বপদের বেতনমূদ্রা, কত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের লভ্যাংশ ও কত কত অন্যতম স্বাধীন বৃত্তির আয়-টঙ্ক মুহূর্তমাত্রে দান-পুস্তকে অঙ্কিত ও অবিলম্বে একত্র রাশিকৃত হইয়া কার্য সম্পন্ন করিয়া দিত। অথবা রামমোহন রায়েরই স্মরণ চিহ্ন সংস্থাপনার্থ যদি একটি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ উদ্যোগী হইতেন, তাহা হইলেও কোন কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদলাভ প্রার্থনাতেই অক্লেশে সমুদয় সুসিদ্ধ

করিয়া তুলিত। আমাদিগকে ধিক ! এমন দুর্দশাপন্ন হইয়াও হিন্দুজাতির চিরস্থায়ী হইবার ইচ্ছা আছে। যখন আমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, তখন এরূপ ধিক্কার উচ্চারণ ও আর্তনাদ প্রকাশ করা শোভা পায় না। কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপত্তি ও জ্বলন্ত দাবানলের সুদীর্ঘ শিখা-সমুস্তবকে কে নিবারণ করিতে পারে? প্রচুর বারিবর্ষণ না হইলে দাবানল আপন অধারকে ভস্মীভূত না করিয়া নিরস্ত হয় না। ভিক্ষা দূরে থাকুক, চেষ্টা দূরে থাকুক, বাক্য স্ফুরণেরও শক্তি নাই। পূর্বোক্ত পংক্তিগুলি আমার চিতাভস্মের অন্তর্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই নয় ! তাহাতে কুত্রাপি কিছু উৎসাহজনক উদ্দীপনা করিলে সৌভাগ্যের বিষয় হইত। উৎসাহ প্রদীপ্ত হইল, ইতস্তত তাহার উত্তাপও অনুভূত হইল কিন্তু তালপত্রের অগ্নিপ্রদীপ্ত হইয়াই নির্বাণ হইয়া গেল ! মনস্তাপ ! মনস্তাপ ! মনস্তাপ ! অনেকে শৃগাল-প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করিবেন, তথাচ সিংহপ্রতিমূর্তি দর্শনে কেহও উদ্যোগী হইবেন না। এ দেশে মানব-প্রকৃতির কি বিকৃতি ও বিপর্যয়ই ঘটিয়াছে !—ও ইউরোপ ও আমেরিকা ! একবার এদিকে নেত্রপাত কর যদি রামমোহন রায়ের স্বদেশীয়বর্গের কতদূর অধঃপাত ঘটিতে পারে দেখিতে চাও, তবে আমাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। উত্তম পদার্থ কিরূপে অধম হয়, উচ্চাশয় কিরূপে নীচাশয় হয় ও মনুষ্য-দেহ কিরূপে অমানুষের আধার হয়, তাহা একবার আমাদের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর। পর্ব্বত কিরূপে গহ্বর হয়, হীরক কিরূপে অঙ্গার হয়, ও জলন্ত কাষ্ঠ কিরূপে ভস্মরাশিতে পরিণত হয়, তাহা একবার এই বর্তমান অকৃতজ্ঞ নরাধম জাতির প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর !!"

ধর্মনীতি (১৮৭৬)

পূর্বে বলিয়াছি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভাগ এবং তাহার বারো বৎসর পরে দ্বিতীয় ভাগ 'উপাসক সম্প্রদায়' প্রকাশিত হয়। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশিত করিতে যে কোনও সুস্থকায় সাহিত্যিকের ইহাপেক্ষা অধিক কাল কাটিয়া যায়। কিন্তু রুগ্ন দেহেও অক্ষয়কুমার ইহারই মধ্যে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 'ধর্মনীতি' নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এই গ্রন্থখানিকে অক্ষয়কুমারের "বাহ্যবস্তু" অপেক্ষা উচ্চতর আসন দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

> "ধর্মনীতি"তেও শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান, ধর্ম প্রবৃত্তি উন্নতি সাধন, দম্পতির পরস্পর ব্যবহার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ও পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ইত্যাদি অনেক গুরুতর বিষয়ের উপদেশ, বিচার ও মীমাংসা আছে। সে সকল বিষয় অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলে ধর্মানুরাগ বর্ধিত হয়, মন উন্নত হয়, অনেক কুসংস্কার দূর হয় এবং কর্তব্য কর্মে দৃঢ়তর আস্থা জন্মে। বাহ্যবস্তুতেও এই সকল বিষয়েরই অনেক উপদেশ আছে; সুতরাং ধর্মনীতি, বাহ্যবস্তুর প্রতিরূপ স্বরূপ হইলেও আমাদের দৃষ্টিতে এইখানিই অধিকতর রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইহাতে তত আড়ম্বর নাই—বাহ্যবস্তু অনর্থক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ।

রচনাও বাহ্যবস্তু অপেক্ষা ধর্মনীতিতে অধিকতর সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লক্ষিত হয়। অক্ষয়বাবুর প্রায় সকল পুস্তকে অনেক ইংরেজি শব্দ বাঙালাতে অনুবাদিত হইয়াছে। সেগুলি সুন্দর হইয়াছে।

প্রকৃতিবাদী

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার তাঁহার উইল বা চরমপত্র প্রস্তুত করেন। তাঁহার পরম বন্ধু শ্রীনাথ ঘোষ মহাশয়ের জামাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল (ও পরে বিচারপতি) সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে উহা সংশোধন ও আইনসঙ্গত করিয়া দিতে বলেন। সারদাচরণ লিখিয়াছেন্ যে তিনি উইলখানি সংশোধন করিয়া তাঁহার মুহুরী দ্বারা নকল করিয়া ফেরত পাঠাইলে অক্ষয়কুমার তাঁহাকে দেখিতে চাহেন। উইলের নকলের শীর্ষ দেশে মুহুরী প্রথামত "শ্রীশ্রীহরি" লিখিয়াছিল। অক্ষয়কুমার সারদাচরণকে জিজ্ঞাসা করেন—"উইলের উপরিভাগে ঈশ্বরের কিম্বা কোন দেবতার নাম না লিখিলে কি চলে না?" সারদাচরণ বলেন—"কিছুই লিখিবার প্রয়োজন নাই, তবে বাঙলায় উইল হইলে প্রায়ই কোন না কোন, দেবতার নাম লিখা হইয়া থাকে।" তিনি বলিলেন—"তবে বিশ্ববীজ লিখায় কি কোন আপত্তি আছে।" সারদাচরণ উত্তর দেন—"কোন আপত্তি নাই; কিছুই না লেখায়ও ক্ষতি নাই।" সারদাচরণ লিখিয়াছেন—"তৎকালে অক্ষয়কুমারের মনের গতি কোন্ দিকে চলিতেছিল, তাঁহার ধর্মবিশ্বাস কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহা এই কথাবার্তায় বুঝিতে পারা যায়। তিনি তখন প্রকৃতিবাদী হইয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও সংখ্যাদি দর্শন-অধ্যয়ন দ্বারা তাঁহার মানসিক প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়াছিল, ধর্মবিশ্বাসের বিপ্লব হইয়াছিল।"

অক্ষয়কুমার যথাসাধ্য দানাদি করিয়াও পুস্তকের আয়ে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতায় মসজিদবাড়ী স্ট্রিটে একখানি বাটী, এবং বালীতে উদ্যানবাটিকা ব্যতীত তিনি ৩৬০০০ টাকা রাখিয়া যান। তাঁহার দুই পুত্র তাঁহার জীবদ্দশায় স্বর্গারোহণ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র রজনীনাথ, পৌত্র (পরে প্রসিদ্ধ কবি) সত্যেন্দ্রনাথ, দুই কন্যা রাজমোহিনী ও বিরাজমোহিনী বর্তমান সত্ত্বেও তিনি তাঁহার চরমপত্রে তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তির ৩/৪ ভাগ বিজ্ঞানালোচনা, বিদ্যোৎসাহবর্ধন, দরিদ্র দুঃখ বিমোচন ও বালকগণের শরীর পুষ্টির জন্য অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা নিমতা নিবাসী বিষ্ণুচন্দ্র মিত্র, পরম বন্ধু আনন্দকৃষ্ণ বসু, সারদাচরণ মিত্র ও গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর নিবাসী ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার বিষয়ের একজিকিউটর নিযুক্ত করেন। তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর ২০ বৎসর ইহারা উইল অনুসারে কার্য করিয়া তাঁহার পুত্র পৌত্রকে তাঁহাদের স্ব স্ব বিষয় বুঝাইয়া দিবেন।

স্বর্গারোহণ

১২৯৩ সালের ১৪ জ্যৈষ্ঠ (ইং ২৭ মে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) রাত্রি ৩টার পর তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই দিন সন্ধ্যাকালেও তিনি নিয়মিত বায়ু সেবন করিয়া আসিয়াছিলেন, কোন বিশেষ পীড়া ছিল না। অধিক রাত্রিতে আহার করিয়া সুপারি চিবাইতে চিবাইতে হঠাৎ তাঁহার বিষম লাগে এবং ইহা হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর দুই তিন মাস পূর্বে সারদাচরণ তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সারদাচরণ লিখিয়াছেন, "তখন তিনি আরও শীর্ণ হইয়াছিলেন। অনেক কথার পর আমাকে বলিলেন—'বাবা, তুমি ত উইল অনুসারে আমার সম্পত্তির পর্যালোচনা করিবে। কিন্তু আমার মৃতদেহ সম্বন্ধে একটি কথা আছে ; আমার মৃত্যু সংবাদ পাইলেই তুমি এখানে আসিবে। যতক্ষণ তুমি না আসিবে, আমার সৎকার হইবে না। ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া সৎকারের আদেশ দিবে, কিন্তু মৃত্যুর পর অন্তত ছয় ঘণ্টা সৎকার হইবে না' এই কথার উদ্দেশ্য কি, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না, আমিও তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য করিয়াছিলাম।"

মৃত্যুর পরদিন বেলা ১০।১১টার সময় তাঁহার পুত্র রজনীনাথ বালীর ঘাটে অক্ষয়কুমারের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাঁহার নির্দেশানুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধে পাঁচ শত টাকার অধিক ব্যয় করা হয় নাই।

চরিত্র

অক্ষয়কুমার অসাধারণ অধ্যবসায়শীল, বিদ্যানুরাগী, পরোপকারী ও তেজস্বী মহাপুরুষ ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে পারিবারিক কারণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিদ্যার চর্চা—জ্ঞানের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সারদাচরণ মিত্র একস্থানে লিখিয়াছেন : মৃত্যুর দুই একমাস পূর্বেও বিজ্ঞানে তাঁহার এরূপ আসক্তি ছিল যে, তিনি বিলাত হইতে প্রায় ১৫০ টাকা মূল্যের ভূতত্ত্বের নমুনা (specimen) আনিবার বন্দোবস্ত করেন। সেগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল।

সারদাচরণ অক্ষয়কুমারের পুস্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

> অনেকগুলি পুস্তক আমি খুলিয়া দেখিলাম ও দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। তিনি সকলগুলি পড়িয়াছিলেন অথবা অপরের দ্বারা পড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। পেনি সাইক্লোপিডিয়ার ধারে অনেক স্থলেই বাঙলায় তাঁহার অভিপ্রায় লিখা আছে। এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণাল' প্রায় সমস্তই ছিল এবং পাশে পাশে বাঙলায় তাঁহার টিপ্পনী। গণিতশাস্ত্রের অনেক পুস্তক

ছিল, এমন কি 'ক্যালকুলাস'ও তিনি পড়িয়াছিলেন। ফ্লাক্সানেও (fluxion) তাঁহার টীকা। জ্যোতিষ, প্রত্নতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, শারীরিক বিদ্যা, ভাষা বিজ্ঞান, প্রায় সকল প্রকার বিজ্ঞানেরই পুস্তক ছিল ও সকল পুস্তকই তিনি পড়িয়াছিলেন, সকল পুস্তকেই তাঁহার টিপ্পনী। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮ বৎসর পুস্তকগুলি আমার নিকটে ছিল, অনেক সময় আমি তাহার অনেকগুলি দেখিয়াছি; তাঁহার অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ের এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়াছি। অনেকে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাগারের শোভা বর্ধিত করেন, অনেকে পরের উপকারার্থ বিবিধ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন; অক্ষয়কুমার তাঁহার সংগৃহীত পুস্তক সমস্তই পড়িতেন বা পাঠ করাইয়া শুনিতেন ও তাহার স্বাদ সংগ্রহ করিতেন। তিনি সকল শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা পড়িলে তাঁহার বিদ্যানুশীলনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মনীষী সারদাচরণের উপরিধৃত মন্তব্যের পর এ বিষয়ে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। অনেকের জ্ঞানার্জন স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু প্রাণপণে একনিষ্ঠভাবে মাতৃভাষায় সেবার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। উপাসক সম্প্রদায় কিভাবে সঙ্কলিত হয় তাহা পূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহার দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় অক্ষয়কুমার স্বয়ং লিখিয়াছেন :

শরীরের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় এতদূর চলিল, তাহা কি বলিব? না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থশ্রবণ কোনরূপ মানসিক ও শারীরিক কার্যেই আমি সমর্থ নই। ইহার কোন কার্যে প্রবৃত্ত মানেই মানসিক কষ্ট হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় এ ভাগের কি রচনা, কি শোধণ, কি মুদ্রাঙ্কন, যে কিছু কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটিবারও নেত্রপাত করিতে পরি নাই। অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ়-ভাব-সমন্বিত চিন্তা-প্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ক্ষয় করিতেছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা নিবাবণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কষ্ট হয় অন্যমনষ্ক হইবার উদ্দেশ্যে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে চিন্তা-স্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদায় এবং যাহা কিছু অন্যরূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ মস্তকমধ্যে দুঃসহ 'যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্মচারীকে বা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে, যানবাহন দ্বারা দূরস্থিত বন্ধু-বিশেষের সমীপে গমনপূর্বক লিখিতে অনুরোধ করি। যাহার ষত্বণত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, অপার্যমানে কখন কখন এরূপ অশিক্ষিত ও অযোগ্য লেখকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। অর্ধরাত্রেও নিদ্রাকাতর কর্মচারীকে আহ্বান করিয়া কতবার কত বিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃপুনঃ আন্দোলন হইয়া সে রজনীতে নিদ্রার সম্ভাবনা থাকিত না। মনোমধ্যে এরূপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট এবং সে পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ না করা হয়, সে পর্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভব হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা-নিবারণ উদ্দেশেই লিপিবদ্ধ করাইতে হইয়াছে এবং ইহাতেই অতীব অল্পে অল্পে পুস্তকখানি একরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। কোন বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ উদ্দেশে কোন গ্রন্থার্থ অবগত হইবার

প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতে হয়। তাহাই কি যে সে দিনে ও যে সে সময়ে শুনিতে পারি? না সমুচিত মনঃসংযোগ করিতেই সমর্থ হই? শরীরের অবস্থানুসারে দিন-বিশেষে ও সময় বিশেষে ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে হইয়াছে। এইরূপ করিয়া কখনও পাঁচ-সাত পংক্তি, কখনও দুই-চারি পংক্তি, কখনও দুই-চারিটি বা দুই-একটি শব্দমাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়। সেই সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সমুদায় বাক্য যে প্রথমে যথাস্থানে পর পর লিখিত হয়, পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না। কোন্ বাক্যটি কোন্ স্থানে, বা কোন্ বাক্যের পর বিনিবেশিত হইবে, উক্তরূপে লিপিবদ্ধ করাইবার সময় তাহা কিছুই স্থির থাকে না। সে সমুদায় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা হয়, সেই দিনই বিভ্রাট। পূর্বোক্তরূপে, শরীরের অবস্থানুসারে দিনবিশেষে ও সময়-বিশেষে তদর্থ ঔষধ-বিশেষ সেবন ও অন্য অন্য নানারূপ প্রক্রিয়া কবিয়া বহু কষ্টে সেটি কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি।

বাস্তবিক অক্ষয়কুমার মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার রুগ্ন দেহ ও মনে অক্ষয়কুমার দত্তের এই অপূর্ব সাহিত্য সাধনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন :

আপনারা অধ্যবসায়ে পঙ্গুর পর্বত লঙ্ঘন, স্পর্শজ্ঞানে—অন্ধের বর্ণপরীক্ষা, মানসবলে—অশক্তজানু মানবের অশ্বারোহণে নিপুণতা প্রভৃতি অনেক অলৌকিক সাধনার কথা শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু এরূপ পীড়িতমস্তিষ্ক মানবের এরূপ মস্তিষ্ক-ব্যায়াম আর কখন শুনিয়াছেন কি?"

আজিকার সাহিত্যযশঃপ্রার্থী লেখকগণ অক্ষয়কুমারের নীরব সাহিত্যসাধনার ইতিহাস হইতে অনেক শিক্ষা আহরণ করিতে পারেন।

স্মৃতিরক্ষা

অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বলিগ্রামে একটি শোকসভা আহূত হয়। কলিকাতাতেও প্রবীণ সাহিত্যিক গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি বৃহত্তর সভা আহূত হয়। শেষোক্ত সভায় কুমার (পরে রাজা বাহাদুর) বিনয়কৃষ্ণ দেব, মিঃ এইচ, বেভরিজ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বহু মান্যগণ্য ব্যক্তিকে লইয়া একটি স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেব উহার সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় বাগাড়ম্বরপ্রিয় বাঙালি বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম জন্মদাতা অক্ষয়কুমারের কোনও উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন এ পর্যন্ত স্থাপন করেন নাই। কিন্তু

অক্ষয়কুমার স্বয়ং তাঁহার যে অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাঙলা সাহিত্যের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন তাহা কালস্রোতে ধৌত হইয়া উজ্জ্বলতররূপে প্রকৃত সাহিত্যানুরাগীগণের নিকট প্রতিভাত হইবে।

সূত্রাবলি

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[২] সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকাব।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত
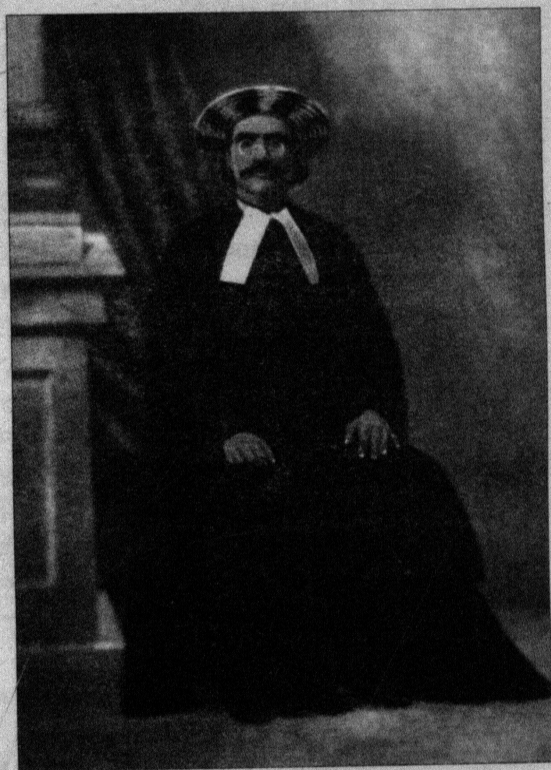
বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পুণ্যশীলা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার উদার ঘোষণাপত্রে বিঘোষিত হইয়াছিল যে তাঁহার প্রজাগণ জাতি ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে এতদ্দেশে উচ্চতম রাজকার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত ঘোষণার কয়েক বৎসরের মধ্যে কোনও চিহ্নিত উচ্চপদে ভারতবাসী নিযুক্ত হন নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পূর্বে প্রস্তাবিত প্রধান ধর্মাধিকরণে ভারতবাসীকে অন্যতম বিচারপতিপদে নিযুক্ত করিয়া তাহার যোগ্যতা পরীক্ষা করা হউক, দেশবাসী এই প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইলে যে প্রতিভাশালী বঙ্গবাসী স্বীয় মনীষাবলে সর্বপ্রথমে এই পদ অধিকৃত করিয়া ভারতবাসীর যোগ্যতা প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন এবং উক্তপদে ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ নিয়োগের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন, সেই উদার নিষ্কলঙ্কচরিত্র, পরোপকারী ধর্মভীরু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নাম বাঙালির অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভে চিরদিন সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। আমরা বর্তমান প্রস্তাবে দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সেই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছি।

জন্ম ও বংশ-বিবরণ

১৮২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে এক কাশ্মীরীয় প্রধান ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সদাশিব পণ্ডিত তাঁহার অব্যবহিত পূর্বপুরুষগণের বাসস্থান লক্ষ্ণৌ নগরী পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় আগমন করেন এবং পারস্যভাষায় পারদর্শিতার জন্য সদর আদালতে পেশকারের পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। তিনি অতি মিষ্টভাষী সদালাপী ও ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন তাদৃশ সঙ্গতিশালী না হইলেও চরিত্রমাধুর্যে সকলের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

শিক্ষা

শৈশবে শম্ভুনাথের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। সেইজন্য তিনি লক্ষ্ণৌনগরীতে তাঁহার মাতুলালয়ে প্রেরিত হন এবং এই স্থানেই মাতুলের তত্ত্বাবধানে তিনি উর্দু ও পারস্যভাষায়

শিক্ষালাভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি ইংরাজী ভাষায় শিক্ষালাভার্থ বারাণসীধামে প্রেরিত হন। এইস্থানে কিছুকাল অধ্যয়নের পরে চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শম্ভুনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

হিন্দু কলেজের ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্রগণ এই সময়ে মদ্যপান ও অখাদ্য ভোজন দ্বারা, এবং মিশনারীগণ দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ খৃষ্ট ধর্মানুরক্তি প্রদর্শন করিয়া যেভাবে হিন্দু আচার ও ধর্ম পদদলিত করত অভিভাবকগণের বক্ষে শেলাঘাত করিতেছিলেন তাহাতে হিন্দু অভিভাবকগণ সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভীত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। শোভাবাজারের ধর্মনিষ্ঠ রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব ও রাজা কালীকৃষ্ণ দেব নড়াইলের জমিদার (রাম) রতন রায়, সিমুলিয়ার কাশীনাথ ঘোষ এবং নিমতলার দত্তবংশীয়গণ প্রভৃতির সহযোগিতায় গৌরমোহন আঢ্য ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১ মার্চ দিবসে নিমতলা মাণিক বসু ঘাট স্ট্রিটের এক বাটীতে 'ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী' নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া উচ্চতম প্রতীচ্যশিক্ষার সহিত হিন্দু বালকগণের হৃদয়ে স্বধর্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করিবার প্রয়াস পান। আমরা স্থানান্তরে এই বিদ্যালয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং যে বিদ্যালয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও বেঙ্গলী'র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের ন্যায় অকৃত্রিম দেশসেবক, কৃষ্ণদাস পালের ন্যায় রাজনীতিবিশারদ, কৈলাসচন্দ্র বসু ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুলেখক এবং বর্তমান প্রস্তাবের বিষয়ীভূত হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ন্যায় ব্যবস্থাশাস্ত্রবিশারদ শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দুসমাজের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন, সেই বিদ্যালয়ের এখন আর কোনও পরিচয় দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

শম্ভুনাথের পিতা ধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত সদাশিব পুত্রকে গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়েই প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ইহার পূর্বে অল্পকাল শম্ভুনাথ হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে।

যাহাতে ছাত্রগণ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারে সেইদিকে গৌরমোহনের প্রথম দৃষ্টি ছিল। শৈশব হইতে ইংরাজী শব্দের যথাযথ উচ্চারণ শিক্ষা দিবার জন্য এবং বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি শিক্ষার জন্য তিনি নিম্নতর শ্রেণী হইতেই দুঃস্থ অথচ কৃতবিদ্য ইউরোপীয় শিক্ষক দ্বারা ছাত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে সময়ে শম্ভুনাথ সেমিনারিতে প্রবেশ করেন সেই সময়ে হার্মান জেফ্রয় নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত উহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং ইউরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় ইঁহার প্রভূত ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি প্রথমে ব্যারিস্টার হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন কিন্তু অত্যধিক পানদোষের জন্য ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন না, এবং অত্যন্ত দারিদ্রদশায় পতিত হন। গৌরমোহন মাত্র একশত মুদ্রা বেতনে ইঁহাকে স্বীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন।

শম্ভুনাথের সতীর্থগণের মধ্যে 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র এবং নিমতলার দত্তবংশোদ্ভব ভবানীচরণ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নিম্নশ্রেণীতে গিরিশচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ (পরে কিছুকাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান) শ্রীনাথ ঘোষ এবং আরও নিম্নশ্রেণীতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি পড়িতেন।

হার্মান জেফ্রয় অত্যন্ত যত্নসহকারে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছাত্র ক্ষেত্রচন্দ্র তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে এক এক দিন তিনি প্রমত্ত অবস্থাতেও ইংরাজী গ্রন্থাদি হইতে সুন্দর সুন্দর অংশের এরূপ মনোহর আবৃত্তি করিতেন যে তদ্দ্বারা ছাত্রগণ যথেষ্ট উপকৃত হইত।

হার্মান জেফ্রয় বিদ্যালয়ে একটি তর্কসভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি উহার সভাপতি ছিলেন। এই সভায় ক্ষেত্রচন্দ্র, শম্ভুনাথ, গিরিশচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র প্রভৃতি বিখ্যাত ছাত্রগণ ছাত্রাবস্থাতে প্রতি সপ্তাহে একবার বিচার ও তর্ক করিবার শক্তি অর্জন করিতেন। ক্ষেত্রচন্দ্র তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে এই বিতর্ক-সভায় জেফ্রয় ক্ষেত্রচন্দ্রকে তাঁহার বাগ্মিতার জন্য বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে সভার 'ডিমস্থিনীস' নামে অভিহিত করিতেন। শম্ভুনাথ ক্ষেত্রচন্দ্র অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও ক্লাসে তাঁহার নিম্নে ছিলেন। ইনি ক্ষেত্রচন্দ্রের ন্যায় বক্তৃতাশক্তির অধিকারী না হইলেও ইঁহার যুক্তিসমন্বিত তর্কশক্তি প্রবলতর ছিল এবং সেই জন্য হার্মান জেফ্রয় ইহাকে সভার 'ফোশিয়ন' নাম দিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রচন্দ্র ও ভবানীচরণ দত্ত তাঁহাদের শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। একবার রামগোপাল ঘোষ ভারতবর্ষের ইতিহাস, দর্শন ও নীতিশাস্ত্র, প্রবন্ধ-রচনা ও গণিতের জন্য কতকগুলি মোহর ও পারিতোষিক দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। ডাক্তার ডফের স্কুলের একজন ছাত্র শেষোক্ত বিষয়ে পুরস্কার লাভ করে, বাকী সমস্ত পুরস্কার ক্ষেত্রচন্দ্র ও ভবানীচরণ উভয়ে লাভ করেন। ক্ষেত্রচন্দ্র ৫টি মোহর পাইয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি পরিদর্শন করিতে আসেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া ক্ষেত্রচন্দ্রকে একটি রৌপ্য-পাত্র পুরস্কার দেন।

শম্ভুনাথ গণিতশাস্ত্রের মোটেই অনুরাগী ছিলেন না। তিনি 'পুস্তকের কীট' ছিলেন না কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অনন্যসাধারণ ছিল। ক্ষেত্রচন্দ্র তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে 'হার্মান জেফ্রয় প্রায়ই বলিতেন, যে ক্ষেত্রচন্দ্র ও শম্ভুনাথ এই দুইজন ছাত্র জগতে যশোলাভ করিবেন। শম্ভুনাথের বিষয়ে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।"

শম্ভুনাথ তাঁহার সুন্দর আকৃতি, মধুর চরিত্র এবং শিষ্ট ব্যবহার দ্বারা শিক্ষক ও সতীর্থগণের প্রীতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র একস্থানে

শম্ভুনাথের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক ছাত্রাবস্থার দুইটি গল্প এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

টিফিনের সময় ছাত্রেরা মাঠে খেলা করিতেছে এমন সময় একজন মাতাল সাহেব উলঙ্গ তরবারী হস্তে তথায় আগমন করিল ; মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল ; প্রাণভয়ে শিক্ষক ও ছাত্রেরা চতুর্দিকে ধাবমান হইল ; শম্ভুনাথের ধৈর্য ও সাহস একটি দুর্ঘটনা নিবারণ করিল। তিনি সাহসপূর্বক মাতাল ব্যক্তির সম্মুখীন হইলেন এবং তাহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া কৌশলে তাহাকে নিরস্ত্র করিলেন। আর একবার এক ভীষণদর্শন ফকীর একটি ছাত্রকে অবমাননা করায় শম্ভুনাথ একদল ছাত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অপরাধীকে ধৃত করত বিদ্যালয়-সংলগ্ন মাঠে আনিয়া তাহার অপরাধের সমুচিত শাস্তি বিধান করেন।

সেকালে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষাসমূহ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা গৃহীত হইত। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি স্যর এডওয়ার্ড রায়্যান, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ও বিখ্যাত লেখক কাপ্তেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন প্রভৃতি ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিতেন।

আর্থিক অসচ্ছলতানিবন্ধন ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে শম্ভুনাথ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার বিদ্যালয় পরিত্যাগকালে গৌরমোহন তাঁহার চরিত্রের উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ এক-খানি পত্র দেন এবং অধ্যক্ষ হার্মান জেফ্রয় তাঁহার প্রতিষ্ঠাপত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ—

> শম্ভুনাথ পণ্ডিত ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর প্রথম শ্রেণীর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। স্যর এডওয়ার্ড রায়্যান, কাপ্তেন রিচার্ডসন এবং অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণ উহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং উহার ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট জ্ঞান জন্মিয়াছে স্বীকার করেন। তিনি পারস্য ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন তাহাও আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি। তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র সর্ব্বদাই তাঁহার শিক্ষকমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

সহকারী মহাফেজ

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর শম্ভুনাথ কুড়ি টাকা মাসিক বেতনে সদর আদালতে মহাফেজের সহকারী (Asstt. Record Keeper) নিযুক্ত হন। এই কার্যে নিযুক্ত থাকা কালে বাঙলা ও পারস্যভাষায় লিখিত দলিলাদির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া তিনি বেতনাধিক কিছু উপার্জন করিতেন। এই অনুবাদগুলি ইউরোপীয়গণের প্রশংসা লাভ করিত। তাঁহার পরিশ্রমশীলতা ও কর্মদক্ষতাগুণে প্রীত হইয়া স্যর রবার্ট বার্লো তাঁহাকে তাঁহার অধীনে ডিক্রীজারী মুহুরীর পদে নিযুক্ত করেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ

এই সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সদর আদালতের ধর্মভীরু উকীল অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ধর্মশাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে "ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ" সম্বন্ধে তাঁহার একখানি সুযুক্তিপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পরে শম্ভুনাথ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হন, হরিশচন্দ্র ও অন্নদাপ্রসাদ উহার উৎসাহশীল অধ্যক্ষ ছিলেন।

বেকন-সন্দর্ভের টীকা

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শম্ভুনাথ তাঁহার সতীর্থ ভবানীচরণ দত্তের সহযোগিতায় বেকনের প্রবন্ধাবলীর একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। উহার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া মেজর ডি এল রিচার্ডসন লিখিয়াছিলেন—"বেকনের টীকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ—উহা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। তুমি টাউনহলে যে চমৎকার পরীক্ষা দিয়াছিলে তাহার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে।"

এই টীকার সেকালে খুব আদর হইয়াছিল এবং কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন যে এই গ্রন্থ প্রকাশের পরে গ্রন্থকারদ্বয় বাঙলায় 'বোমণ্ট ও ফ্রেচার' নামে অভিহিত হইতেন।

ডিক্রীজারীর আইন।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি ডিক্রীজারীর আইন সম্বন্ধে একটি ইংরাজী পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। এই পুস্তিকা সদর কোর্টের বিচারপতিগণের ও গভর্নমেণ্টের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং স্যর রবার্ট বার্লো তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারির কৃতিত্ব দর্শনে সবিশেষ আনন্দিত হন।

ওকালতি

এই সময়ে সদর আদালতে মিসিলখাঁর (Reader) পদ শূন্য হয় এবং শম্ভুনাথ উক্ত পদের প্রার্থী হন। কিন্তু এই কর্ম অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং শম্ভুনাথের শ্বাসরোগের সম্ভাবনা আছে বলিয়া পিতৃপ্রতিম স্যর রবার্ট বার্লো তাঁহাকে উক্ত কর্মের প্রার্থনা করিতে নিষেধ করেন। চব্বিশ পরগণায় তৎকালীন সদর আমীন হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট শম্ভুনাথ

এই বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করায় ঘোষ মহাশয় শম্ভুনাথকে আইন অধ্যয়ন করিয়া সদর আদালতে ওকালতি করিবার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শানুসারে শম্ভুনাথ কঠোর পরিশ্রম সরকারে আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ওকালতি পরীক্ষা দিবার পূর্বে চরিত্র সম্বন্ধে একটি সুপারিশ-পত্র দাখিল করিতে হইত। সদর কোর্টের রেজিস্ট্রার কার্ক পেট্রিক ১৯ জুলাই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শম্ভুনাথকে নিম্নলিখিত প্রশংসাপত্র দেন—

> এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাইতেছে যে, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সদর আদালতের অফিসে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নিয়োগাবধি আমি তাঁহার চরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভের সুযোগ পাইয়াছি। তিনি ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং প্রাধান প্রধান প্রাচ্য ভাষাগুলিতেও তাঁহার সমধিক অধিকার আছে। তাঁহার নীতিজ্ঞানও প্রশংসনীয় এবং ইংরাজী শিক্ষার অনুযায়ী এবং তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র নির্দোষ, এই কারণে যাঁহারা জানেন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার সকল বিষয়েই বেশ জ্ঞান আছে—আইন প্রভৃতির জ্ঞান কিছু কম নহে।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ নভেম্বর শম্ভুনাথ সদর কোর্টে ওকালতির সনন্দ প্রাপ্ত হন। অতি শীঘ্রই শম্ভুনাথ ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করেন। ইহার কারণ এই যে যখন তিনি অল্প বেতনে মুহুরীর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন হইতেই সযত্নে ব্যবহারশাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং নিজ বাটীতে স্বনামধন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বন্ধুগণের সহিত জটিল মোকদ্দমা-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া আইনের কূট তর্কবিতর্ক দ্বারা স্বাভাবিক-ই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মার্জিত করিতেন। হরিশচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ গিরিশচন্দ্র হরিশচন্দ্রের জীবনচরিত বিষয়ক এক প্রস্তাবে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম এই ঃ—

> সে সময়ে এক্ষণকার সুপ্রসিদ্ধ সরকারী উকিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত সদর কোর্টের একজন মুহুরীমাত্র ছিলেন। তিনি ভবানীপুর আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কক্ষে তাঁহার সদ্‌গুণে মুগ্ধ ও অবাধে বিতরিত চাট্‌নীলুব্ধ একদল যুবক শীঘ্রই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। হরিশ উক্ত দলের নেতা ছিলেন। শম্ভুনাথ বা হরিশ কেহই অনর্থক গল্পগুজবে কালক্ষেপ করিতে ভালবাসিতেন না। উভয়েই কর্মপ্রিয় ছিলেন, এবং তাহার ফলে শীঘ্রই একটি আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আইন সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইত তাহা অতি উচ্চদরের। কোন অপরিচিত ব্যক্তি সহসা সে গৃহে প্রবেশ করিলে তাহা ব্যবহারাজীবদিগের শিক্ষাস্থান বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন। আইনের বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থাদি পরস্পরের প্রতি নবশিক্ষার্থীর উৎসাহ এবং প্রধান ব্যবহারাজীবের নিপুণতার সহিত নিক্ষিপ্ত ও প্রতিনিক্ষিপ্ত হইতেছে। তর্ক-বিতর্কের স্রোত এরূপ বেগে প্রবাহিত হইতেছে যে অবিশেষজ্ঞের পক্ষে তাহার গতি নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য, মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়। প্রথম আদালত যে রায় দিয়াছেন, আপীল আদালতে তাহা রহিত হইয়াছে, তাহার পর সদর আদালতে তাহার আলোচনা হইয়া পুনর্বিচারের আদেশ হইয়াছে। শম্ভুনাথের

বাড়িতে যে কাল্পনিক আদালত বসিয়াছে তাহাতে সমস্ত মোকদ্দমা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পুনরালোচিত হইল, উভয় পক্ষেই কৌন্সিলী নিযুক্ত হইয়া যেরূপ উৎসাহের সহিত বাকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা প্রকৃত বিচারালয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যে সকল অভিমত প্রকাশিত হইল তাহা সারবত্তা ও মৌলিকতায় সদর আদালতের বিজ্ঞতম বিচারকের অভিমতের সমতুল্য। তাহার পর এক অত্যুগ্র বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। অমুক আইনের অমুক বিধান এই মতের অনুকূল, কিন্তু অমুক আইনের অমুক বিশেষ বিধান ইহার প্রতিকূল। উক্ত বিশেষ বিধানের মূল বিশ্লেষিত হইল। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হইল। হরিশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ প্রতিভা এই সকল সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল, তাঁহার কণ্ঠস্বর অপর সকলের কণ্ঠস্বর অতিক্রম করিয়া উঠিল। তাঁহার অসাধারণ মানসিক শক্তি তর্কে এবং শেষ মীমাংসায় সকলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল।

প্রতিভাশালী বন্ধুগণের সহিত তর্ক-বিতর্ক দ্বারা শম্ভুনাথ তাঁহার তর্কশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে সহায়তা

এই সময়ে ভারতবর্ষের ব্যবস্থা-সচিব ও শিক্ষা-পরিষদের পুণ্যশ্লোক জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্বদেশহিতৈষিগণের সহযোগে নিজ ব্যয়ে একটি বালিকা বিদ্যালয় (এক্ষণে বেথুন কলেজ) প্রতিষ্ঠিত করেন। শম্ভুনাথ চিরদিন স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং এই বিদ্যালয়ে তাঁহার কন্যা মালতীকে সর্বপ্রথমে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এই সূত্রে বেথুনের সহিত শম্ভুনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। শম্ভুনাথকে লিখিত বেথুনের কয়েকখানি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইতে পারে।

[১]

চৌরঙ্গী
৯ জুলাই ১৮৪৯

.... কিছুদিন পূর্বে আপনি আপনার কন্যার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মিসেস রিড্‌সডেলকে যে পত্রোত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি তাহা আমাকে দেখাইয়াছিলেন এবং তাহা পাঠ করিয়া আপনার সম্বন্ধে আমার এমত উচ্চ ধারণা হইয়াছিল যে আমি সংকল্প করিয়াছিলাম যে আপনাকে লিখিয়া জানাইব যে আমি আপনার সহিত ব্যক্তিগতভাবে

আলাপ করিতে অভিলাষী। আমার ইচ্ছামত তদ্দণ্ডেই আপনাকে লিখি নাই ইহা ভালই হইয়াছে, কারণ আমার মনে হয় যে এই পত্র আপনি আরও সমাদর পূর্বক গ্রহণ করিবেন যেহেতু এক্ষণে আমার স্কুলে আপনার কন্যা দ্বারা প্রস্তুত এক জোড়া জুতা এতৎসহ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলাম। যদি উহা আমার নামে তাহাকে উপহার দেন তাহা হইলে আমি পরম আনন্দিত হইব। আমি মিসেস রিড্ সডেলের নিকট শুনিলাম সে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠা ছাত্রী এবং তিনি তাহার পাঠে উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত। শনিবার বা রবিবার ব্যতীত যে কোন দিন প্রাতে মদীয় ভবনে আপনি অবসরমত সাক্ষাৎ করিলে আমি সুখী হইব। আপনি আপনার পত্রে যে সকল মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আপনার উন্নত হৃদয়ের পরিচায়ক এবং ঐরূপ সারবান মত পোষণ করেন এবং সৎসাহসের সহিত দৃঢ়ভাবে তাহা অবলম্বন করিয়া থাকেন এইরূপ ব্যক্তি যত অধিক হয় ততই বাঞ্ছনীয়।

[২]

৫ নভেম্বর ১৮৪৯

.... আমি আপনাকে পরে যেরূপ বলিয়াছি তাঁহাকেও সেইরূপই কহিয়াছি এবং যিনি জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাকেই আমি আনন্দের সহিত জানাইব যে আমি আপনার বিষয়ে অতি উচ্চ মত পোষণ করি—কি প্রতিভা সম্বন্ধে কি চরিত্র সম্বন্ধে ; এবং আপনার যদি কোন উপকারে আসে আমি সানন্দে যথাসাধ্য করিব। যাঁহাদিগকে আমি বিশ্বাস করি তাঁহাদিগকে আমি সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করি।

আপনার বিশ্বস্ত
জে-ই-ডি বেথুন।

পুনশ্চ। আমি অদ্য প্রাতে আপনার বাটী হইতে আপনার কন্যার প্রস্তুত একজোড়া শ্লিপার জুতা লইয়া আসিয়াছি। উহা আমাকে প্রদত্ত হয় সে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে আমি ও সে উভয়ে মিলিয়া উহা আপনাকে উপহার দিই কিন্তু তাহার প্রথম অভিপ্রায় হইতে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে না পারায় আমি ভাবিলাম আমার পক্ষে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ হইবে।

পিয়ার্সনের 'বাক্যাবলি'

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ৮ এপ্রিল বেথুন নিম্নলিখিত পত্রে শম্ভুনাথকে অনুরোধ করেন যে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পিয়ার্সন সাহেবের বাক্যাবলি'র নূতন

সংস্করণে আইনঘটিত বাঙলা শব্দ ও তাহার ইংরাজী প্রতিশব্দের একটি তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিয়া গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দিন ঃ—

[৩]

"... কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি শীঘ্রই পিয়ার্সনের বাক্যাবলি পুনর্মুদ্রিত করিবেন—উহা ইংরাজী ও বাঙলা শব্দের অভিধান। এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে যে কতকগুলি পৃষ্ঠায় আইনঘটিত ও বিচারালয়ে ব্যবহৃত শব্দের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইলে উহা অধিকতর উপকারে আসিবে। যদি আপনার এই কার্যের অবসর থাকে তাহা হইলে উহার ভার গ্রহণ করিতে আপনাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ আছেন বলিয়া আমি অবগত নই। যদি আপনি এই ভার গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে সোসাইটির সম্পাদক মিস্টার সাইক্‌স্‌কে জানাইলে তিনি আপনাকে একখণ্ড পুস্তক পাঠাইয়া দিবেন। কি করিতে হইবে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
জে-ই-ডি বেথুন

শম্ভুনাথ সানন্দে এই কার্যভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সম্পাদনায় গ্রন্থখানির মূল্য বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা প্রকাশের পূর্বেই মহাত্মা বেথুন ইহলোক হইতে অবসৃত হন এবং শম্ভুনাথ তাঁহার একজন অকৃত্রিম ও হিতৈষী বন্ধুর বিয়োগ বেদনায় ব্যথিত হন।

বেথুন সোসাইটি

মহাত্মা বেথুনের পরলোক গমনের পর তাঁহার ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অনুরাগী বন্ধুগণ 'বেথুন সোসাইটি' নামক এক সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করেন। শম্ভুনাথ এই সভার অন্যতম উৎসাহশীল ও হিতৈষী সভ্য ছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উহার তদানীন্তন সভাপতি শিক্ষাসুহৃদ ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডর ডফ্‌ ভারতবর্ষ পরিত্যাগের উদ্যোগ করিলে বেথুন সভার সভ্যগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে একটি বিদায়-অভিনন্দন-পত্র প্রদানার্থ পাইকপাড়ার স্বনামধন্য রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত করেন। শম্ভুনাথ এই সভায় প্রথম প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া একটি হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রতাপচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলে শম্ভুনাথ বেথুন সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। শম্ভুনাথ এই সভার কিরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত সভার সভাপতি স্যর জন্‌ বাড্‌ফিয়ার সভার পরবর্তী অধিবেশনে

শোকসহকারে বিবৃত করেন। তাঁহার উক্তি উক্ত সভার কার্য-বিবরণীতে মুদ্রিত আছে, বাহুল্যভয়ে উহা এস্থানে উদ্ধৃত হইল না।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক প্রসিদ্ধ রাজনীতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। শম্ভুনাথ উহার সভ্য এবং প্রথম কয়েক বৎসর উহার কার্য-নির্বাহিকা-সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

জুনিয়ার গভর্নমেণ্ট প্লীডার

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মার্চ শম্ভুনাথ জুনিয়র গভর্নমেণ্ট প্লীডার নিযুক্ত হন। তিনি এই পদ প্রার্থনা করেন নাই, কিন্তু মিষ্টার জে আর কলভিন (পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্নর) তাঁহার সাধুতা, আইনের জ্ঞান এবং বাগ্মিতায় এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে শম্ভুনাথকে এই কার্যের সর্বাপেক্ষা যোগ্য বিবেচনা করিয়া এই পদে নিযুক্ত করেন।

এই পদে নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই একটি প্রসিদ্ধ মোকদ্দমা পরিচালনের জন্য শম্ভুনাথকে মুর্শিদাবাদে যাইতে হয়।

মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিম ফেরাদুন জার প্রাসাদ হইতে কতকগুলি জহরত চুরি যায়। নাজিমের কয়েকজন কর্মচারি অপহরণকারীদিগকে ধৃত করিয়া এরূপ প্রহার করে যে তাহারা প্রাণত্যাগ করে। নবাব নাজিমের প্রধান খোজা আমান আলি খাঁ বাহাদুর এবং অপর কয়েকজন খোজা ধৃত হইয়া বিচারার্থ আনীত হয়। আসামী পক্ষে বিখ্যাত ব্যারিস্টার ক্লার্ক এবং মণ্ট্রিউ ছিলেন, গভর্নমেণ্ট পক্ষে মিস্টার ট্রেভর ও শম্ভুনাথ ছিলেন। শম্ভুনাথের প্রচুর আইনজ্ঞান ও পক্ষপাতহীন আচরণ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ব্যবহার শাস্ত্রের অধ্যাপনা

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে থিওবোল্ড নামক একজন বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার আইন-অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অল্প দিন পরেই স্বাস্থ্য প্রতিলাভার্থ ইংলণ্ডে গমন করিলে তৎস্থলে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগের প্রশ্ন উঠে। শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ১১ জানুয়ারী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ তারিখ সম্বলিত এক পত্রে শম্ভুনাথকে উক্ত পদ স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন ঃ—

শিক্ষাপরিষদের আদেশক্রমে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে প্রেসিডেন্সী কলেজের নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে একজন ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপকের প্রয়োজন হইবে। এই অধ্যাপকের রেগুলেশন আইন এবং মফঃস্বলস্থ বিচারালয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ সম্মানজনক ও উচ্চপদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করিতে অগ্রসর হইয়া পরিষৎ দেখিতেছেন যে আপনার অপেক্ষা যোগ্যতর কোন ব্যক্তিকে তাঁহারা উক্ত পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিতে পারেন না, যদি অবশ্য আপনি ঐ পদগ্রহণ করিতে স্বীকার করেন।

শিক্ষা-পরিষদের কেবল সুপারিশ করিবারই ক্ষমতা আছে, নিয়োগের ক্ষমতা নাই। অতএব প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-অধ্যাপকের পদের জন্য আপনাকে মনোনীত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

শম্ভুনাথ এই পদ গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করিলে ৪০০্ টাকা মাসিক বেতনে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি দুই বৎসর কাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তন্মধ্যে তিনি তাঁহার আইন বিষয়ক বক্তৃতাগুলির কিছু কিছু মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই বক্তৃতাগুলি তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

হিন্দু পেট্রিয়ট-এর লেখক

এই সময় হইতে শম্ভুনাথ গিরিশচন্দ্র ও পরে হরিশচন্দ্র সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে' আইনসংক্রান্ত সন্দর্ভাদি প্রকাশিত করিতে থাকেন। তাঁহার রচনাগুলি আইনজ্ঞানের গভীরতা ও প্রকাশভঙ্গির সরলতার জন্য সুধিসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল।

প্রধান সরকারী উকিল

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র গভর্নমেন্ট প্লিডার রায় রমাপ্রসাদ রায় বাহাদুর পীড়িত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং শম্ভুনাথ তৎস্থলে অভিষিক্ত হন। কিন্তু বেশীদিন তাঁহাকে এই পদে থাকিতে হয় নাই, শীঘ্রই উচ্চতর পদ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি

পূর্বে এদেশে সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট নামক দুইটি সর্বপ্রধান বিচারালয় ছিল। সদর আদালত বা "কোম্পানি"র আদালতে মফঃস্বল আদালতের মোকদ্দমার আপিল শুনা হইত। এই আদালতের বিচারপতিদিগের পক্ষে দেশের আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে

বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন বলিয়া জিলার বিচারকগণের মধ্য হইতে ইঁহারা নির্বাচিত হইতেন। সুপ্রিমকোর্টের বা মহারাজ্ঞীর আদালতের বিচারপতিগণ বিলাত হইতে আসিতেন। এই দুই আদালতের বিচারপতিগণের মধ্যে অনেক সময়ে মতানৈক্য ও মনোমালিন্য ঘটিত। কিছুকাল হইতে উভয় বিচারালয় সম্মিলিত করিয়া একটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত করিবার জল্পনা চলিতেছিল। অবশেষে প্রস্তাবিত বিচারালয়ের নিয়মাদির এক খস্‌ড়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং-এর নিকট প্রেরিত হয়। উহাতে দেশীয় ব্যক্তিগণকে বিচারপতিরূপে নিযুক্ত করিবার কোনও কথা ছিল না। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্রে ইংরাজ ও দেশীয়গণের তুল্য অধিকার ঘোষিত হইয়াছিল। উহার উপর নির্ভর করিয়া হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন পার্লিয়ামেন্টের নিকট দেশীয় বিচারপতি নিয়োগের নিয়ম প্রবর্তিত করিবার জন্য আবেদন করেন। লর্ড ক্যানিং-ও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে সুশিক্ষিত দেশীয় বিচারপতিগণ হাইকোর্টে ইংরাজ বিচারপতিগণের পার্শ্বে উপবেশন করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য। ফলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট স্থাপিত হইবামাত্র একজন দেশীয় ব্যক্তি—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়—মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, যখন নিয়োগপত্র আসিল, তখন রমাপ্রসাদ মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি এখন উচ্চতর বিচারালয়ের সম্মুখে যাইতেছি। নিয়োগপত্র লইয়া আমি কি করিব?" রমাপ্রসাদের মৃত্যুতে দেশবাসীর মনে সংশয় উপস্থিত হইল, হয়ত দেশের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে দেশবাসী আর বিচারপতির আসন অধিকার করিতে পাইবে না। কিন্তু হাইকোর্টের প্রথম ও প্রধান বিচারপতি ন্যায়নিষ্ঠ স্যর বার্নস্ পিকক শম্ভুনাথের প্রতিভায় ও ন্যায়পরতায় বিমুগ্ধ ছিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে রমাপ্রসাদের স্থানে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। শম্ভুনাথ এই পদ গ্রহণে একটু ইতস্তত করিয়াছিলেন, কারণ ওকালতিতে এই সময়ে তাঁহার মাসিক আয় দশ সহস্র মুদ্রার কম ছিল না। কিন্তু বাঙলা গভর্নমেন্টের তদানীন্তন সেক্রেটারি স্যর অ্যাশলি ইডেনের পরামর্শে, এবং দেশবাসীর এবম্প্রকার উচ্চপদ প্রাপ্তির পথ সুগম করিবার জন্য তিনি এই পদ গ্রহণে স্বীকার করিলেন। ধর্মপ্রাণ রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন যথাসময়ে তাঁহার নিয়োগ সমর্থন করিলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বর ভারতবর্ষের তদানীন্তন সেক্রেটারি অব স্টেট স্যর চার্লস উড নিম্নোদ্ধৃত পত্রসহ মহারাজ্ঞীর নিয়োগপত্র পাঠাইয়া দেন।

ইণ্ডিয়া অফিস, ১৮ নভেম্বর ১৮৬২

মহাশয়,

আমি মহারাজ্ঞীর নিকট অতীব আনন্দ সহকারে আপনাকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আপনি যেরূপ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাহাতে আপনি উক্ত পদের সম্পূর্ণ যোগ্য এইরূপ ধারণা আছে, এবং ইহা অত্যন্ত সন্তোষের বিষয় যে তাঁহার দেশের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে আমি একজন ভারতবাসীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইলাম যিনি তাঁহার কর্তব্যকর্ম যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার সহিত সম্পাদিত করিবেন আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

আপনার অনুগত ভৃত্য—
চার্লস উড।

শম্ভুনাথের নিয়োগে সকলেই সবিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রবীণতর উকীলদিগের মধ্য হইতে কাহাকেও নির্বাচিত না করিয়া ৪২ বৎসর বয়স্ক শম্ভুনাথকে বিচারপতিপদে বরণ করায় সাধারণ দেশবাসী ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, কোনও "ভারতহিতৈষী" ইঙ্গ-ভারতীয়-সংবাদপত্র-সম্পাদক এইরূপ প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। হাইকোর্টের অন্যতম সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার ভবনে একটি মহাভোজ দিয়াছিলেন এবং তথায় কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ উকীলগণ আন্তরিক আনন্দের সহিত শম্ভুনাথকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। কারণ শম্ভুনাথ প্রতিভায় যেমন সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার সৌজন্যে, শিষ্টাচারে, ও বিনয়নম্র আচরণে তাঁহার বন্ধুগণের সমধিক প্রীতিও আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

সুরাপান-নিবারণী সভা

হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি যে ন্যায়পরতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, বিশেষজ্ঞগণ তাহার উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে তাহার পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। বিচারপতির শ্রমসাধ্য কার্যের উপর শম্ভুনাথ দেশবাসীর উন্নতির জন্য নানা প্রকার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন এবং কত অনাথ বালক ও দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে রীতিমত সাহায্য পাইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'বাঙলার আর্নল্ড' শিক্ষক-কুলতিলক প্যারীচরণ সরকার মহোদয়, রেভারেণ্ড সি-এইচ-এড্‌ল, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সহযোগিতায় সুরাপান নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। শম্ভুনাথ উহার কার্য-নির্বাহিকা-সমিতির একজন উৎসাহশীল সদস্য ছিলেন এবং

উক্ত সভার কার্য-বিবরণীতে তাঁহার সুচিন্তিত মন্তব্যাদি লিপিবদ্ধ দেখা যায়। সেখানে অধিকাংশ শিক্ষিত 'বড়লোকের' মধ্যে পানদোষ অতি প্রবল ছিল। শম্ভুনাথের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ব্যক্তিগণ দেশবাসীর সমক্ষে এক উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

বাঙালি ব্যারিস্টারদিগের অধিকার প্রদান

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রথমে মনোমোহন ঘোষ ও পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিস্টার হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারাই প্রথম বাঙালি ব্যারিস্টার নহেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র 'খৃষ্টান ব্রাহ্মণ' জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর সর্বপ্রথম ব্যারিস্টার হইয়া আসেন, কিন্তু তিনি কখনও এদেশে ব্যারিস্টারি করেন নাই। 'চাপকান-পরিহিত' ব্যারিস্টার মনোমোহন ও মাইকেল মধুসূদন উভয়েই এখানে ব্যারিস্টারি করিতে আসিয়া প্রথমে বাধা পাইয়াছিলেন। প্রধানত শম্ভুনাথের সাহায্যে ইঁহারা ইঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করিতে পাইয়াছিলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় তদীয় "মধু-স্মৃতি"তে এই প্রসঙ্গে হাইকোর্টের যে সকল কাগজ-পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, কৌতূহলী পাঠকগণের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিলেই যথেষ্ট হইবে।

স্বর্গারোহণ

সুখ্যাতির সহিত প্রায় পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে বিচারপতির পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিয়া শম্ভুনাথ অবশেষে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সামান্য জ্বর ও একটি বিস্ফোটক হইল। পরে উহা দুরারোগ্য কার্বাঙ্কলে পরিণত হইল। সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ তাঁহাদিগের যথাসাধ্য করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৫ জুন তিনি বুঝিলেন, অন্তিমকাল আগতপ্রায়, তিনি তাঁহার উইল বা চরমপত্র প্রস্তুত করাইলেন। রাত্রিকালে স্ত্রী পুত্রগণকে শয্যাপার্শ্বে আনাইয়া ব্রহ্মোপাসনা করত শ্রীভগবানের হস্তে পরিবারের ভার অর্পণ করিয়া শান্তচিত্তে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ওঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে বৃহস্পতিবার ৬ জুন ১৮৬৭ (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪ বঙ্গাব্দ) প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকার সময় তিনি সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিলেন।

শোকপ্রকাশ

শম্ভুনাথের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স শোকে অভিভূত হন এবং সরকারী গেজেটে শোকসূচক ব্ল্যাক বর্ডারসহ নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় :

১৪ জুন ১৮৬৭

'সপার্ষদ গভর্নর জেনারেল ফোর্ট উইলিয়ামে অবস্থিত মহারাজ্ঞীর প্রধানতম ধর্মাধিকরণের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু-সংবাদ আন্তরিক শোকের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন।

এই সংবাদ প্রেরণকালে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহাশয় লিখিয়াছেন "বিচারপতি শম্ভুনাথের কার্য স্মরণ করিলে বলা যাইতে পারে যে হাইকোর্টে ভারতবাসী নিয়োগ সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় ভারতবাসী সাফল্য লাভ করিয়াছে। ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহার অনন্যসাধারণ জ্ঞান ছিল এবং দেশবাসীদিগের সহিত তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় ছিল। আমি সর্বদাই তাঁহার ন্যায়পরতা সাধুতা ও স্বাধীনচিত্ততা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি এবং আমার বিশ্বাস তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহাকে সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন।"

মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের উপরিধৃত মন্তব্যের সহিত সপার্ষদ গভর্নর জেনারেল বাহাদুর সম্পূর্ণ একমত এবং দেশের সর্বপ্রধান ধর্মাধিকরণে একজন দেশবাসীকে নিয়োগ করিবার পরীক্ষা ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে যেরূপ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সপার্ষদ গভর্নর জেনারেল তাঁহাদের অভিমত সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন

বাস্তবিক বিচারপতিপদে শম্ভুনাথের সাফল্য ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্ভবপর করিয়াছিল এবং বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, সারদাচরণ মিত্র, স্যর বিপিনবিহারী ঘোষ, স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বহু বাঙালির প্রতিভালোকে উক্ত ধর্মাধিকরণ জ্যোতির্ময় হইয়াছে ও হইতেছে।

তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র দেশব্যাপী হাহাকার উঠিল সেই দিনই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যর বার্ণস পিকক এডভোকেট জেনারেলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

> এই বিচারালয়ের অন্যতম সুবিজ্ঞ বিচারপতি, জাষ্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃতু-সংবাদ ব্যবহারজীবীসম্প্রদায় ও সাধারণের নিকট ঘোষণা করা আজ আমার শোকাবহ কর্তব্য। অদ্য প্রাতে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি প্রথম— বলিতে গেলে একমাত্র— ভারতবাসী যিনি হাইকোর্টে বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমার নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে আমাকে যথার্থ বলিতে হইবে এবং বোধ হয় ইঁহাতে কেবল

আমার নহে, আমার সুপণ্ডিত সহযোগীগণের মত ব্যক্ত করা হইতেছে যে জাষ্টিস শম্ভুনাথের তিরোধানে আমরা একজন অমূল্য বহুগুণান্বিত বন্ধু ও সহকর্মী হারাইয়াছি এবং জনসাধারণ ও এই বিচারালয় একজন ন্যায়পরায়ণ সুপণ্ডিত ও স্বাধীনচেতা বিচারপতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

আপিল বিভাগেও বিচারপতি জ্যাকসন শম্ভুনাথের মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশ করিয়া বলেন, "অদ্যকার কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, যিনি ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব প্রথমে মহারাজ্ঞী কর্তৃক এই ধর্মাধিকরণে বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু-সংবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের পরলোকগত সহযোগীর সহিত এই বিচারালয়ের ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে অনেকেরই আমাদের অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘকালের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অত্যন্ত সত্য এবং আমার বিশ্বাস এই বিচারালয়ের অন্যান্য বিভাগেও আমার সহযোগীরা ইহার সমর্থন করিবেন যে, আমরা একজন বহু গুণান্বিত মহামান্য সহযোগী ও বন্ধু হইতে বঞ্চিত হইয়াছি এবং সাধারণ একজন ন্যায়বান সুপণ্ডিত সুদক্ষ এবং সত্যনিষ্ঠ বিচারপতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। যখন এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে একজনকে এই বিচারালয়ের বিচারপতির পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের যোগ্যতা, সাধুতা ও বহুদর্শিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহ তাঁহাকেই তখন ঐ পদের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল। তাঁহার নিয়োগের পর তাঁহার সরলতা, সহৃদয়তা ও সৌজন্যের গুণে তিনি যেমন তাঁহার সহযোগীগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, সেইরূপ ঐ সকল গুণে তাঁহার অন্যবিধ যোগ্যতা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল।"

অন্যান্য বিভাগের বিচারপতিগণ, জাষ্টিস লক, কেম্প, বেলি, এবং সীটনকার ঐ মর্মে শোকপ্রকাশ করিয়া আদালত বন্ধ করেন। জাষ্টিস বেলি বক্তৃতাকালে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

আদালত বন্ধ হইবার পর হাইকোর্টের উকিল, মোক্তার এবং শম্ভুনাথের প্রতিভানুরাগী ভক্ত ও বন্ধুগণ সিনিয়ার গভর্নমেণ্ট প্লীডার কৃষ্ণকিশোর ঘোষের নেতৃত্বে শবানুগমন করেন।

স্মৃতিরক্ষা

শম্ভুনাথের অসংখ্য বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্থাপনার্থ একটি প্রকাশ্য সভারও আয়োজন করেন। ২২ জুলাই (১৮৬৭) আপিল আদালত গৃহে একটি বিরাট শোকসভার অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি লক এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় অন্যান্য যোগ্যতর ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও

তাঁহাকে ঐ পদে বৃত হইবার কারণ নির্দেশ করিয়া বলেন যে তিনি সদর কোর্টের (এক্ষণে হাইকোর্ট) প্রাচীনতম বিচারপতি এবং শম্ভুনাথকে উক্ত আদালতে উকিল অবস্থাতে দেখিয়াছেন এবং তখন হইতে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত নবাব নাজিমের কতিপয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে উকিল নিযুক্ত হইয়া শম্ভুনাথ বহরমপুরে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হন এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি সদর কোর্টের বিচারপতি হইয়া আসেন, তখন শম্ভুনাথকে প্রত্যহ দেখিয়াছেন এবং দিন দিন তাঁহার শ্রদ্ধা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। তিনি উৎসাহশীল এবং পরিশ্রমী ছিলেন এবং সত্যনির্ণয়ের জন্য তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করিতেন এবং প্রকৃত তথ্য সযত্নে বিচারপতির গোচরে আনিতেন। বিচারপতিরূপে তিনি এইরূপ অধ্যবসায়, সাধুতা ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অতঃপর তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক (মহারাজ স্যর্) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ও বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ডব্লিউ এ-মণ্ট্রিউ মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত দুইটি শোকসূচক ও সহানুভূতিপূর্ণ পত্র পাঠ করেন।

ইহার পর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার ডয়েন এক দীর্ঘ ওজস্বিনী বক্তৃতায় শম্ভুনাথের গুণকীর্তন করিয়া প্রথমে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে স্বর্গীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের বিবিধ সদ্‌গুণাবলী স্মৃতিপটে চিরদেদীপ্যমান রাখিবার জন্য একটি সাধারণ স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপিত হউক ও চাঁদা সংগৃহীত হউক। বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইবা মাত্র মৃত বিচারপতির একটি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইয়া বিচারালয়ে স্থাপনের জন্য গভর্নমেণ্টকে প্রদান করা হউক। অনুকূলচন্দ্র সুদীর্ঘ বক্তৃতায় মৃত বন্ধুর প্রশংসা কীর্তন করেন এবং বলেন যে যদিও তিনি সরকারী উকিলরূপে আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন তথাপি তিনি "আসামীর উকীল" বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কারণ কোথাও কিছু সন্দেহের অবকাশ থাকিলে তিনি তাহা পরিষ্কারভাবে বিচারপতিকে দেখাইয়া দিতেন এবং সন্দেহজনক বলিয়া আসামীকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহা বিচারপতিকে বিবেচনা করিতে স্পষ্ট ভাষায় অনুরোধ করিতেন। আসামীর উকীল তাঁহার বন্ধু ও নিরপেক্ষ ব্যবহারে সর্বদাই বিস্মিত হইতেন।

মৌলবী (পরে নবাব বাহাদুর) আবদুল লতিফ খাঁ এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন যে শম্ভুনাথ মুসলমানদিগের জীবনযাত্রা প্রণালী ও আচার-ব্যবহারাদি উত্তমরূপে জানিতেন এবং যেরূপ সমপক্ষপাতিত্ব সহকারে তিনি বিচার করিতেন তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস ও প্রকৃষ্টরূপে শ্রদ্ধা করিতেন।

বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতায় শম্ভুনাথের বিবিধ গুণগ্রামের সুখ্যাতি করিয়া তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে চিত্র প্রতিষ্ঠাদির ব্যয়ভার

বহন করিয়া স্মৃতি-ভাণ্ডারে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে তাহা কোনও জনহিতকর উদ্দেশ্যে স্বর্গীয় বিচারপতির নামে উৎসৃষ্ট হইবে। যে স্মৃতি-রক্ষা সমিতি গঠিত হইতেছে সেই সমিতি স্থির করিবেন কিরূপে উহা ব্যয়িত হইবে। বাবু মহেন্দ্রলাল সোম এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন, তিনি শম্ভুনাথের ছাত্র ছিলেন এবং তিনি বিস্মিত হইতেন যে ব্যবহারাজীবের পরিশ্রমসাধ্য কার্য করিয়া শম্ভুনাথ কিরূপে ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি অধ্যাপক হিসাবে যে বেতন পাইতেন তাহার অধিক অর্থ তিনি ছাত্রদিগের জন্য বক্তৃতা-মুদ্রণ ও বিতরণাদি দ্বারা ব্যয় করিতেন। অতঃপর আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে সদস্যসংখ্যা বর্ধিত করিবার ক্ষমতাযুক্ত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটি স্মৃতিরক্ষণ সমিতি গঠিত হউক :

মাননীয় বিচারপতি এইচ-ভি-বেলি, মাননীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল, মুন্সী আমীর আলি খাঁ বাহাদুর, বাবু দিগম্বর মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক, বাবু ভোলানাথ মল্লিক, বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ, মিষ্টার মানকজী রুস্তমজী। মিষ্টার আর, টি এ্যাল্যান ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈতনিক সম্পাদক। মিষ্টার আর টি অ্যালান এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

এই স্মৃতি-সমিতির চেষ্টায় হাইকোর্টে শম্ভুনাথের একটি সুন্দর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালও তাঁহার স্মৃতি কলিকাতাবাসীর মনে জাগরূক রহিয়াছে। শম্ভুনাথের পুত্র প্রাণনাথও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে এম-এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হাইকোর্টের উকিল হইয়াছিলেন। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৃত্তিভোগী আইন-অধ্যাপক রূপে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় যে সকল সারগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং জাতীয় মহাসভায় উৎসাহশীল কর্মীরূপে যে কার্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মৃতি বহুকাল উজ্জ্বল রাখিবে। অকালে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে ইনি যে পিতার ন্যায় যশস্বী হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

চরিত্র ও ধর্মবিশ্বাস

শম্ভুনাথ সরল, অমায়িক, মিষ্টভাষী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁহার অতিথিবাৎসল্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বন্ধুগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে আহার করাইতে ভালবাসিতেন। শৈশবের বন্ধুগণ, যে অবস্থাতেই তাঁহারা থাকুন না, শম্ভুনাথের অকৃত্রিম প্রীতি হইতে কখনও বঞ্চিত হন নাই। তিনি প্রতি বৎসর সকল বন্ধুকে নিমন্ত্রণ

করিয়া আহার করাইতেন। গিরিশচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন যে তাঁহার সহপাঠীগণকে কিরূপে অন্বেষণ করিয়া আনিয়া একত্র সম্মিলিত করিতেন তাহা ভাবিলে সময়ে সময়ে সন্দেহ হইত যে তিনি বুঝি স্কুলের পুরাতন 'হাজিরি কেতাব' খানি চুরি করিয়া রাখিয়াছেন। শম্ভুনাথ দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার আয়ের অধিকাংশ পরোপকারে ব্যয়িত হইত।

মৎস্যাহরণে শম্ভুনাথের বিশেষ আনন্দ ছিল। তিনি অবসর পাইলেই মৎস্যাহরণে যাইতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি পুষ্করিণীসমন্বিত উদ্যান ক্রয় করিয়াছিলেন। ভ্রমণেও তিনি আনন্দ বোধ করিতেন। তিনি প্রায় প্রতি বৎসরেই দীর্ঘ অবকাশের সময় লক্ষ্ণৌ নগরীতে মাতুলকে দেখিতে যাইতেন।

শম্ভুনাথ একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং পূর্বেই উক্ত হইয়াছে কিছুকাল ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় আচার ব্যবহারাদি বর্জনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

দেশহিতকর সকল সৎকার্যে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। পরোপকার তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীর প্রদেশবাসী হইলেও শম্ভুনাথের জন্মস্থান কলিকাতায়, তাঁহার প্রতিভার লীলাক্ষেত্র বাঙলায়। তিনি বাঙলার অধিবাসী ছিলেন, সর্ব বিষয়ে বাঙালি ছিলেন এবং মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের উদার ঘোষণা-পত্রানুসারে অত্যুচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারতবাসীর যোগ্যতা তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণিত করিয়াছিলেন, এজন্য বঙ্গবাসী চিরদিন গর্ব অনুভব করিবে এবং বাঙালির স্মৃতিপটে তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি চিরদিন অপরিম্লান থাকিবে।

লালবিহারী দে

আচার্য লালবিহারী দে

উপক্রমণিকা

আলেকজাণ্ডার ডফ্ প্রভৃতি প্রথিতনামা খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণের প্রাণপণ প্রযত্ন ও প্রচেষ্টায় যে সকল বঙ্গসন্তান হিন্দুসমাজের শান্তিময় ক্রোড় হইতে চিরবিচ্যুত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও গভীর স্বদেশানুরাগের জন্য বাঙালির শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র এবং চিরস্মরণীয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল ব্যক্তি স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক "ভয়াবহ পরধর্ম" অবলম্বন করেন, তাঁহারা ধর্মান্তর পরিগ্রহের সহিত স্বদেশ ও স্বজাতির সহিত সম্বন্ধও পরিত্যাগ করেন। প্রিয়তম পরিজনগণ, শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্‌বর্গ ও হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দলের প্রীতি, স্নেহ ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া, সমাজের নিকট হইতে বহুবিধ নিগ্রহ ভোগ করিয়া, তাঁহারা কালাপাহাড়ের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির উপর প্রতিহিংসা গ্রহণে সমুৎসুক হন। বিশেষতঃ আমাদিগের এই হিন্দুর দেশে, যে দেশে ধর্মের জন্য স্নেহময় পিতা প্রিয়তম পুত্রের সহিত, প্রেমময়ী ভার্যা জীবনসর্বস্ব স্বামীর সহিত, প্রীতিসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে কুণ্ঠিত নহেন—সেই দেশে, ধর্মান্তরপরিগ্রহীতাকে কি প্রকার মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই সকল দুর্লভ স্নেহ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, স্বজাতীয় সমাজকর্তৃক নিগৃহীত হইয়াও, স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতিকল্পে যাঁহারা যত্নবান হন তাঁহারা দেশবাসীর প্রীতি ও সহানুভূতি হইতে একেবারে বঞ্চিত হন না। এইজন্যই যে সকল বঙ্গসন্তান বিদেশীয় ধর্ম গ্রহণ করিলেও স্বদেশের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, বিদেশীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াও স্বজাতিকে ভুলিতে পারেন নাই, তাঁহারা প্রথমে হিন্দুসমাজ কর্তৃক নিগৃহীত হইলেও শেষে বঙ্গ দেশীয় জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যিনি দেশোন্নতিবিষয়ক সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন, যাঁহার সংস্কৃতাদি সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁহার সমসাময়িকগণের শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিত, যিনি আবর্জনাপূর্ণ বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতীচ্যবিদ্যার 'কল্পদ্রুম' রোপণ করিয়াছিলেন, সেই স্বদেশহিতচিকীর্ষু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিন বঙ্গবাসীর বন্দনীয় থাকিবেন। সুদূর ইংলণ্ডে অবস্থান কালেও জন্মভূমির

কপোতাক্ষ নদের কথা সতত যাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত, ইংরাজী সাহিত্যসম্পদ সম্ভারের সন্ধান পাইয়াও যাঁহার দৃষ্টি বঙ্গভাণ্ডারের 'বিবিধ রত্নে'র প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং "কালে,—মাতৃভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে" আবিষ্কার করিতে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছিল, বিদেশীয় ধর্মগ্রহণ করিলেও বঙ্গবাণীর সেই বরপুত্র মধুসূদনের স্মৃতি চিরদিন "যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে।" যাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ ও দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে আগ্রহপূর্ণ চেষ্টা তাঁহার জীবনের প্রতি অঙ্কে পবিদৃষ্ট হইত, বাঙলার সেই অনন্যসাধারণ বাগ্মী, সরলতার প্রতিমূর্তি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিও বহুদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে সমুজ্জ্বল থাকিবে। প্রগাঢ় সাহিত্যপ্রেম ও অক্লান্ত সাহিত্যসেবা রামবাগানের খৃষ্টান দত্তপরিবারকেও বঙ্গবাসীর স্মৃতিপট হইতে অপসৃত হইতে দিবে না। বিশেষতঃ, স্যার এডমণ্ড গস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ যাঁহাদিগের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুক্তকণ্ঠে উচ্চপ্রশংসাবাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন, সেই "কলারাজ্যে দুটি রাণী, প্রতিভার বুঝি যমক কন্যা রমা আর বীণাপাণি"—কুমারী তরু ও অরুর নাম বঙ্গবাসী চিরদিন গৌরব মিশ্রিত আনন্দ ও অপূর্ণ আশার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সহিত স্মরণ করিবেন। যে প্রতিভাশালী বাঙালির জীবন-কথা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, সেই চির-দরিদ্র বাঙালি কৃষকের সমবেদনা-উচ্ছ্বসিত-জীবনেতিহাস-রচয়িতা, বাঙালি শিশুর শয়ন-মন্দির-মুখরিত বঙ্গলক্ষ্মীর স্নেহ-সিঞ্চিত অমৃতকথার সুনিপুণ লিপিকর, বাঙলা সাহিত্য সংস্কারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গসাহিত্যের সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক, বাঙলায় প্রতীচ্য শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী, মনীষীর বরপুত্র লালবিহারী দের স্মৃতিও চিরদিন বঙ্গবাসী কর্তৃক সসম্মানে পূজিত হইবে।

জন্ম

বর্ধমান জিলার অন্তর্গত তালপুর গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ ডিসেম্বর তারিখে লালবিহারী জন্মগ্রহণ করেন। আমাদিগের দেশে আত্মচরিত লিখনের রীতি প্রচলিত না থাকায় কাহারও বাল্যজীবনের ইতিহাস সঙ্কলন সচরাচর দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। লালবিহারীর জীবনী লেখক এ বিষয়ে সৌভাগ্যবান। কারণ তৎসম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগেজিন" পত্রিকায় প্রকাশিত "Recollections of my School Days" বা 'ছাত্রজীবনের স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে এবং তদ্বিরচিত "Recollections of Alexander Duff" বা 'ডফস্মৃতি' নামক গ্রন্থে, লালবিহারী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বর্ণনাশক্তির প্রয়োগে তাঁহার বাল্যজীবনের এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

লালবিহারীর পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন ; কলিকাতায় সামান্য দালালের কার্য করিয়া কোনও প্রকারে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার পরিবারবর্গ তালপুরেই

অবস্থান করিতেন। শারদীয়া পূজার সময়, বৎসরে একমাসের জন্য মাত্র লালবিহারীর পিতা পরিবারবর্গের সহিত সম্মিলিত হইতেন। তিনি মহা বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন—জন্মে কখনও মৎস্য মাংস আহার করেন নাই এবং প্রাতঃস্নানের পর প্রায় একঘণ্টাকাল তুলসীপূজা ও মালাজপ প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত করিতেন ও রাত্রিকালে প্রায় তিনঘণ্টাকাল মালা জপ করিতেন। অহোরাত্র তাঁহার মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইত।

প্রাথমিক শিক্ষা

যখন লালবিহারীর বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর তখন তাঁহার পিতা দেশে আসিয়া কিছু অধিককাল অবস্থান করেন। কারণ, তিনি তাঁহার পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে লালবিহারীর পিতা অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবতার আশীর্বাদ গ্রহণ না করিয়া কোনও বড় কাজ আরম্ভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করিবার পূর্বে জ্যোতিষিগণকর্তৃক নির্দিষ্ট শুভদিনে শুভক্ষণে পুরোহিত কর্তৃক বাগদেবী সরস্বতীর পূজার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। লালবিহারী নববস্ত্র পরিধান পূর্বক দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিলে পরদিন প্রাতে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের নিকট নীত হন। তালপাতা কলাপাতা প্রভৃতি যথানিয়মে শেষ করিয়া লালবিহারী ৪ বৎসরের মধ্যেই পাঠশালার সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া কাগজে লিখিতে শিখিলেন এবং শুভঙ্করীতেও যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

কলিকাতায় আগমন

লালবিহারী নয় বৎসরে পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার সহধর্মিণীকে প্রতি পত্রে লিখিতে লাগিলেন যে, লালবিহারীকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান না করিলে তিনি উচ্চপদ বা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না ; তিনি স্বয়ং ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত জীবনে উন্নতিলাভে অসমর্থ হইয়াছেন। লালবিহারীর মাতা লেখাপড়া না জানিলেও লালবিহারীর পিতার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি স্নেহাধিক্যবশত পুত্রের বিদেশগমনে যথেষ্ট আপত্তি করেন। অবশেষে সাধ্বী হিন্দুরমণীর ন্যায় তাঁহাকে স্বামীর মতেই সম্মতি প্রদান করিতে হইল। পুরোহিত

ও জ্যোতিষীকে আহ্বান করা হইল। লালবিহারীর কোষ্ঠি বিচার করিয়া শুভদিন শুভক্ষণ নিরূপিত হইল। জ্যোতিষী লালবিহারীর জননীকে কহিলেন, "মা, এই দিন অত্যন্ত শুভ, এরূপ শুভদিন আমি পূর্বে কখনও গণনা করি নাই। আপনার পুত্র অত্যন্ত বিদ্বান ও ধনবান হইবেন।" লালবিহারী লিখিয়াছেন তাঁহার যাত্রার পূর্বদিন তাঁহার স্নেহশীলা জননী অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন, রজনীতে এক মুহূর্তও নয়ন মুদিত করেন নাই, শতবার নিদ্রিত সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া ছিলেন। যথাসময়ে পুরোহিত কর্তৃক যাত্রাকালীন অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইলে লালবিহারী গৃহদেবতা মদনমোহনকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন।

তৃতীয় দিনে লালবিহারী কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তিনি পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

ইংরাজী শিক্ষা

ডফ্ সাহেবের স্কুল। তৎকালে কলিকাতায় চারিটি প্রধান ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল.— হিন্দুকলেজ, জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসন, স্কুল সোসাইটিজ্ স্কুল বা হেয়ার স্কুল এবং গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী। কোন্ বিদ্যালয়ে লালবিহারীকে প্রবিষ্ট করান হইবে তৎসম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হইতে তাঁহার পিতাকে অধিক চিন্তা করিতে হয় নাই। হিন্দুকলেজের ছাত্র দিগকে পাঁচ টাকা এবং ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর ছাত্রদিগকে তিন টাকা বেতন দিতে হইত। পুত্রের শিক্ষার জন্য মাসে তিন টাকাও ব্যয় করেন লালবিহারীর পিতার অবস্থা এত সচ্ছল ছিল না। পুত্রকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রবিষ্ট করাইবার পথেও একটি প্রতিবন্ধক ছিল। হেয়ার সাহেব বাছাই করিয়া ছাত্র লইতেন ; লালবিহারী নির্বাচিত হইবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। সুতরাং ডফ্ কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনেই লালবিহারীকে প্রবিষ্ট করান স্থির হইল। তখন "ফিরিঙ্গি কমল বসু"র বাটীতে সংস্থাপিত ডফ্ সাহেবের স্কুলে ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না এবং অধ্যাপনাও অতি সুন্দর হইত। ডফ্ সাহেব গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন, খৃষ্টধর্ম শিক্ষা দিবার নিমিতই তিনি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দুই বৎসরও হয় নাই ব্রাহ্মণসন্তান কৃষ্ণমোহনকে ডাক্তার ডফ্ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লালবিহারীকে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে প্রবিষ্ট করাইবার সময় তাঁহার পিতার বন্ধুগণ তাঁহাকে এই কার্য করিতে বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন। লালবিহারীর পিতা অধিকাংশ হিন্দুর ন্যায় অদৃষ্টবাদী ছিলেন, এবং উত্তরে বলেন, "যদি কালাগোপালের

(লালবিহারীর হিন্দুনাম) কপালে লেখা থাকে যে, সে খৃষ্টান হইবে না, ডফ্ সাহেবের সহস্র চেষ্টাও নিষ্ফল হইবে ; আর যদি ইহা লেখা থাকে যে, সে খৃষ্টান হইবে, তবে আমার সাধ্য কি তাহার অন্যথা করি?"

লালবিহারী দ্বাদশবর্ষকাল জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে অধ্যয়ন করেন। ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার ম্যাকে, ডাক্তার ইউয়ার্ট, মিষ্টার জন ম্যাকডোনাল্ড ও ডাক্তার টমাস স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের উপদেশে লালবিহারী যৎপরোনাস্তি উপকৃত হন। তিনি প্রায় সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন এবং শেষ তিন বৎসর সর্বশ্রেষ্ঠ সুবর্ণ পদক লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রজীবনের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বঙ্গদেশের সকল ছাত্রের অনুকরণীয়। দরিদ্র লালবিহারী প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি পর্যন্ত ক্রয় করিতে পারিতেন না। কোনকালে পাটীগণিত বা বীজগণিতের কোন পুস্তক তাঁহার ছিল না, তিনি বিদ্যালয়েই অঙ্ক শিক্ষা করিতেন। তাঁহার কোনও শিক্ষক কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে একখানি জ্যামিতি পুস্তক ধার দিয়াছিলেন। উচ্চগণিতের পুস্তকাদি লালবিহারী সহপাঠীদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া স্বহস্তে নকল করিয়া লইতেন। ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞান লাভের জন্য লালবিহারী একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কয়েক আনা পয়সা দিয়া তিনি এক ফিরিওয়ালার নিকট হইতে একখানি অসম্পূর্ণ ইংরাজী বাঙলা অভিধান ক্রয় করিয়াছিলেন। উহাতে আদ্যক্ষর "A" মোটেই ছিল না। এই অভিধানের সাহায্যে তিনি ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেন। এই পুস্তক-বিক্রেতার নিকট হইতে কয়েকটি পয়সা দিয়া তিনি হিউমের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসের একখণ্ড ক্রয় করেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তিনি আবার উহার পরিবর্তে বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখক এডিসনের 'স্পেক্টে র' একখণ্ড গ্রহণ করেন ও পরে সেখানি পাঠ করিয়া তৎপরিবর্তে আর একখানি পুস্তকের একখণ্ড গ্রহণ করেন। এইরূপে আর এক কপর্দকও ব্যয় না করিয়া একখানি পুস্তকের বিনিময়ে নূতন একখানি পুস্তক গ্রহণ ও তদ্বিনিময়ে অপর একখানি পুস্তক গ্রহণ, এইরূপ উপায়ে লালবিহারী ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের সহিত পরিচয় লাভ করেন। পুস্তকগুলি অসম্পূর্ণ হইলেও জ্ঞানপিপাসু লালবিহারী আগ্রহের সহিত সেগুলি পাঠ করিতেন। পুস্তক-বিক্রেতা বোধ হয় দরিদ্র বালকের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়াই এইরূপ পুস্তক বিনিময়ে সম্মত হইয়াছিল নতুবা সকল গ্রাহক লালবিহারীর মত হইলে তাহার জীবিকানির্বাহ অসম্ভব হইত।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লালবিহারীর পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং লালবিহারী তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতার আশ্রয়ে অতিকষ্টে কাল যাপন করিতে বাধ্য হন। হিন্দু কলেজে অনেকগুলি বহুমূল্য ছাত্রবৃত্তি প্রদত্ত হইত। হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইলে এবং এইরূপ একটি বৃত্তি পাইলে লালবিহারীর কোনও কষ্ট হইত না। কিন্তু হিন্দু কলেজের বেতন প্রদান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। হেয়ার স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ স্কুলের খরচে হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইতেন। লালবিহারী হেয়ার স্কুলে প্রবেশ লাভের জন্য সচেষ্ট হইলেন।

কিন্তু লালবিহারীর চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। খৃষ্টীয়ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের "বাইবেল পড়া ছেলে" হিন্দু ছাত্রগণকে নষ্ট করিবে এই আশঙ্কায় হেয়ার সাহেব লালবিহারীকে স্বীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতে দিলেন না। তখন হিন্দু বালকগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে হেয়ার সাহেব কিরূপ যত্ন লইতেন এই ব্যাপার হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পাছে হেয়ার স্কুলের কোনও ছাত্র খৃষ্টধর্মে অনুরক্ত হয় ও ফলে হিন্দুবালকগণের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে পরাঙ্মুখ হন সেই জন্য খৃষ্টান ডেভিড্ হেয়ারের এই অখৃষ্টানোচিত ব্যবহার যে তাঁহার মহত্ত্বের ও ভারতপ্রীতির কতদূর পরিচয় প্রদান করে তাহা আর বলা নিষ্প্রয়োজন। লালবিহারী হেয়ার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইল :

"মহাশয়, আমার ইচ্ছা আমি আপনার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি।"

"তুমি কোন্ বিদ্যালয়ে পড়?"

"আমি এক্ষণে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউসনে পড়িতেছি।"

"তুমি কি কি পুস্তক পড়িতেছ?"

"আমি মার্শম্যানের ইতিহাস, লেনীর ইংরাজী ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি (২য় খণ্ড), বাইবেল এবং বাঙলা পড়িতেছি।"

"তুমি জ্যামিতির সপ্তম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পার? বোর্ডে গিয়া বুঝাইয়া দাও দেখি?"

(লালবিহারী প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণ করিলে হেয়ার সাহেবের সহিত পুনরায় কথোপকথন হইল।)

"তুমি বেশ শিক্ষালাভ করিতেছ দেখিতেছি ; তুমি কেন জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউসন হইতে চলিয়া আসিতে চাহ?"

"লোকে বলে আপনার বিদ্যালয়ে আরও ভাল পড়া হয়, বিশেষত, আমি আপনার স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে যাইবার বাসনা করি।"

"জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউসনে নিশ্চয়ই খুব ভাল পড়া হয়, ডাক্তার ডফ মিষ্টার ক্যাম্বেল নামক একজন নূতন ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছেন।"

"জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউসনে ক্যাম্বেল নামে কেহ নাই, বোধ হয় আপনি মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ডের কথা বলিতেছেন?"

"হাঁ, হাঁ, মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড, সকলে বলে তিনি বেশ বিচক্ষণ লোক। আচ্ছা তুমি যে বিদ্যালয়ে পড়িতেছ সেইখানেই থাক।"

"না মহাশয় ; অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনার স্কুলে লউন।"

"তুমি বাইবেল পড়—তুমি অর্ধেক খৃষ্টান। তুমি কি আমার ছাত্রদিগকে নষ্ট করিবে?"

"আমাদিগের বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক বলিয়াই আমি বাইবেল পড়ি—বাইবেলের ধর্মে আমার বিশ্বাস নাই। আমি আপনার ছাত্রগণের ন্যায় হিন্দু—খৃষ্টান নহি।"

"মিস্টার ডফের সব ছাত্রই অর্ধেক খৃষ্টান। আমি তাহাদিগের কাহাকেও আমার স্কুলে লইব না। আমি তোমাকে লইব না—তুমি অর্ধেক খৃষ্টান—তুমি আমার ছেলেদের খারাপ করিবে।"

লালবিহারী অনেক অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। ডেভিড হেয়ারের এক উত্তর—"তুমি অর্ধেক খৃষ্টান,—তুমি আমার ছেলেদের খারাপ করিবে।"

অগত্যা লালবিহারীকে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউসনে পাঠ সমাপ্ত করিতে হইল।

খৃষ্টধর্ম গ্রহণ

ঊনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে লালবিহারী ডাক্তার ডফ কর্তৃক খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। লালবিহারী মধুসূদনের ন্যায় "সাহেব" সাজিবার জন্য খৃষ্টান হন নাই বা কৃষ্ণমোহনের ন্যায় হিন্দুসমাজ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেন নাই। ডাক্তার ডফ্ প্রভৃতির উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া, বাইবেলখানি সযত্নে পাঠ করিয়া, বাইবেলের ধর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসলাভ করিয়া লালবিহারী খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই হিন্দু লালবিহারী খৃষ্টধর্ম বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিদ্যালয়স্থ অন্যান্য সমস্ত ছাত্র অপেক্ষা স্বীয় খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রজ্ঞানের আধিক্য প্রতিপন্ন করিয়া দুইটি পুরস্কারও লাভ করিয়াছিলেন। লালবিহারীর হিন্দুধর্ম ত্যাগকালে তাঁহার স্নেহময়ী মাতৃদেবী জীবিতা ছিলেন। সুতরাং বিবেকানুযায়ী কার্য সম্পন্ন করিতে লালবিহারীকে কতদূর আত্মত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর গৃহে প্রত্যাগমনের কি করুণ চিত্রই তিনি স্বয়ং অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।—

"When I stood before the door of my own home, to me as familiar as the face of an old friend, instead of being greeted with rejoicings, I was welcomed with cries and tears. The report of my coming had gone forth before I reached the village, and the whole neighbourhood had come out to greet me. On every side nothing was seen or heard but lamentation, mourning and woe. Scenes like these—scenes created by causes little understood by foreigners on account of their connection with the inner texture of Hindu manners—occur to every native convert, and constitute, after all, his chief privation, and the influence of which is felt by him more than the loss of the wealth of Ormuz, India or the late discovered Eldorado of California."

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী মিষ্টার ডফের গির্জায় ক্যাটেকিস্ট নিযুক্ত হন ও পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ধর্মোপদেশকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কালনার গির্জায় পাদরী নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে ফ্রীচার্চের পাদরী নিযুক্ত হন। কালনায় অবস্থানকালে তাঁহার সাহিত্য-সেবার সুযোগ উপস্থিত হয়। খৃষ্টীয় ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদির আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। এই সকল বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি তাঁহার ধর্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিলেও সাহিত্যে স্থায়ী স্থানলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার একটি খৃষ্টধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ কিরূপে তাঁহার পারিবারিক জীবনের একটি প্রধান ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

বিবাহ

এতদ্দেশে খৃষ্টধর্ম-বিস্তার-বিষয়ক পুস্তকাদি দেখিয়া লালবিহারী গুজরাটনিবাসী পার্শী খৃষ্টান রেভারেণ্ড হরমাদজি পেষ্টনজি ও তাঁহার বিদুষী কন্যার নামের সহিত পরিচিত হন। পরে হরমাদজির সহিত লালবিহারীর ধর্মবিষয়ক পত্রব্যবহার আরম্ভ হয়। লালবিহারী তাঁহার খৃষ্টধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি হরমাদজিকে প্রেরণ করিতেন। কোনও পার্শী বন্ধুর মধ্যস্থতায় লালবিহারীর সহিত হরমাদজির কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত হয়। লালবিহারী হরমাদজির কন্যার বিবিধ গুণগ্রাম শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহের প্রস্তাবে কন্যার পিতার কোনও আপত্তি ছিল না। তিনি কন্যার সম্মতি লাভের জন্য লালবিহারীকে গুজরাটে আহ্বান করেন। অর্থাভাববশত লালবিহারী তৎকালে সেই দুর্গম প্রদেশে যাইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর পরে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া তিনি তথায় যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া হরমাদজির নিকট পত্র লেখেন। কিন্তু তখন সিপাহী বিদ্রোহের গোলমালে পত্রখানি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছায় নাই। এদিকে হরমাদজির নিকট হইতে পত্রের উত্তর না পাইয়া লালবিহারী স্থির করিলেন যে, ইতোমধ্যে তাঁহার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উভয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার বন্ধ হইল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী Searchings of the Heart নামে একটি ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রকাশিত করেন। কিছুকাল পরে উহার একখণ্ড হরমাদজিকে প্রেরণ করেন। হরমাদজি উহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া পত্র লিখেন এবং লালবিহারী এতদিন কেন তাঁহাকে পত্র লিখেন নাই তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। ক্রমে লালবিহারী জানিতে পারিলেন যে, পত্রের গোলমালে তিনি হারমাদজির সংবাদ পান নাই এবং তাঁহার বিদূষী কন্যা তখনও অবিবাহিতা আছেন। অতঃপর লালবিহারী কালবিলম্ব না করিয়া কুমারী হরমাদজ্জীর সহিত আলাপ করেন এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গুর্জর প্রদেশের অন্তর্গত গোগো নগরে তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। লালবিহারীর পত্নী সর্ববিষয়ে তাঁহার

যোগ্যা এবং পাতিব্রত্য ধর্মে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। স্বামীর সকল সৎকার্যে তিনি তাঁহার সাহায্যকারিণী ছিলেন।

অরুণোদয়

কালনায় অবস্থানকালে লালবিহারী 'অরুণোদয়' নামে একখানি বাঙলা মাসিক পত্রের প্রবর্তন করেন। তাঁহার সম্পাদকতায় উহা তৎকালে অল্প সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই।

ইংরাজী সাহিত্যের সেবা

ইংরাজী সাহিত্যের চর্চা ও সাহিত্যসেবার দিকে লালবিহারীর প্রথমাবধিই একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। অধুনা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব ও ইংরাজী সাহিত্যসেবা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে আপনাদিগের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু অনেকের মুখে এরূপ শুনা যায় যে, এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাতৃভাষার সেবা না করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের সেবা করিয়া বিষম ভুল করিয়াছিলেন। আমরা এরূপ মন্তব্যের সর্বতোভাবে সমর্থন করিতে অসমর্থ। বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ মাতৃভাষায় "সন্ন্যাসী" শব্দ লিখিতে বানান ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা হাসিতে পারি, কিন্তু জাতীয় জীবনের সেই যুগ-পরিবর্তন-কালে যাঁহার ওজস্বিনী ইংরাজী বক্তৃতা ও অকাট্যযুক্তিপূর্ণ ইংরাজী প্রবন্ধাদি রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ দৃঢ় করিয়াছিল, প্রজার অভাব ও অভিযোগ রাজার নিকট উপস্থাপিত করিয়া সে সকলের প্রতিকারের উপায় করিয়া দিয়াছিল, তাঁহার ইংরাজী সাহিত্যচর্চা কখনও নিন্দনীয় হইতে পারে না। 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান ফ্রেন্ড'-সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র, 'রেইস এণ্ড রায়ত'-সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজনীতিবিশারদ কৃষ্ণদাস পাল, সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীরা ইংরাজী ভাষাজ্ঞানের দ্বারা দেশের কত উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যাঁহারা তাহা অবগত আছেন তাঁহারা কখনও তাঁহাদিগের ইংরাজী সাহিত্য চর্চা নিষ্প্রয়োজন ছিল বলিবেন না। এখনও ইংরাজীতে অভিজ্ঞ জননায়ক না থাকিলে আমাদিগের চলে না। বাস্তবিক ইংরাজী আমাদিগের রাজভাষা বলিয়া উহার চর্চা আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

লালবিহারী অল্প বয়স হইতেই ইংরাজী প্রবন্ধাদি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

কলিকাতা রি

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে স্যর জন কে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সুবিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রের প্রবর্তন করেন। প্রথম ত্রিশ বৎসর কাল উহা যেরূপ অসাধারণ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল এদেশের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার সম্মিলনের উপর 'কলিকাতা রিভিউয়ের' প্রতিষ্ঠা। স্যর জন কে, ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্, স্যর হেনরি লরেন্স, কর্নেল ম্যালিসন প্রভৃতির সহিত 'কলিকাতা রিভিউ'-এর প্রবন্ধলেখক বলিয়া যে সকল শিক্ষিত বঙ্গবাসী উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভোলানাথ চন্দ্র এবং রামবাগানের দত্তগণ উল্লেখযোগ্য।

লালবিহারীর শিক্ষাগুরু রেভারেণ্ড ডাক্তার টমাস স্মিথের সম্পাদনকালেই লালবিহারী 'কলিকাতা রিভিউয়ের' নিয়মিত লেখক হন এবং ১৮৫১-২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। যথা—

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে—"চৈতন্য এবং বাঙলার বৈষ্ণবগণ।"
১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে—"বাঙালির ক্রীড়া কৌতুক।"
১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে—"বাঙালির পর্বদিন।"

চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে লালবিহারী লিখিয়াছেন :

> The system of Chaitanya is an important innovation on Hinduism. It is interesting to contemplate, as an index of the march of religious ideas. It contains the germs of certain religious truths. There is a tendency in it to universal diffusion. This is an important idea in religion. It was lost sight of by the ancient religionists of India. Like the esoteric and exoteric doctrines of the Greek philosophers, the Hindus had, and still have, one religion for the lettered few, and another for the ignorant many. The Gyan Kanda contains the theology of intellectual men, and the Karma Kanda that of the illiterate multitude. The transcendental theosophy of the priestly class is quite different from the mythical religion of the people. This want of a fellowship in religious interest between men of culture and the unthinking multitude is repudiated by Chaitanya. His system encourages no monopoly of religious knowledge, It places the same doctrines before learned and unlearned men. It has no mysteries into which all its votaries may not be initiated. Its simplicity is another important peculiarity. This, too is a move in the right direction. Unlike the metaphysical abstractions, refined subtleties, and hair-splitting distinctions of the Vedanta, all which pre-eminently unfit it to be the religion of a whole nation, the doctrines of Chaitanya are simple and level to the comprehension of the meanest

capacity. Unlike, too, the multitudinous rites and ceremonies prescribed in the Hindu rituals, it proclaims the omnipotence of one principle, and the vast efficacy of one religious duty. In insisting on Bhakti, as a Sine qua non of personal religions, it has made a faint approximation to faith, that prolific principle of the Christian revelation. It has brought out a new element in the natural history, so to speak, of religious feeling. In opposition to the cold, intellectual and abstract idea of religion, which the Vedanta proposes, and the totally external view, which the popular superstition gives of it, Chaitanya lays much stress on the affections and sensibilities as constituting a great part of religion. We say not that the aspect, in which the system under review regards religion, is not external; for that much of it is so in a very gross sense, will be evident from what we have already written. But yet it is delightful to observe that the heart, with its affections and feelings, has not been entirely thrown aside. We regard the system of Chaitanya as an interesting development of the religious consciousness of India. It is a sign of the times, and an index of the march of liberal ideas in religion.

বাঙালির 'ক্রীড়া কৌতুক' প্রবন্ধে বাঙালির বিবিধ প্রকার ক্রীড়াকৌতুকের মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

'বাঙালির পর্বদিন' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবিধ পর্বোৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রবন্ধের শেষভাগে লালবিহারী লিখিয়াছিলেন যে, যখন এই সকল উৎসবে নানা প্রকার কুৎসিত আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়, তখন এই সকল পর্বদিনে আফিসের ছুটি বন্ধ করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান অগ্রাহ্য করা সরকারের উচিত। কেরানিকুলের সৌভাগ্যক্রমে গভর্নমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।

বেথুনসভা

কেবল সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াই লালবিহারী যশস্বী হন নাই। তিনি তৎকালীন বহু সাহিত্যসভার সহিত প্রধান সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সকল সভার মধ্যে বেথুন সভার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ ডিসেম্বর তারিখে মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন সম্পাদক ডাক্তার এফ্ জে, মৌএট মহোদয়ের চেষ্টায় শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি চিরস্মরণীয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মরণার্থ এই সাহিত্যসভা সংস্থাপিত হয়। লালবিহারী এই সভার বহু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন। নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রবন্ধের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইল।

(১) Vernacular Education in Bengal (বঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা)—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পঠিত।

(২) English Education in Bengal (বঙ্গে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা)—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পঠিত।

(৩) Primary Education in Bengal (বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা)—১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর দিবসে পঠিত।

(৪) Teaching of English Literature in the Colleges of Bengal (বঙ্গদেশীয় কলেজ সমূহে ইংরাজী-সাহিত্য শিক্ষার প্রণালী) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৯ মার্চ পঠিত।

(৫) All about the Parsis (পার্শীদিগের বিবরণ)—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ মার্চ পঠিত।

(৬) The Rev. John Wilson পাদরী জন উইলসনের জীবন কথা—১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ ফেব্রুয়ারী দিবসে পঠিত।

এতদ্ব্যতীত ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বেথুন সভায় তৎকালীন সভাপতি ডাক্তার ডফের ভারতত্যাগ কালে সভার যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল লালবিহারী তাহাতেও যে সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক প্রবন্ধটি বেথুন সোসাইটির কার্য বিবরণীতে এবং পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি লালবিহারী দে সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগেজিন" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে !

সমাজ-বিজ্ঞান সভা

কুমারী মেরি কার্পেন্টারের প্রস্তাবানুসারে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় Bengal Social Science Association বা বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে লালবিহারী এই সভার সভ্য হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৯ জানুয়ারী দিবসে এই সভায় তিনি Compulsory Education in Bengal শীর্ষক একটি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাব করেন যে যেহেতু বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে দরিদ্র সন্তানগণের শিক্ষার তাদৃশ ব্যবস্থা নাই আমাদের উচিত গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা যে দেশের সর্বত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পিতামাতাকে তাহাদিগের পুত্রসন্তানগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হউক—

We have therefore, no other alternative than to have recourse to the system of compulsory education, and to request the Government to establish schools throughout the country and to compel every parent to send his male children to them for instruction. I say male children, for, unfortunately, so dense is the ignorance of the people that an order compelling every girl to be educated would meet with the most violent opposition. But it is some consolation to remember that, when all the boys of the country are educated, the education of girls will not be long delayed.

এই প্রবন্ধ পাঠের পর রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ, বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শ্যামাচরণ সরকার, মিস্টার মতিলাল মিত্র, ডাক্তার সূর্য গুডিব চক্রবর্তী, বাবু মহেন্দ্রলাল ঘোষ, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, মিস্টার এউচ উড্রো এবং মিস্টার ডব্লিউ এস এটকিন্সন বহুক্ষণ এই প্রবন্ধের আলোচনা করেন।

ইণ্ডিয়ান রিফর্মার

বোধ হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী Indian Reformer (ভারত সংস্কারক) নামক একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে সমাজ-সংস্কার বিষয়ক বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয় ইহা অধিক কাল স্থায়ী হন নাই।

'ফ্রাইডে রিভিউ।' ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লালবিহারীর 'Friday Review' নামে আর একখানি সংবাদপত্রের সৃষ্টি করেন। এই পত্রখানি দেশের তাদৃশ উপকার না করিলেও লালবিহারী সাংসারিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতির কারণ হইয়াছিল। সে কথা নিম্নে বলিতেছি।

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয় সেরূপ দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে অতি অল্পই হইয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে এই প্রদেশের অর্ধেক লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। বাঙলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর সিসিল বীডনের দীর্ঘসূত্রতার ফলেই এত প্রাণনাশ হইয়াছিল। দেশীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত বহু সংবাদপত্র বহুদিন হইতে এ বিষয়ে লাট বাহাদুরের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত "বেঙ্গলী" শত চেষ্টায়ও ছোটলাট বাহাদুরকে যথাসময়ে কর্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন নাই। দরিদ্র প্রজাগণের চিরবন্ধু পরদুখকাতর গিরিশচন্দ্র "বেঙ্গলী"তে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্যর সিসিলের কার্যের এইরূপ তীব্র সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন :

We certainly did not look and hope for large administrative measures from a man of Sir Cecil Beadon's stamp who, to say the most, is a thorough-bred secretary, but as we had our doubts whether a good secretary ever made a good administrator, we were not very sanguine in our expectations when his nomination to the post was first announced. As successor to Sir John Peter Grant, we felt assured that the administration of Sir Cecil Beadon would not, and possibly could not, be a very brilliant or successful one. Of this, however, we felt confident, that. successful or unsuccessful, he would at least strive to keep pace with the times, that in the midst of dangers and difficulties, he would at least show a semblance of earnestness to meet the evil boldly in the face, and that he would not altogether in such critical times, undeserve the confidence of the people as one possessed, if not of vast original resources, at least of that strength of mind, sincerity of purpose and common humanity which will carry him safely across the troubled waters. In this, too, we have been disappointed. Sir Cecil Beadon is not an original or a vigorous administrator and he never will be. He is a clever precis-writer and that is what we shall ever expect him to remain. When the famine will have done its work, when the whole country will have been strewed, with the dead bodies of starved men, women and children, when whole villages will have been depopulated, and entire races will have become extinct, then and not till then will the powers of Sir Cecil Beadon for harrowing narratives and graphic sketches be called into play. In our issue of the 21st ultimo we pointed out that there are now in Calcutta no less than thirty thousand houseless strangers who wander about in the streets, mothers leaving their infants by the wayside to perish and to be eaten by dogs and jackals, husbands forsaking their dying wives and leaving them to the tender mercies of the adjutants and vultures of the burning ghats, aud urged upon Government. the necessity of taking immediate steps for the erection of temporary houses of refuge, not with an eye to the health and comfort only of the famished people who have come from the famine districts, but to the health of the native population of Calcutta at whom epidemic diseases are already staring in the face. Calcutta was never in so great a danger as at the present moment. And yet, dead to all feelings of humanity, heedless of the calls of duty, the Lieutenant Governor leaves us most unceremoniously to take care of ourselves and of the swarming pauper population that have crept into our city in the best way we can, for a luxurious and comfortable retreat in the hills, isolated from the cares of the Government entrusted to his charge. If ill health really be his plea, why not act boldly and independently by resigning at once the reins of administration in favour of some one who may be both willing and able to do his duty."[১]

বাস্তবিকই দেশের এই ভীষণ অবস্থা ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং পার্লিয়ামেন্ট ভারত গভর্নমেন্টের কৈফিয়ত চাহিয়াছিলেন। ভারত গভর্নমেন্ট কমিশন নিযুক্ত করিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কমিশনের রিপোর্ট পাইয়া বাঙলা গভর্নমেন্টের কার্যের উপর তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র কমিশনর এবং বোর্ড অব্ রেভিনিউই তিরস্কৃত হন নাই, এরূপ মহাসঙ্কট সময়ে ছোটলাট বাহাদুরও এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। বড়লাট বাহাদুর লিখিয়াছিলেন, "We find ourselves unable to speak with satisfaction or approval of the mode in which the emergency was met by the Lieutenant Governor."

বিলাতে হাউস অব কমন্স সভায় স্যর সিসিলের কার্য তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ স্যর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বক্তৃতার উপসংহারে বলেন, "This catastrophe must always remain a monument of our failure, a humiliation to the people of the country, to the Government of this country and to those of our Indian officials of whom we had been perhaps a little proud."

যখন সমগ্র দেশ ছোটলাট বাহাদুরের কার্যে মর্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিল, সেই সময়ে লালবিহারী দে তাঁহার Friday Review পত্রে স্যর সিসিলের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহাতে লালবিহারী তদানীন্তন বঙ্গসমাজের বিরক্তিভাজনও হইয়াছিলেন।

শিক্ষাবিভাগে প্রবেশলাভ

সে যাহা হউক, স্যর সিসিল বিডন তাঁহার পক্ষসমর্থক লালবিহারীকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিলেন। তিনি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট সুপারিষ করাতে লালবিহারী বহরমপুর কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য লালবিহারীর অসাধারণ আগ্রহ ছিল এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ তাঁহার জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল ; এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপূর্ব সুযোগ ঘটিল।

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী "বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা" নামক একটি প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধটি বেথুন সভায় পঠিত হইয়াছিল। পুস্তিকাখানি ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি স্যর জন লরেন্সের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। কারণ, স্যর জন

লরেন্স এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন এবং বেথুন সভার যে অধিবেশনে লালবিহারীর প্রবন্ধ পঠিত হয় সেই অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রবন্ধ-পাঠককে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে লালবিহারী এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া গভর্নমেণ্ট ও দেশীয় জমিদারগণকে তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে তিনি যে অকাট্য যুক্তি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সর্বজন-প্রশংসিত হইয়াছিল।

গোবিন্দ সামন্ত বা বঙ্গীয় কৃষকের জীবন-ইতিহাস। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার স্বনামধন্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙলার শ্রমজীবিগণের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন" সম্বন্ধে বাঙ্গালা বা ইংরাজী ভাষায় রচিত সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। লালবিহারী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। কিন্তু দুইজন পরীক্ষক ইংলণ্ডে গমন করায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রেরিত প্রবন্ধগুলি পরীক্ষিত হয় নাই। ঐ বৎসরের মধ্যভাগে লালবিহারীর প্রবন্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ধারিত হয় এবং লালবিহারীকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদত্ত হয়। লালবিহারী এই প্রবন্ধে আরও তিনটি অধ্যায় সংযুক্ত করিয়া 'গোবিন্দ সামন্ত' নামে উপন্যাসাকারে প্রকাশিত করেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ডাক্তার জর্জ স্মিথ, হাইকোর্টের তদানীন্তন অন্যতম বিচারপতি মাননীয় জে, বি, ফিয়ার এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত আচার্য ই. বি, কাউএল মহোদয়গণ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংশোধনে সাহায্য করিয়াছিলেন। পুস্তকখানি পুরস্কার-প্রদাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উৎসৃষ্ট হয়। এই পুস্তকখানি পরে Bengal Peasant Life বা বঙ্গীয় কৃষকের জীবনেতিহাস নামে সুপরিচিত হয়। এই পুস্তকের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং বোধ হয় আর কোন বাঙালির ইংরাজী মৌলিক রচনার এরূপ আদর হয় নাই।" এই পুস্তকখানি কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্বজনপ্রশংসিত হইয়াছিল এবং অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস্ ডারউইন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুস্তকের ইংরাজ প্রকাশকগণকে স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিতে সকল বাঙালিই গৌরব অনুভব করিবেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"I see that the Rev. Lal Behari Day is Editor of the 'Bengal Magazine' and I shall be glad if you would tell him. with my compliments. how much pleasure and instruction I derived from reading a few years ago. his novel, Govinda Samanta,"

বস্তুত দরিদ্র বাঙালি কৃষকের ঘরের কথা সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় লইয়া আর কেহই এরূপ সুন্দরভাবে বিবৃত করিতে সমর্থ হন নাই।

ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে সত্যবাদী ঘোষাল এই পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

পদোন্নতি

বহরমপুর হইতে লালবিহারী হুগলী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে স্থানান্তরিত হন। গুণগ্রাহী লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যর রিচার্ড টেম্পল লালবিহারীকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার Bengal Peasant Life-এ তিনি যে অপূর্ব রচনাক্ষমতা এবং ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই তাঁহার শিক্ষাবিভাগে পদোন্নতির কারণ।

বেঙ্গল ম্যাগেজিন

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের অগস্ট মাস হইতে লালবিহারী Bengal Magazine নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রের প্রবর্তন করেন। ইহার পূর্বে যে শিক্ষিত দেশবাসী কর্তৃক পরিচালিত ইংরাজী মাসিকপত্র প্রবর্তিত হয় নাই এমন নহে, কিন্তু কোনও পত্রই অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। রামগোপাল ঘোষের জীবনচরিত প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গ্রন্থের প্রণেতা সুলেখক কৈলাসচন্দ্র বসু তাঁহার সতীর্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে Literary Chronicle নামে যে মাসিক পত্রের প্রবর্তন করেন তাহা কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস পাল ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ছাত্রাবস্থায় পরিচালিত Calcutta Monthly Magazine-এর তিন সংখ্যার অধিক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কৃতবিদ্য বাঙালি কর্তৃক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত Calcutta Monthly Review বোধ হয় পাঁচ সংখ্যার অধিক প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজী লেখকগণের সহায়তায় Mookerjee's Magazine নামে যে সুন্দর মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন তাহাও পাঁচ সংখ্যা বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে শম্ভুচন্দ্র নব পর্যায়ে Mookerjee's Magazine বাহির করিলে অগস্ট মাসে লালবিহারী তাঁহার Bengal Magazine বাহির করেন। 'বেঙ্গল ম্যাগেজিন' মুখার্জির ম্যাগেজিনের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ না করিলেও উহার অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইয়াছিল। তৎকালে দেশবাসিগণের মধ্যে ইংরাজী মাসিক পত্রের পাঠক সংখ্যা অল্প থাকায় এ সকল অনুষ্ঠানে লাভের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না, বরঞ্চ পরিচালকগণের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকিত। বেঙ্গল ম্যাগেজিনে উৎকৃষ্ট লেখকের এবং সুপাঠ্য প্রবন্ধের অভাব ছিল না। মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'চৈতন্যের জীবনকথা' এবং 'প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত', নবাগত সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের 'বাঙলা সাহিত্যের

ইতিহাস', ও 'বঙ্গীয় কৃষককুলের অবস্থা', রমেশচন্দ্রের সহোদর যোগেশচন্দ্র দত্তের 'কাশ্মীরের ইতিহাস', কুমারী তরু ও অরু দত্তের কবিতা, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং সর্বোপরি সম্পাদকের মনোহর সন্দর্ভাদি বেঙ্গল ম্যাগেজিনের পত্রগুলি অলঙ্কৃত করিয়াছিল। লালবিহারীর কয়েকটি প্রবন্ধের নাম এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল।

(১) The late Babu Kissory Chand Mittra—মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের সুন্দর চরিত্র-চিত্র।

(২) Recollections of my Schooldays—লালবিহারীর ছাত্রজীবনের স্মৃতি-কথা—অতি সুন্দর।

(৩) Teaching of English Literature in the Colleges of Bengal—এই প্রবন্ধটি বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে তৎকালীন শিক্ষা-প্রদান-প্রণালীর বিবিধ দোষ আলোচিত হয়।

(৪) All about the Parsis—ইহাও বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে পার্শীগণের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(৫) Life and Labours of Dr. Carey—চিরস্মরণীয় উইলিয়ম কেরীর সুন্দর জীবন চরিত। ইহা মিশনারি প্রার্থনা সমাজে পঠিত হইয়াছিল এবং মার্শম্যানের কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের বিখ্যাত জীবনচরিত প্রকাশের বহুপূর্বে রচিত হইয়াছিল।

(৬) The Rev. John Wilson—সুলিখিত চরিত-কথা। এই প্রবন্ধও বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল।

(৭) Folk Tales fo Bengal—এই বাঙলা উপকথাগুলি পরে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা

এতদ্ব্যতীত লালবিহারী 'বেঙ্গল ম্যাগেজিনে' রীতিমত বাঙলা পুস্তকের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া বাঙলা সাহিত্যের গতি সুনীতি ও সুরুচি সঙ্গত পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্বে 'কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতি' (Calcutta Historical Society) কর্তৃক প্রকাশিত 'Bengal Past and Present' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাবলীর একস্থানে লিখিত আছে যে লালবিহারী তাঁহার 'বিষবৃক্ষে'র অতি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা ঐ সমালোচনা পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনুযোগের সমর্থন করিতে পারি না।

তাঁহাদিগের পুস্তকে বাঙালির ইংরাজী রচনায় কতকগুলি ত্রুটির তালিকা করিয়া "বাবু ইংরাজী" (Baboo English) বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন তখন লালবিহারী এই ইংরাজ অধ্যাপকদ্বয়ের ইংরাজীর ভূরি ভূরি দোষ প্রদর্শিত করিয়া শিক্ষিত বাঙালির সম্মান রক্ষা করিয়া বাঙালি মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বা সদস্য নির্বাচিত হন।

শুনা যায় লালবিহারীর কিছু পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল। ১৩২০ সালের "মানসী"তে গৌরহরি সেন মহাশয় স্যর গুরুদাসের 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন : "Bengal Peasant Life" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লালবিহারী দে এই সময় (১৮৭০।৭১) বহরমপুর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন ; Grant Hall Club নামক নবপ্রতিষ্ঠিত সভার তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি এবং তৎকালীন সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। *** দিগম্বর বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে, স্যার গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল ইংরাজী জানেন এবং প্রেসিডেন্ট পদে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার। *** ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায়।" যদি লালবিহারীর পাণ্ডিত্যাভিমানের কথা সত্য হয়, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই ; এবং তাঁহার সেই সামান্য দুর্বলতাটুকু আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারি।

অবসরগ্রহণ

৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় লালবিহারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে তিনি মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন পাইতেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি পাঁচ বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন।

শেষ জীবন

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ দিনগুলি নিরুদ্বেগে যাপিত হয় নাই। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিলাতে ব্যারিস্টার হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কোনও সংবাদ না পাইয়া তিনি শান্তিহারা হইয়াছিলেন। তিনি কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করিয়া কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার শেষজীবনের

অশান্তির অন্যতম কারণ। তবে তাঁহার সহধর্মিণী ও কন্যাগণ অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে যথাসম্ভব সুখে রাখিতে চেষ্টা পাইতেন। লালবিহারীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার কন্যাগণ অধিকাংশ সময় তাঁহাকে ধর্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইহাতে তিনি কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে তাঁহার কতিপয় ছাত্র, বন্ধু ও ভক্তগণ কর্তৃক একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে—

IN MEMORY OF
THE REV. LAL BEHARI DAY,

A Student of the General Assembly's Institution under Dr Duff, 1834 to 1844 : Missionary and Minister of the Free Church of Scotland, 1855 to 1867 : Professor of English Literature in the Government College at Berhampore and Hooghly, 1867 to 1889 ; Fellow of the University of Calcutta from 1877, and well known as a journalist and as author of BENGAL PEASANT life and other works. Born at Talpur Burdwan, 18th December 1824 : died at Calcutta, 28th October 1894.
Some of his surviving pupils and of his numerous admirers have erected this tablet

উপসংহার

অমর কবি দীনবন্ধু তাঁহার "সুরধুনী কাব্যে" লালবিহারীর এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন :

বিনোদ-বাসনা লালবিহারী ধীমান্
সরল-স্বভাব ধীর গভীর-বিজ্ঞান,
অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর,
মধুর বচনে তুষ্ট মানব নিকর,
খৃষ্টধর্ম অবলম্বী ধর্ম সুধাপান
অভিলাষী দিবানিশি দেশের কল্যাণ।

দরিদ্রের পর্ণকুটীরে লালবিহারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অবিচলিত অধ্যবসায়, নিরতিশয় শ্রমশীলতা, প্রশংসনীয় স্বাবলম্বন এবং অপূর্ব চরিত্রদার্ঢ্যগুণে তিনি নিম্নতম অবস্থা হইতে সম্মানিত উচ্চপদ অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসীম বিদ্যানুরাগ, স্বাধীন তেজস্বিতা, ও আন্তরিক দেশহিতসাধনেচ্ছা তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। বিদেশীয় ভাষায় অসামান্য অধিকার লাভ এবং পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া তিনি বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলিলাভ করিয়া "বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে" এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। বাঙলার ভূতপূর্ব লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর (পরে বোম্বাইয়ের গভর্নর) সুপণ্ডিত সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার "Men and Events of my time in India" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লালবিহারীর সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সকল বাঙ্গালীই গৌরব অনুভব করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন :

> His character was marked by firmness, independence and ambition for doing good in his generation Having been in intimate communication with the missionaries, he possessed and exact knowledge of the best points in the European character, and his writings displayed much insight into the thoughts and ways of the poorer classes among his countrymen. He possessed much literary skill and wrote English prose with purity and perspicuity.

সূত্রাবলি

"মৎসম্পাদিত *Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee*" নামক গ্রন্থে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ বিষয়ক আরও কয়েকটি এইরূপ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী

পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী

উপক্রমণিকা

জগতে সচরাচর দুইশ্রেণীর বড়লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর বড়লোক আছেন যাঁহারা জগতের উপকার করিয়া থাকেন কিন্তু তাহার বিনিময়ে যশেরও কামনা করেন। যশের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা অন্যান্য অনেক বিষয়ে স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। উচ্চতন যশোলাভের সহিত তাঁহাদের পরহিতৈষণাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আর একশ্রেণীর বড়লোক আছেন যাঁহারা নীরবে জগতের হিতসাধন করিয়া যান। তাঁহারা কখনও যশের কামনা করেন না। সৎকার্য সম্পাদনজনিত সন্তোষই তাঁহারা যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া বিবেচনা করেন। অন্য লোকে পাছে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম দেখিয়া প্রশংসা করে এই ভয়ে যেন তাঁহারা সর্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর বড়লোকেরা সর্বদা লোকচক্ষুর সম্মুখে থাকেন, তাঁহাদের যশঃপ্রভায় চতুর্দিক আলোকিত হইয়া থাকে। শেষোক্ত শ্রেণীর বড়লোকেরা সর্বদা আত্মগোপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নীরব জনহিতসাধনার ইতিহাস কদাচিৎ সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। তথাপি, যাঁহারা সৌভাগ্যবলে কখনও শেষোক্ত শ্রেণীর কোন মহাত্মার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবেন যে এই শ্রেণীর মহাপুরুষগণ মানবহৃদয়ে যেরূপ গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারেন, মানবের জীবন-পথ যেরূপে আলোকিত করিতে পারেন, আর কেহই সেরূপ পারেন না। সূর্যের প্রতিফলিত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া যখন পূর্ণিমার চন্দ্র সগৌরবে উদিত হয় তখন আমরা কয়জন অস্তাচলগত দুর্নিরীক্ষ্য ভাস্করের নিকট তাহার ঋণের কথা স্মরণ করি? যে সকল পরহিতব্রত নীরব সাধকের যত্ন, চেষ্টা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, আমরা কয়জন সেই নীরব কর্মীদিগের নিকট তাঁহাদের ঋণের কথা স্মরণ করি?

আমাদের দেশের আদর্শ, প্রতীচ্য আদর্শ হইতে বিভিন্ন। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে, আমাদের নীতিশাস্ত্রের সর্বত্রই নিষ্কাম কর্মের প্রাধান্য ও প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমরা পূর্ব আদর্শ হইতে বোধ হয় বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছি। সেই জন্য

অনেক সময়ে যাঁহারা নিষ্কামভাবে নীরবে পরহিতব্রত পালন করিয়া যান তাঁহাদের উপযুক্ত পূজা করি না—তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি না।

আমরা যে মহাত্মার জীবন-কথা আলোচনা করিবার মানসে বর্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি, তিনিও চিরদিন নীরবে দেশের কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে তিনি এক হিসাবে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেও তাঁহার যশঃসৌরভ অনেকের ন্যায় তাদৃশ বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা সৌভাগ্যবলে তাঁহার কার্যের পরিচয়লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন এক গৌরবময় আসন অধিকার করিয়া থকিবে। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব মনীষা, মহান স্বার্থত্যাগ ও পরহিতচিকীর্ষা, বিদ্যোৎসাহিতা ও শিক্ষাবিস্তারে অসীম আগ্রহ এবং সর্বোপরি তাঁহার সরল, উদার ও কমনীয় স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। তাঁহার নীরব জনহিতসাধনার ইতিহাস সঙ্কলন করা অতিশয় দুঃসাধ্য। আমরা তাঁহার জীবনকথা যতটুকু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই আজি আমাদের অক্ষম লেখনীর সাহায্যে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

হুগলী জিলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমায়, দ্বারকেশ্বর নদীর তটভূমিতে অবস্থিত রাধানগর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। পূর্বে সাধারণে এই গ্রামের নামও জানিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি বলিয়া এক্ষণে উহা ভারতবর্ষবাসী মাত্রেরই মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হইযা থাকে। মনীষী রমাপ্রসাদ রায়, ভক্ত যদুনাথ সর্বাধিকারী, পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকাবী, ধন্বন্তরীকল্প ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি বহু বঙ্গবিখ্যাত মনীষীর জন্মস্থান বা শৈশবের লীলাভূমি বলিয়া বঙ্গবাসীর নিকট এই তীর্থক্ষেত্রের মহিমা সহস্রগুণে বর্ধিত হইয়াছে। এই রাধানগরের উপকণ্ঠে সাহানপুর নামক স্থানে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে (১২৩২ বঙ্গাব্দে) প্রসন্নকুমার তদীয় মাতামহ গোপীমোহন ঘোষ মহাশয়ের আবাসে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রসন্নকুমার সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আদিশূর কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন তাঁহাদের সহিত পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দশরথ বসু অন্যতম। ইনিই বাঙলা দেশের যাবতীয় 'বসু' উপাধিধারী কায়স্থগণের আদিপুরুষ।

কথিত আছে যে দশরথের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ সুরেশ্বর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে উড়িষ্যার দেওয়ান বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তদীয় সহোদর ঈশানেশ্বর তখন দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের উজীর ছিলেন। সুরেশ্বরের শাসনকালে উড়িষ্যায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁহার চেষ্টায় পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের চতুর্দিক প্রাচীরবেষ্টিত হয় এবং উড়িষ্যার প্রশস্ত রাজবর্ত্মসমূহ নির্মিত হয়। জগন্নাথদেবের মন্দিরের পুরোহিতগণ

কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সুরেশ্বরকে এই মন্দিরে অবাধ প্রবেশাধিকার প্রদান করেন এবং এই সম্মানজনক অধিকার সুরেশ্বরের বংশধরগণ এখনও ভোগ করিতেছেন। সুরেশ্বরের বংশধরগণ এই সময় হইতে আরও একটি সম্মানজনক অধিকার লাভ করেন। সচরাচর কাহাকেও মন্দিরের অভ্যন্তরে মস্তকে ছত্রস্থাপন করিতে দেওয়া হয় না ; কিন্তু সুরেশ্বরের সময় হইতে তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের সম্মানের জন্য মস্তকে ছত্র স্থাপিত হইয়া থাকে। সুরেশ্বর যেরূপ লোকরঞ্জন শাসনকর্তা ছিলেন সেইরূপ কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার কার্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া দিল্লির বাদশাহ বার্ষিক দ্বিলক্ষাধিক আয়ের রঘুনাথপুরের জমিদারি জায়গীর ও বংশানুক্রমে 'সর্বাধিকারী' উপাধি প্রদান করেন। 'সর্বাধিকারী' উপাধি দ্বারা এই উপাধিধারীদিগের সর্ববিষয়ক শ্রেষ্ঠতা সূচিত হয়।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় তৎসম্পাদিত 'তীর্থভ্রমণ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে প্রাগুল্লিখিত প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই সিদ্ধান্ত কোন্ যুক্তিমূলক জানি না, কিন্তু পূর্বোক্ত প্রবাদ হইতে সম্ভ্রান্ত সর্বাধিকারী বংশের প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে সন্দেহ নাই।

ঊনবিংশ পর্যায়ে রত্নেশ্বর সর্বাধিকারী সর্বপ্রথমে উড়িয্যা হইতে হুগলী জিলায় রাধানগরে আসিযা বাস করিতে আরম্ভ করেন। রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের জমিদার সিংহবংশীয় কিশোর রায়ের কন্যাকে আদ্যরসে বিবাহ করেন।

এই বংশের (২৩ পর্যায়ে) রামনারায়ণ সর্বাধিকারী সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। শেষোক্ত ভাষায় অসাধারণ অধিকারের জন্য তিনি 'মুন্সী রামনারায়ণ" এই গৌরবজনক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুন্সী রামনারায়ণ রাজা রামমোহন রায়ের পিতা, স্বগ্রামবাসী মুন্সী রামকান্ত রায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রামনারায়ণ অতি পরোপকারী ও ধর্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দরিদ্রগণকে বিদ্যাদানের জন্য রাধানগরে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং অনেক ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার সানন্দে বহন করিতেন। ইনি কর্মসূত্রে কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। এই স্থান এখনও মুন্সীর বাগান নামে পরিচিত। এই স্থানে অবস্থিতিকালে রামনারায়ণ স্বীয় ব্যয়ে মুন্সীর বাগান হইতে ওয়াটগঞ্জ পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়া দেন। এই রাস্তা এক্ষণে 'মুন্সীগঞ্জ' রোড নামে খ্যাত। শুনা যায়, এই রাস্তা নির্মাণে রামনারায়ণের লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হয়, কিন্তু গভর্নমেন্ট তাঁহাকে এই অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

মুন্সী রামনারায়ণ আভিজাত্য বৃদ্ধির জন্য স্বীয় বংশের প্রথানুসারে "নবরঙ্গ কুল" করেন। অর্থাৎ পুত্র-কন্যা নয়টীকে পর্যায়ক্রমে উপযুক্ত কুলীন পাত্রী ও পাত্রে বিবাহ দেন। তিনি যে নবরঙ্গ কুল করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতীর খানাকুল

কৃষ্ণনগর নিবাসী নবকিশোর ঘোষের পুত্র কালিপ্রসাদ ঘোষের সহিত বিবাহ এবং তাঁহার পঞ্চম কন্যা গোলোকমণির হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পিতামহের সহিত বিবাহ হয়। দেওয়ান তুলসীরাম ঘোষের পুত্র শিবপ্রসাদের সহিত রামনারায়ণের অপর এক কন্যার বিবাহ হয়। এই কন্যার গর্ভে বিখ্যাত কবি কাশীপ্রসাদ[১] জন্মগ্রহণ করেন। নবরঙ্গ কুল করিবার জন্য রামনারায়ণকে বিস্তর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল।

অপরিমিত দানশীলতার ফলে রামনারায়ণ অধিকাংশ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় রামনারায়ণ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধারযোগ্য :

"কথিত আছে, খাজনার টাকা কিছু কম থাকাতে রামনারায়ণ পুত্র মদনমোহনকে অর্থসংগ্রহ করিতে বলেন। মদনমোহন নিজে টাকার জোগাড় না করিয়া শ্বশুরের নিকট হইতে আনিয়া দেন এবং পিতার নিকট তাহা উল্লেখ করেন। উপযুক্ত পুত্র অন্য উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিবার উপায় সত্ত্বেও বৈবাহিকের নিকট ঋণ করিয়াছে বলিয়া খাজনার টাকা খাজনাঘরে আবদ্ধ রাখিয়া রামনারায়ণ তাহার চাবি পুকুরে ফেলিয়া দেন। পুত্রকে অনুমতি করেন যে, চাবি খুলিয়া অগ্রে তাঁহার শ্বশুরের টাকা যেন প্রত্যর্পণ করা হয়, কারণ এরূপ অবস্থায় বিষয়রক্ষা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহনের উপর রাগ করিয়া কটক জেলার রঘুনাথপুর ও অন্যান্য অধিকাংশ সম্পত্তির রাজস্ব না দিয়া লাটে চড়াইয়া বিক্রয় করাইয়া দেন।"

রামনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহন সদর আমীনের কর্ম গ্রহণ করেন। মদনমোহনের পুত্র সীতানাথ প্রথমে রাজপ্রতিনিধির দেওয়ান এবং পরে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম হুমায়ুনজার দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইনি রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মথুরামোহন ভূকৈলাসের ঘোষালদিগের জমিদারী পর্যবেক্ষণ করিতেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনাথ সর্বাধিকারী প্রসন্নকুমারের জনক।

যদুনাথ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে (১২১২ বঙ্গাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তাৎকালীন রীত্যনুসারে তিনি সংস্কৃত ও পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে রাধানগরের নিকটবর্তী সাহানপুর গ্রামে কৃতনিবাস গোপীমোহন ঘোষের কন্যা লবঙ্গলতাকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে চারি পুত্র প্রসন্নকুমার, সূর্যকুমার, আনন্দকুমার, রাজকুমার ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি হুগলীর গুড়োপ গ্রামে প্রসিদ্ধ নাগবংশীয় জমিদার বাড়িতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে তাঁহার চারিপুত্র—অক্ষয়কুমার, অমৃতকুমার, অনন্তকুমার ও উপেন্দ্রকুমার এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পাঠকগণের বোধসৌকর্যার্থ নিম্নে একটি বংশলতা মুদ্রিত হইল।

১। দশরথ বসু
↓
২। শ্রীকৃষ্ণ
↓
৩। ভব
↓
৪। হংস

৫। শুক্তি (বালাণ্ডা) ৫। মুক্তি (মাহীনগর) ৫। অলঙ্কার (বন্দ)

↓
৬। দামোদর
↓
৭। অনন্ত
↓
৮। গুণানন্দ
↓
৯। মাধব
↓
১০। লক্ষ্মণ
↓
১১। মহীপতি
↓
১২। সুরেশ্বর
↓
১৩। বিশ্বনাথ
↓
১৪। জন্মেজয়
↓
১৫। মাধব
↓
১৬। যাদব
↓
১৭। কৃষ্ণদাস
↓
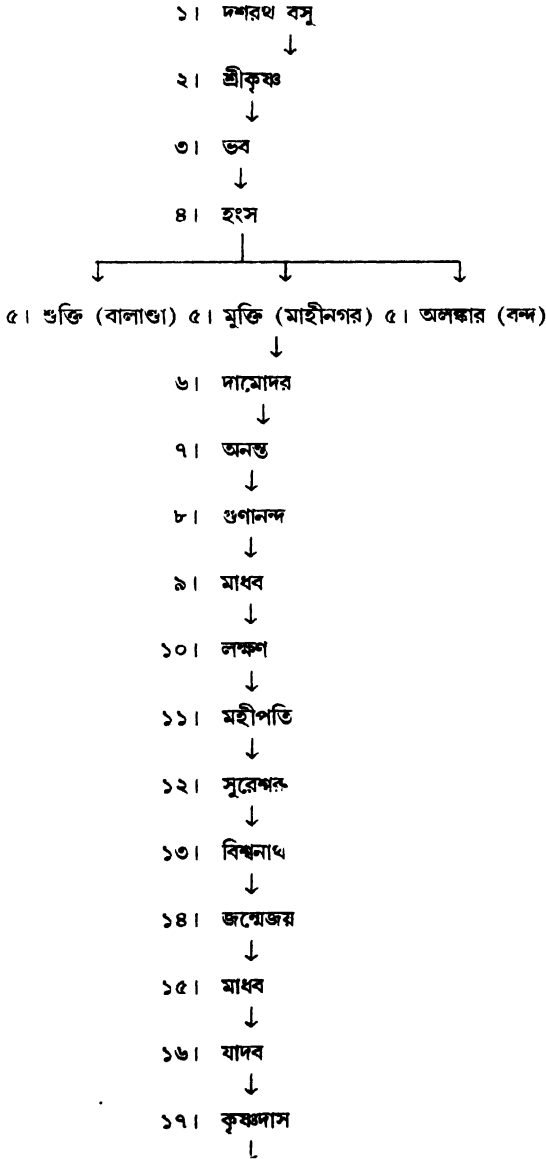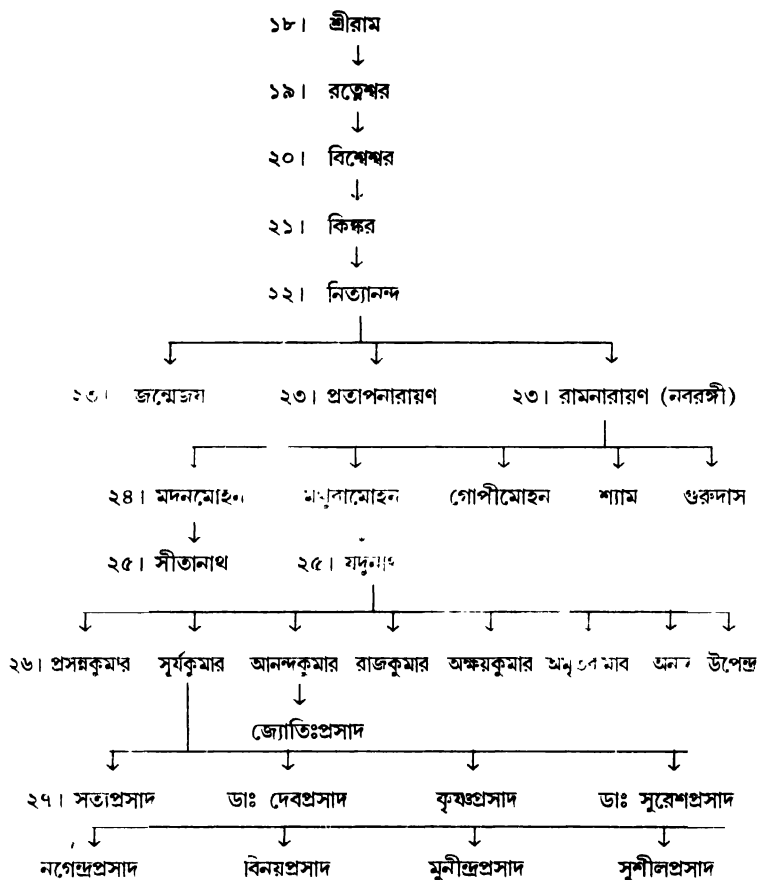
যদুনাথ অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। সন ১২৬০ সালের ১১ ফাল্গুন হইতে ১২৬৪ সালের ৯ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত প্রায় চারিবর্ষ কাল তিনি ভারতবর্ষের নানা তীর্থ সন্দর্শন করিয়া দৈনন্দিন ঘটনাসমূহ তাঁহার রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই রোজনামচা সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক 'তীর্থভ্রমণ' নামে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যে এক অপূর্ব জিনিস। সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন, মনীষী সারদাচরণ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ এই গ্রন্থের

যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। যদুনাথ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ও সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমার তাঁহার রচিত কতকগুলি 'সঙ্গীত-লহরী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যদুনাথ কয়েকখানি গীতিনাট্যও প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'উষাহরণ' ও 'চন্দ্রকান্ত' উল্লেখযোগ্য। যদুনাথের রচিত সুললিত সঙ্গীতগুলিতে তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, রসজ্ঞান ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঝুলনপূর্ণিমার দিবস যদুনাথ স্বর্গারোহণ করেন।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে রাধানগরের উপকণ্ঠে সাহানপুর নামক গ্রামে মাতামহালয়ে প্রসন্নকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সুতিকাগারের নিকটে একটি প্রচুর ফলবান কাঁঠাল বৃক্ষ বহুদিবস পর্যন্ত বর্তমান ছিল। গ্রামের লোকপরম্পরায় এই একটি কথা প্রচলিত ছিল যে, যে স্থানে প্রসন্নকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ঐ স্থানটি অতি তেজস্কর, সেইজন্য কাঁঠাল বৃক্ষটি এত ফলবান।

প্রসন্নকুমারের জন্মকালে তাঁহার প্রপিতামহ মুন্সী রামনারায়ণ সর্বাধিকারী জীবিত ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি জীবিত থাকায়, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজন না থাকায়, প্রসন্নকুমারের অন্নপ্রাশনের সময় তিনি তাঁহার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের সহিত একত্র আহার করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার অন্নপ্রাশনের অন্য কোন কার্য হয় নাই।

প্রসন্নকুমার অল্পবয়সেই মাতৃহীন হন। প্রসন্নকুমারের জননী লবঙ্গলতা অতি পবিত্রস্বভাবা ও ধর্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। প্রসন্নকুমার অধিক কাল এই সাধ্বী রমণীর স্নেহময় অঙ্কে বর্ধিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সহোদর ও সহোদরাদিগের এ বিষয়ে ক্ষোভের কোন কারণ ছিল না। কারণ, প্রসন্নকুমার বাল্যকাল হইতেই অতি ধীর, শান্তপ্রকৃতি, কোমল-হৃদয় ও স্নেহশীল ছিলেন এবং তাঁহার যত্নে ও স্নেহে তাঁহার সহোদর সহোদরাগণ কখনও মাতৃস্নেহের অভাব অনুভব করেন নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নীলমণিকুমার মহাশয় বলেন, যে তাঁহার সহোদরগণকে 'মানুষ' করিয়া তুলিতে প্রসন্নকুমারের চরিত্রের যে সকল বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়াছিল, সেগুলির প্রতি স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার প্রতি আমাদিগকে শ্রদ্ধাপরায়ণ করিয়া তুলে।

প্রসন্নকুমার প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় হৃদয়রাম মজুমদার নামক একজন গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙলা-ভাষা ও শুভঙ্করী শিক্ষা করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই সুশীল সুবোধ ও অধ্যবসায়শীল ছিলেন। পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রসন্নকুমার রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুপ্রসিধ রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট তাঁহার রঘুনাথপুরস্থ বাটীতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) প্রসন্নকুমারের পিতামহ মথুরামোহন তাঁহাকে রীতিমত ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত কলিকাতায় লইয়া আসেন। কলিকাতায় আগমন করিবার

কিছুদিন পরে প্রসন্নকুমার তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রাজা সীতানাথ সর্বাধিকারীর সাহায্যে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন।

প্রসন্নকুমারের পিতামহ খিদিরপুরে থাকিতেন। চতুর্দশবর্ষীয় বালক প্রসন্নকুমার প্রত্যহ পদব্রজে খিদিরপুর হইতে পটলডাঙ্গায় হিন্দু কলেজে পড়িতে আসিতেন। এই সময় তাঁহাকে কিরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু প্রসন্নকুমারের জ্ঞানপিপাসা এত প্রবল ছিল যে তিনি এই পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া গণ্য করিতেন না। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে প্রসন্নকুমার তাঁহার পাঠ্য পুস্তকগুলি কণ্ঠস্থ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বাটী ফিরিয়া রন্ধনাদিও করিতে হইত। অত্যধিক পরিশ্রমবশত তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়। তজ্জন্য তিনি খিদিরপুর পরিত্যাগ করিয়া শ্যামবাজারে তাঁহার আত্মীয় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের বাটীতে অবস্থান করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকেন। তিনি যে গৃহে পাঠ্যাভ্যাস করিতেন সেই গৃহে অনেকগুলি চঞ্চলমতি বালক নানাপ্রকার বাজে গান গল্প করিয়া তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত করিত। এইজন্য প্রসন্নকুমার প্রতিদিন সকলে নিদ্রিত হইবার পর অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া অসাধারণ মনঃসংযোগপূর্বক পাঠাভ্যাস করিতেন। প্রদীপের তৈল নিঃশেষিত হইলে মধ্যে মধ্যে জ্যোৎস্নালোকে বা রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া গ্যাসের আলোকে পাঠ্যাভ্যাস করিতেন। কি অদ্ভুত সাধনা ! কি অপূর্ব অধ্যবসায়! আজকাল এ সকল কথা উপন্যাসের ন্যায় কাল্পনিক বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন যে, এ সকল কথা তিনি প্রসন্নকুমারের নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং উহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

এই অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য সাহিত্যবিজ্ঞানাদিতে অতি উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের প্রধান শিক্ষক মিষ্টার জোন্স, কলেজবিভাগের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন ও মিস্টার কার, গণিতাধ্যাপক মিস্টার রীজ, বাঙলার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র এবং স্টাইন মিড্‌লটন্, হানফোর্ড প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষকগণ তাঁহার বিবিধ গুণগ্রামে মোহিত হইয়া যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। কি সাহিত্য, কি গণিত, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি ইতিহাস সকল বিষয়েই প্রসন্নকুমারের অনুরাগ দৃষ্ট হইত। প্রথম শ্রেণীতে উঠিবার পূর্বেই প্রসন্নকুমার আট টাকা মাসিক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি চারি বৎসর কাল উচ্চ বৃত্তি (senior scholarship) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেকালে প্রথম শ্রেণীতে চারি বৎসর কাল পড়িলে একালের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের অপেক্ষা অল্প বিদ্যালাভ হইত না। ১৮৪৭ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র স্কলারশিপের পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ বিষয়ে পাঠকগণের একটি স্থূলধারণা জন্মিবে।

১৮৪৭ ; সাহিত্য—Bacon's Advancement of Learning. So much of Milton & Pope as is contained in Richardson's selections. পুরুষেরা অনেক

অনেক বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন এবং অনেক বিষয়ের নির্ধারিত করিয়াছেন সুতরাং পূর্বতন হিন্দুজাতির পদার্থবিদ্যার অবস্থা যাহা তাঁহাদের গ্রন্থ দর্শন দ্বারা জানা যাইতেছে বলিতে হইবে যে গ্রীকদিগের পদার্থ বিদ্যার অবস্থা অপেক্ষা অপকৃষ্ট ছিল।

কিন্তু দর্শন বিদ্যায় হিন্দুরা গ্রীকজাতি অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। বেদান্তদর্শনের ন্যায় গ্রীকশাস্ত্রে কোন দর্শন নাই। আমাদের ষড়দর্শনের অন্য পঞ্চ দর্শন যদ্যাপিও উৎকৃষ্ট াতে বেদান্ত দর্শনের তুল্য নহে তথাপি গ্রীকদিগের কোন দর্শন তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। আহা আমাদের দশনশাস্ত্রে যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইয়াছে তাহা শুনিলে পূর্বকালের প্রতি কি পর্যন্ত শ্রদ্ধা জম্মে। আত্মার অক্ষয়তা গ্রীক ও হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে উভয়েই প্রমাণ করিয়াছেন। মনের গতির নিয়ম সূক্ষ্মরূপে গ্রীকেরা কি হিন্দুরা কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। পরকাল নিয়মে উভয় দেশীয় দর্শনশাস্ত্রেই গোলযোগ করিয়াছেন। অনন্তর এই বাচ্য যে আমাদের স্বদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের যাদৃশ করিতে হইবেক পূর্বকালের কোন দর্শনশাস্ত্রের নির্ণয়করণের বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন কলেজে স্বতন্ত্র পরীক্ষা গৃহীত হইত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পরিষদের নির্দেশে ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে একসঙ্গে পরীক্ষা করা হয়। এই সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রসন্নকুমার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ৪০ টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইংরাজী ও বাঙলা প্রবন্ধ রচনাতেও ইনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। উভয় প্রবন্ধই ১৮৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দের সরকারী রিপোর্টে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা প্রসন্নকুমারের তাৎকালীন বাঙলা রচনার নমুনা দেখাইবার জন্য এস্থলে উহা পুনরুদ্ধৃত করিলাম। ইংরাজী রচনাটির বিষয় ছিল "জাতীয় চরিত্রের উপর জলবায়ুমৃত্তিকার প্রভাব।" বাঙলা রচনাটির বিষয় ছিল "সত্যের মহিমা বর্ণন কর।"

সত্যের মহিমা। সত্যই সার পদার্থ। সত্যের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর সমুদয় কর্ম সম্পাদন হইতেছে। অতি সামান্য গৃহকর্ম অবধি পুরাবৃত্ত লেখক ও জ্যোতির্বেত্তার নিগূঢ়ানুসন্ধান পর্যন্ত সত্যই সকলের আধার। পরম অনুকম্পাবান জগদীশ্বর যদ্যপি মনুষ্যের মনোমধ্যে সত্যের প্রতি প্রেম সংস্থাপন না করিতেন তবে মনুষ্য সমাজ কুত্রাপি স্থায়ী হইতে পারিত না। কোন বিপুল বিদ্যবিশারদ গ্রন্থকর্তা উল্লেখ করিয়াছেন যে এই পৃথিবী মণ্ডলস্থ অত্যন্ত মিথ্যাবাদী ব্যক্তিও জীবনকালের মধ্যে শতাংশের একাংশের অধিক মিথ্যাবাক্য ওষ্ঠ হইতে নির্গত করে না। অতএব সত্য প্রতিপালন করা জগদীশ্বরের প্রধান আজ্ঞাবৎ জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তদীয় আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে যে দোষ স্পর্শে মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সেই দোষের অপরাধী।

সত্যের অবহেলাই সকল পাপের মূল। সত্যের প্রতি আদর থাকিলে কোন পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। মনুষ্য লজ্জাবশত আপনকৃত অপকর্ম অন্য অন্য লোকের

নিকট প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু সত্যবাদী হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হয় এবম্বিধায়ে। সত্য পরায়ণ ব্যক্তির নিকটে পাপ সমাগম করিতে পারে না।

ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি যত্নবান হইলে সত্যের অনাদর কুত্রাপি শ্রেয়স্কর নহে। মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে সর্বদা চিন্তাকুল থাকিতে হয় কি জানি কখন তাহার মিথ্যা কথা প্রকাশ হইয়া তাহার প্রতি লোকের অবিশ্বাস জন্মে এবং তদ্দ্বারা তাহার মানের ও সুখের হানি হয়। কিন্তু সত্যবাদীকে এরূপ ভাবনায় কোনকালেই পতিত হইতে হয় না। সত্য স্বয়ংসিদ্ধ কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করে না। অপিচ "অদ্য বা অব্দশতান্তে" মনুষ্যের মরণই নিশ্চয়। অতএব যদ্যপিও ইহলোকে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগের দ্বারা কাহারও সুখ সম্ভাবনা হয় ততাপি জীবনান্তে বিশ্বকর্তার বিচারাধীন হইয়া অনন্তকাল পর্যন্ত দুঃখভোগ করিতে হইবেক ইহা বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত থাকা উচিত।

সর্বদেশেরই উত্তম উত্তম গ্রন্থে সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও মিথ্যার অপকৃষ্ট স্বভাব বর্ণিত আছে। মহাভারতীয় স্বর্গরোহণ পর্বে লিখিত আছে যে ধর্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। কুরুপাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন কৃষ্ণ প্রভৃতি অনেকে দ্রোণাচার্যকে ম্লান এবং হতবল করিবার নিমিত্তে ধ্বনি করিতে লাগিলেন দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে" কিন্তু তাহাতে যুধিষ্ঠিরের বাক্য না শুনিয়া আচার্য বিশ্বাস না করাতে কৃষ্ণের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির উচ্চৈস্বরে কহিলে "অশ্বত্থামা হত" এবং অতি মৃদুস্বরে কহিলের "ইতি গজ"। চিরকাল সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির জীবনের মধ্যে এক মুহূর্তকাল সত্যের প্রতিবন্ধক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; মহাকবি ব্যাসদেব বর্ণনা করিয়াছেন যে এজন্যও তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল।

মহাত্মা লর্ড বেকন গ্রীকদেশীয় কবি লুকবিয়স্ হইতে এই বচন উদ্ধৃত করিযাছেন যে "জ্ঞানময় পর্বতোপরি আরোহণ করিয়া সত্যের অবলম্বন করত যে ব্যক্তি নিম্নস্থ কুজ্ঝটিকাস্বরূপ অজ্ঞান ও অসত্যের সহিত সংশ্রব না করিয়া তদুপরি দৃষ্টিপাত করেন তিনিই পরম সুখী।" ফলত মানবজীবন ধারণ করিয়া সত্যের সহিত বিসম্বাদ করিলে সে জীবন কেবল বিযময়। তাহাতে সুখের লেশমাত্র নাই।

পরন্তু সত্যের আলোচনায় মনের স্ফূর্তি জন্মে, মানসিক গুণসকল সুন্দররূপে বিকশিত হয় এবং স্বভাবের সৌন্দর্যতার প্রভাব হয়। দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় বিতর্ক, জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা ও ভূতত্ত্বের সম্যক জ্ঞান কেবল সত্যের মহিমাসূচক। সত্য মূলীভূত না হইলে সে সফল হইতে পারিত না।

অবশেষে এই বক্তব্য যে সত্য পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের উপাসনা কেবল বিচলিত মনের কর্ম।

উপরি-উদ্ধৃত বাঙলা প্রবন্ধটি পরীক্ষক আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Rev. K. M Banerjee) প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের বাঙলা রচনা

সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহন শিক্ষাপরিষদের নিকট যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"বাঙলা ভাষার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আমি হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের বাঙলা রচনা প্রশংসার যোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। এতদেশে একটি সংস্কার অত্যন্ত প্রবল যে, সংস্কৃতভাষায় অধিকার না থাকিলে বাঙলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত হওয়া যায় না ; ইহার ফলে, সংস্কৃতব্যাকরণে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ না করিয়া কেহই বিশুদ্ধ বাঙলা রচনা লিখিবার প্রয়াস পান না। যাঁহারা মনে করেন যে, সংস্কৃত ব্যতীত বাঙলা ভাষার অনুশীলন অসম্ভব, আমি তাঁহাদের যুক্তির সমর্থন করিতে অসমর্থ। যদিও এই দুইটি ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ বর্তমান, এবং সংস্কৃত ভাষার নিকট বাঙলা ভাষা, অশেষ প্রকারে ঋণী, তথাপি পূর্বোক্ত ভাষায় অধিকার লাভ না করিয়া শেষোক্ত ভাষার অনুশীলন অসম্ভব নহে। যদি যথেষ্ট যত্ন লন, তাহা হইলে ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় একে বারে অনভিজ্ঞ হইয়াও বিশুদ্ধ বাঙলা লিখিতে পারেন, তবে এই ভাষার আদর্শ ব্যাকরণ ও কোযগ্রন্থের অভাবনিবন্ধন প্রবন্ধ লেখকগণকে মধ্যে মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইতে হইবে। বাঙলার জনসন্ বা মারে এখন ও জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং অন্য দুই একজন ছাত্রের রচনা যদিও সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ নহে, তথাপি অত্যন্ত সন্তোষজনক, এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে এইরূপ ত্রুটির কারণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই।

টাউন হলে পুবস্কার-বিতরণ সভায় বাঙলার তদানীন্তন ডেপুটি গভর্নর মাননীয় সার হার্বার্ট ম্যাডক বাঙলা রচনায় পারদর্শী প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি ছাত্রগণকে কিরূপে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধারযোগ্য :

"দেশীয় ভাষার অনুশীলনের প্রতি শিক্ষাপরিষদ এবং ইহার অধীনস্থ সকলে যে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মাতৃভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ নিজের এবং স্বদেশবাসীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী, এ কথা আমাদের বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রগণের মনোমধ্যে আমি গাঢ়রূপে অঙ্কিত করাইয়া দিতে চাহি। আমাদের বর্তমান স্কুল এবং কলেজসমূহে ভারতবাসীগণকে যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই বিতরিত হইয়া থাকে। বৃটিশ ভারতের কোটি কোটি প্রজার মধ্যে অধিকাংশই আমাদের ভাষা জানেন না, এবং তাঁহারা যে কোন কালেও জানিবেন, এরূপ আশাও নাই। কিন্তু তাঁহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে আমাদের উচ্চতর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক অর্জিত জ্ঞানের অধিকাংশ কেন তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইবে না, ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই ; এবং ইংরাজীর সহিত যাঁহারা মাতৃভাষাতেও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই এই মহাকার্য সম্ভব। ছাত্রগণ

যে এক্ষণে মাতৃভাষায় অনুশীলনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন, এবং আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে আমাদিগের নিকটে উপস্থাপিত পাঁচটি, বাঙলা প্রবন্ধ প্রশংসার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, ইহা যথার্থই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। সংক্ষেপে আমি আমাদের স্কুল ও কলেজের সকল ছাত্রকে এই অত্যাবশ্যক বিদ্যার চর্চা করিতে অনুরোধ করিতেছি ; কেবলমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্যজ্ঞানের অনন্যসাধারণ পরিচয়-প্রদান অপেক্ষা ইহাই অধিককাল স্থায়ী যশ ও প্রশংসার পথ। আমার আশা আছে যে, স্বদেশপ্রেম এবং উচ্চকাঙ্ক্ষা ইহাদিগকে মাতৃভাষায় ইউরোপীয় সদ্‌গ্রন্থাদির অনুবাদ এবং শিক্ষাপ্রদ মৌলিক গ্রন্থাদির প্রণয়ন দ্বারা দেশের মহদুপকারক বলিয়া সুখ্যাতি অর্জনে প্রণোদিত করিবে। আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে' আপনাদিগকে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে অনুকরণীয়।"

প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজের যে একজন অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন তাহা উপরিলিখিত বিবরণ হইতে পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। এই সময়ে একবার মুর্শিদাবাদের নবাব ফরেদুন জা বাহাদুর হিন্দু কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়া ছাত্রগণের উৎসাহবর্ধনার্থ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা বিতরণের সঙ্কল্প করেন। প্রসন্নকুমার তাহার ২৫টা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রজীবনের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচায়ক— লাইব্রেরী মেডেল প্রাপ্তি। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরী মেডেল পরীক্ষা প্রচলিত হয়। কলেজের ছাত্রেরা বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারে ইচ্ছামত যে কোন বিষয়ের পুস্তকাদি পাঠ করিত, পরে সেই সকল পুস্তকের উপর পরীক্ষা গৃহীত হইত। সর্বোৎকৃষ্ট বালককে একটি সুবর্ণপদক প্রদান করা হইত। লাইব্রেরী মেডেল অধিকার করা সেকালে ছাত্রগণের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার এই দুরূহ লাইব্রেরী পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ে অপূর্ব সম্মান লাভ করিয়া উচ্চশিক্ষিত প্রসন্নকুমার এইবার কর্মজীবনে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি লবণসংক্রান্ত কার্যের তত্ত্বাবধায়ক মিস্টার প্লাউডেনের অধীনে ৮০্ বেতনে অন্যতম সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে উক্ত পদ বিলুপ্ত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রাজা সীতানাথ সর্বাধিকারী তৎকালে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং প্রসন্নকুমারকে নবাব বাহাদুরের অধীনে কোন কর্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। উহাতে তাঁহার যথেষ্ট আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার স্বগ্রামনিবাসী সদর দেওয়ানী আদালতের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল রমাপ্রসাদ রায় এই সময়ে তাঁহাকে ওকালতি করিতে পরামর্শ দেন। রমাপ্রসাদের ন্যায় পৃষ্ঠপোষকের সাহায্যে উচ্চশিক্ষিত প্রসন্নকুমার যে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের দিকেই—বিদ্যাচর্চার দিকেই প্রসন্নকুমারের আকর্ষণ বেশী ছিল। তিনি প্রথমে ঢাকা স্কুলে

অস্থায়ীভাবে এবং পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১৬ ফেব্রুয়ারী দিবসে হিন্দু কলেজের স্কুলবিভাগে ৪০ মাসিক বেতনে একজন সামান্য শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ ডিসেম্বর দিবসে শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ও ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু পরলোকগত জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মেডিকেল কলেজের এবং শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক ডাক্তার এফ্‌ জে মৌয়েট্‌ মহোদয় এতদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সহযোগিতায় 'বেথুন সোসাইটী' নামক এক সাহিত্যসভার প্র তিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার জন্য এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনবিষয়ক সংযোগ স্থাপনের উদেশ্যে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে এই সভার অস্তিত্ব নাই. কিন্তু বহুকাল এই সভা আমাদের মানসিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছিল তাহা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। যখন ডাক্তার মৌয়েট, ডাক্তার ডফ্‌, কর্ণেল ম্যালিসন, কর্ণেল গুডউইন, ডাক্তার রোয়ার, ডাক্তার চেভার্স, রেভারেণ্ড ডল্‌ প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং গুডিব চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, কৈলাসচন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, নবীনকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত বাঙালিব বাগ্মিতায় বেথুনসভাব গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত, তখন বেথুন সভার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! তখন গভর্নর জেনারেল, লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বিনা নিমন্ত্রণে এই সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন হিন্দু কলেজের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং হিন্দু কলেজের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া প্রসন্নকুমারকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন। প্রসন্নকুমারও বেথুনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। বেথুনের পরলোকগমনের পর তদীয় স্মৃতিরক্ষাকল্পে স্থাপিত বেথুন সভার প্রতিও প্রসন্নকুমারের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তিনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১১ নভেম্বর দিবসে এই সভায় On the relative and absolute advantages of science & literature in a Collegiate Education" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি তৎকালে সুধীমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া এস্থনে উহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগকে একবার বলিয়াছিলেন যে যখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেন তখন তাঁহাদের ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ই.বি. কাউয়েল মহোদয় একদিন প্রসন্নকুমারের এই প্রবন্ধটির অতি উচ্চ-প্রশংসা করিয়া বলেন,—"You should study it as a model of English Composition." স্যার গুরুদাস বলেন যে উক্ত প্রবন্ধটি তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে বারম্বার পড়িয়া উহার কোন কোন অংশ মুখস্থ করিয়া

ফেলিয়াছিলেন। স্যার গুরুদাসের স্বর্গারোহণের এক বৎসর পূর্বেও তিনি আমাদিগের নিকটে প্রসন্নকুমারের এই সন্দর্ভের অংশবিশেষ আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত প্রসন্নকুমারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সূচিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রসন্নকুমার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রসন্নকুমারের নিকট ইংরাজী ভাষায় লিখিত সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন। গভর্নমেন্টের ইংরাজী রিপোর্ট প্রভৃতি লিখিতেও প্রসন্নকুমার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করিতেন।

পূর্বোক্ত বেথুন সভায় পঠিত হইবার জন্য এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক যে প্রস্তাব রচনা করেন, প্রসন্নকুমারই তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া উক্ত সভায় পাঠ করিয়াছিলেন।

সেকালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ—কেহই রীতিমত ইংরাজী শিক্ষা করিতেন না। সংস্কৃত কলেজে দুইজন ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন বটে কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা বাধ্যকরী ছিল না বলিয়া ছাত্রগণ কখনও ইংরাজী শ্রেণীতে প্রবেশ করিত, কখনও বা ইচ্ছামত উহা পরিত্যাগ করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে নিয়মিতভাবে ইংরাজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। প্রসন্নকুমারের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন সংস্কৃত কলেজে উচ্চতর প্রণালীতে ইংরাজী শিখাইতে হইবে। প্রথমে প্রসন্নকুমার হিন্দুকলেজে অধ্যাপনার পর সংস্কৃত কলেজের উচ্চ শ্রেণীর কতিপয় ছাত্রকে গোপনে ইংরাজী শিখাইতেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ নভেম্বর প্রসন্নকুমার ৭০্ মাসিক বেতনে সংস্কৃত কলেজের অন্যতম ইংরাজী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় গভর্নমেণ্টের নিকট সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকল্পে কতকগুলি প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় গভর্নমেণ্টকে সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী বিভাগ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :

"যে পদ্ধতি অনুসারে এই বিভাগটি অধুনা গঠিত, তাহা অতীব অসন্তোষকর। এ বিভাগে কি শিক্ষা করিতে হইবে তাহা ছাত্রের ইচ্ছাধীন। যখন ইচ্ছা, সে তাহার পাঠ আরম্ভ করে ও ইচ্ছানুসারে তাহা পরিত্যাগ করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পরেই শ্রেণীতে ব্যাকরণ পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু একেবারে দুইটি নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্রই ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করে। প্রায়ই পরীক্ষার পূর্বে অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজী বিভাগ হইতে পলাইয়া আইসে। সেই ছাত্রেরাই আবার পর বৎসরের আরম্ভে ভর্তি হইতে আইসে। অন্য একটি কারণে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়।

"একটি ইংরেজী বিভাগের শ্রেণীতে অনেক সংস্কৃত বিভাগের শ্রেণীর ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণের বিষয় দেখা যাউক। তৃতীয় শ্রেণীতে ত্রয়োদশটি ছাত্র পাঠ করে। তন্মধ্যে চারিটি স্মৃতিশ্রেণীর ছাত্র, একটি ন্যায়শ্রেণীর, একটি অলঙ্কার শ্রেণীর, একটি তৃতীয় ব্যাকরণ শ্রেণীর ও অবশিষ্ট চারিটি চতুর্থ ব্যাকরণশ্রেণীর ছাত্র। চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৩টি বালক অধ্যয়ন করে। তন্মধ্যে ২টি অলঙ্কার শ্রেণীর, ৫টি সাহিত্য শ্রেণীর, ২টি প্রথম ব্যাকরণ শ্রেণীর, ৬টি দ্বিতীয়, ১০টি তৃতীয়, ৬টি চতুর্থ এবং ২টি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

"বিভিন্ন সংস্কৃত শ্রেণী হইতে ছাত্রেরা ইংরেজী বিভাগে পাঠ করিতে আইসে। ইহাতে এই কুফল উৎপন্ন হয যে, ছাত্রগণ উক্ত সংস্কৃত শ্রেণীতে নিয়মমত উপস্থিত হইতে পারে না, বিশেষত ইংরেজী শিক্ষা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং সংস্কৃত শ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই ইংরেজী বিভাগে অধ্যয়ন করে।

এই ছাত্রগণ বিশেষত নিম্নশ্রেণীর ছাত্ররা বিশেষরূপে উভয়বিধ শিক্ষায় একসময়ে মনোযোগ দিতে অক্ষম। সুতরাং শিক্ষাবিষয়ে তাহাদিগের তাদৃশ উন্নতি দৃষ্ট হয় না।

"যদ্যপি ইংরেজী বিভাগ বর্তমান নিয়মে পরিচালিত হয়, তবে ইহার ফল যে নিতান্তই অসন্তোষজনক হইবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইংরেজী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি ঈদৃশ নিয়মে পরিচালিত হওয়াতেই উহা নিতান্ত মন্দ ফল উৎপন্ন করে ও অবশেষে সাধারণ শিক্ষার জেনারেল কমিটির আদেশে—একেবারে উঠিয়া যায়। যদি অপেক্ষাকৃত সুবন্দোবস্ত না করা হয়, তবে পূর্বের ন্যায় ইহা হইতে মন্দ ফল ফলিবে। তজ্জন্য আমি যে কয়েকটি বন্দোবস্তের অবতারণা করিতেছি, তাহা কার্যে পরিণত হইলে নিশ্চয়ই সুফল উৎপন্ন হইবে। আমার মন্তব্যগুলি এই,—

"ছাত্রেরা সংস্কৃত ভাষায় কিছু পারদর্শিতা না দেখাইতে পারিলে তাহাদিগকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সংস্কৃত শ্রেণীর ছাত্রেরা সেই সঙ্গে তাহাদিগের নিজের শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করিবে। ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছাধীন না হইয়া অন্যান্য পাঠের ন্যায় অবশ্যপাঠ্য হইবে। কোন ছাত্র যদি ইংরেজী শিক্ষা করিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রদর্শন করে, তবে তাহার পক্ষে এই নিয়ম বলবৎ হইবে যে, পরে কোন সময়েই সে সংস্কৃতভাষা শিক্ষাকালীন ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারিবে না। তাহার জন্য অন্য একটি ইংরেজী শিক্ষার শ্রেণী সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব। সংস্কৃত শিক্ষার প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে সাহিত্যশ্রেণীর ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করিতেছি যে, অলঙ্কারশ্রেণীতেই ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ হউক। তাহা হইলে ছাত্রগণ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে অন্যূন দ্বিগুণ সময় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহাদিগের চিত্ত এক্ষণে সুমার্জিত হওয়াতে তাহাদিগকে সামান্য বিষয় হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না। অলঙ্কারশ্রেণী হইতে কলেজের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করিতে যাইলে ৭৮ বৎসর

লাগে। সুতরাং উক্ত সময়ের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ও শ্রমশীল ছাত্র অনায়াসেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে"।[২]

এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় দুই জন ইংরাজী ভাষার অধ্যাপকের (professor) পদের সৃষ্টি হইল। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ নভেম্বর দিবসে) ১০০৲ মাসিক বেতনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়ে শুভঙ্করী ব্যতীত বাঙলা ভাষায় ছাত্রগণের পাঠোপযোগী কোনও অঙ্কপুস্তক ছিল না। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত লীলাবতী ও বীজগণিত পঠিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী পাটীগণিত পাঠের ব্যবস্থা করেন। মফঃস্বলে এই সময়ে কতকগুলি বাঙলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী কোন বাঙলা পাটীগণিত না থাকায় প্রসন্নকুমার বাঙলাভাষায় পাটীগণিত প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। ১২৬২ সালে ২১ চৈত্র (১৮৫৫ খৃঃ অব্দে) প্রসন্নকুমারের পাটীগণিত প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তাঁহার বীজগণিত (Algebra) ও ক্ষেত্র ব্যবহার (Mensuration) রচিত হয়। বাঙলা ভাষায় গণিত বিষয়ক এই প্রথম গ্রন্থগুলি প্রসন্নকুমারের গভীর পাণ্ডিত্য, প্রবল মাতৃভাষানুরাগ ও শিক্ষাবিস্তারে অসীম আগ্রহের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ আজ কাল মাতৃভাষাই যে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহার ষাট বৎসর পূর্বে প্রসন্নকুমার কার্যত এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করা যে কতদূর দুঃসাধ্য তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যপরিষদ বহুবৎসর কাল এই কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই। এই অটল বাধাই মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার প্রধান অন্তরায়। প্রসন্নকুমার গণিতশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি উদ্ভাবিত করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি তাঁহার একটি প্রধান কীর্তিস্তম্ভ। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ, যাঁহারা বাঙলা ভাষায় গণিতপুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া প্রসন্নকুমারের নিকট ঋণী হইয়াছেন। প্রসন্নকুমারের জীবন ও কার্যের আলোচনা করিলে মনে হয় যদি যথার্থই আমাদের সাহিত্যরথিগণের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ থাকে এবং যথার্থই তাঁহারা মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির শিক্ষা প্রচারিত করিবার জন্য আগ্রহশীল হন, তাহা হইলে পরিভাষা নাই বলিয়া কালাতিপাত না করিয়া অধ্যবসায় সহকারে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করিতে পারেন।

যদিও প্রসন্নকুমার কখনও সাহিত্যক্ষেত্রে যশোলাভের চেষ্টা করেন নাই এবং তাঁহার সমস্ত শক্তি নীরবে জনহিতসাধনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তথাপি বাঙলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য পরোক্ষভাবে তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। প্রসন্নকুমার তাঁহার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি

করিবার জন্য প্রায়ই প্রোৎসাহিত করিতেন। তাঁহারই প্ররোচনায় তাঁহার তৎকালীন সর্বপ্রধান ছাত্র সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় জনসনের রাসেলাস্ ও বাণভট্টের কাদম্বরী বাঙলা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার ঐ অনুবাদ আদ্যন্ত সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রসন্নকুমার চিরদিন বাঙলা সাহিত্যের সেবকগণকে নানাপ্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। প্রসন্নকুমারের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন প্রসন্নকুমারের আবাসে অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রায়ই আসিতেন, "সেই ভাঙা মোটা গলায় মাইকেলের স্বরচিত গ্রন্থের স্মৃতিপথে চিরস্থায়ী পাঠ এখনও মনে আছে। তাহা কখনও ভুলিবার নয়।" তিনি আরও বলেন :

"ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাটীতে তখন এবং পরে কবি ও সাহিত্যিকের মেলা বসিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতালের প্রথম অংশ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের টেলিমেকস ও নীতিবোধ সেই বাটীতেই রচিত হয়। আমাদের স্বগ্রামবাসী এবং চাকরীর উমেদার পিতৃপিতামহপূজিত পাচকপ্রবর 'মধুসূদন' ডালে কাটি দিতে দিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটিজুতার শব্দ পাইলেই "উর্জয়িনী নগরে" চীৎকার শব্দে বেতালের পাঠাভ্যাস পরিচয় প্রদান করিতেন। মধুদাদা শিক্ষাবিভাগ উজ্জ্বল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং পিতার ও জ্যেষ্ঠতাতের পরমবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয় সে বিভাগের কর্তা। অনেক বিভাগের চাকরী এই প্রণালীতেই জোটে ; কিন্তু 'মধুদাদা চিরদিনই পাচকব্রতে ব্রতী থাকিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করেন। হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল ও বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সকল কবির গ্রন্থেরই প্রথম পাঠ আমাদের সেই দীনভবনে সম্পন্ন হইলে তবে পাণ্ডুলিপি মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা হইত। পিতৃদেবের সাহিত্যর্চার অবকাশ অল্পই ছিল ; রোগীর গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনের সময় গাড়িতে পড়িয়া তাঁহার ব্যাকরণ, কাব্য ও ধর্মশাস্ত্রে যেরূপ অধিকার জন্মিয়াছিল, কলেজে বা টোলে পড়িয়া অনেকের তাহা হয় না। "গাড়ীই" পিতৃদেবের ঠিকানা—তদানীন্তন রসিক বন্ধুগণের মতে সিদ্ধান্ত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে আহারের সময়েও সাহিতচর্চ্চা চলিত। মধ্যাহ্নভোজনের সময় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সুবিপুল গৌরকান্তি দেহ ভূমিতলসংলগ্ন করিয়া বঙ্গসুন্দরীকে যখন আসরে নামাইতেন, সে দৃশ্য ভুলিবার নয়। আর হেমচন্দ্রের মোটা গলার ভারতসঙ্গীত-আবৃত্তি যে শুনিয়াছে সে অমর পদবী লাভের যোগ্য। বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী পিতৃদেবের নামে উৎসৃষ্ট হয়। নিসর্গসুন্দরী, সারদামঙ্গল, সঙ্গীতশতক প্রভৃতির প্রথম পাঠও এই আসরে হইত। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও রামকমলের বেকনসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি পাঠও শুনিয়াছি। উত্তরকালে পিতৃগৃহতাড়িত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই বাসায় বাস করিয়া যখন আমাদিগকে ধন্য করিয়াছিলেন তখন তাঁহার "নির্বাসিতের বিলাপ" পাঠ নিজমুখে শুনিয়া তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছি। ব্র্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল এই সভায় স্বীয় লাঙ্গুল বিস্তার প্রথম করেন।

নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়ের অর্থশাস্ত্র ও গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রীর নানা স্মৃতিশাস্ত্রের অনুবাদ, প্রসন্নকুমারের পাটীগণিত, বীজগণিত, রাজকুমারের ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী ও হিন্দু দায়াদাধিকার এই বৈঠকখানাতেই রচিত হয়। রজনীকান্ত গুপ্তের পাণিনি, জয়দেব এবং সিপাহীবিদ্রোহের কাহিনী এইখানেই প্রথম দিবালোক দর্শন করে।

* * *

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, তারাশঙ্কর, তারাকুমার, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ ন্যায়রত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ স্বীয় রচনার অনেক পাণ্ডুলিপি এই বৈঠকেই পেশ করিয়া বংশকে ধন্য করিতেন। শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের হাতে খড়িও এইখানে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যিক অবস্থার পদধূলিও অনেক সময় এইখানে পড়িয়াছে। মনোমোহন ঘোষ, তারক চন্দ্র পণ্ডিত এবং সদ্যোসিবিলসার্ভিসচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের রাজনৈতিক জল্পনাও উত্তরকালে অনেক সময় এইখানে হইত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ভিত্তিকল্পে পাল্‌কী করিয়া সুরেন্দ্রবাবু অনেক সময় আসিতেন। সময়, ভারতবাসী, ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি সংবাদপত্র এইখান হইতে পরিচালিত হইত। ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা, মনোরমা, তারাবাই, অশ্রুবিলাপ প্রভৃতি রমণীরচনার সমাদর ও সম্বর্ধনাও এইখানে হইত।

প্রসন্নকুমারের ইংরাজী ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই এরূপ অসাধারণ অধিকার ছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া একবার বলিয়াছিলেন যে তিনি প্রসন্নকুমারকে কখনও "খিচুড়ি ভাষায়" কথা কহিতে দেখেন নাই। যখন তিনি ইংরাজীতে কথা কহিতেন তখন বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা কহিতেন ; যখন বাঙলায় কথা কহিতেন, বিশুদ্ধ বাঙলায় কথা কহিতেন, একটিও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন ইংরাজীশিক্ষিত বাঙলার মধ্যে ভাষার উপর এরূপ অধিকার তিনি অধিক দেখেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবগুলি ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলে প্রসন্নকুমারকেই এই অনুবাদের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং যাঁহারা তাহা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে সেই অনুবাদ কার্য কিরূপ সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল।

পূর্বানুবৃত্তি ও শেষ

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিষ্টার ইয়ং এর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তেজস্বী বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন।

বিখ্যাত পণ্ডিত ই.বি. কাউয়েল মহোদয় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের কার্যের উপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কর্মভার গ্রহণ করিলেন। প্রসন্নকুমারের বিবিধ গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া মহাত্মা কাউয়েল তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। প্রসন্নকুমারের একটি ইংরাজী প্রস্তাব সম্বন্ধে অধ্যক্ষ কাউয়েল কিরূপ উচ্চমত পোষণ করিতেন, তাহা স্যার গুরুদাসের উক্তি হইতে পূর্বেই পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী বিভাগে নানা উন্নতি সাধিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথমবারের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রসন্নকুমারের ছাত্রগণ এরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিল যে সংস্কৃত কলেজের এবং শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ মুক্তকণ্ঠে প্রসন্নকুমারের প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের ঐকান্তিক চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজে এফ-এ ও বি-এ পড়াইবার ব্যবস্থা হয় এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরম স্নেহভাজন ছাত্র আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রথম বি-এ উপাধি লাভ করেন। ইঁহার পর শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসন্নকুমারের অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ যে ইংরাজী বিদ্যায় এরূপ পারদর্শী হইবেন ইহা প্রসন্নকুমারের সংস্কৃতকলেজে আগমনের পূর্বে কেহ স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই।

স্বয়ং প্রতীচ্য বিদ্যার অমূল্যরত্নের অধিকারী হইয়া প্রসন্নকুমার চিরদিনই স্বদেশবাসীর মধ্যে অকাতরে এই রত্ন বিতরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার আয় যৎসামান্য, তখনও উহার অনেকাংশ তিনি দরিদ্র বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য নিয়োজিত করিতেন। বৃত্রসংহারের মহাকবি হেমচন্দ্র, যিনি উত্তরকালে হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া "হপ্তায় হাজার দিতেন ব্যাঙ্কের খাতায়" তিনি বাল্যকালে প্রসন্নকুমারের স্নেহ ও অর্থসাহায্য না পাইলে দারিদ্রচক্রের নিষ্পেষণে কি হইতেন তাহা বলা যায় না। হেমচন্দ্রের ন্যায় কত বালক যে প্রসন্নকুমারের সাহায্য লাভ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। প্রসন্নকুমারের সমসাময়িক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলেন যে তাঁহার হিসাবের খাতা অতি চমৎকার ছিল। তাহাতে নিজের সংসার খরচ অতি সামান্যই লিপিবদ্ধ হইত, উহার অধিকাংশ স্থানই দরিদ্র ছাত্র এবং অনাথা বিধবাগণকে প্রদত্ত দানে পরিপূর্ণ থাকিত।

আজিকালি স্বদেশসেবার অর্থ নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শহরে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করা। ম্যালেরিয়ায় নিজগ্রাম উৎসন্ন যাউক তাহাতে দৃষ্টিপাত করিবে না, রাজধানীতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে হইবে "ম্যালেরিয়া দূর কর, ম্যালেরিয়া দূর কর।" শিক্ষাবিস্তারের জন্যও এইরূপ চীৎকার করা এবং গভর্নমেণ্ট অধিকতর অর্থ সাহায্য করিতেছেন না বলিয়া অনুযোগ করাই আমরা স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করি। প্রসন্নকুমার এরূপ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না। তিনি 'বাক্যবীর' ছিলেন না, কর্মবীর ছিলেন। গভর্নমেণ্টকে বা সাধারণকে জানাইয়া দান করিয়া আপনার নাম

বিঘোষিত করিবার চেষ্টা তিনি কখনও করেন নাই। পরোপকার করা তিনি তাঁহার ধর্ম বলিয়া মানিতেন এবং চিরদিন যথাসাধ্য তিনি পরোপকারব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে তিনি একশত টাকা মাসিক বেতনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বৎসর—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১ মার্চ তিনি দুইশত টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী বিভাগের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নকুমার বহুদিনপোষিত একটি বাসনা চরিতার্থ করিবার উপায় দেখিতে পাইলেন। তিনি বহুদিন হইতে নিজগ্রাম খানাকুল কৃষ্ণনগরে সংস্কৃত কলেজের আদর্শে একটি বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া দেশের একটি প্রধান অভাব দূর করেন। এই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি স্বয়ং সানন্দে বহন করিতেন। বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বলিলে ঠিক বলা হয় না—অনেক সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরও ব্যয়ভার বহন করিতে হইতে। হিন্দু পেট্রিয়টের স্বনামধন্য সম্পাদক রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর একস্থানে লিখিয়াছেন যে অনেক স্থলেই দরিদ্র ছাত্রগণকে প্রসন্নবাবু যে কেবল বিনাবেতনে তাঁহার বিদ্যালয়ে পড়াইতেন তাহাই নহে, তাহাদের পুস্তক কাপড় প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দিতেন এবং বর্ষাকালে পাথেয়ও দিতেন। এই বিদ্যালয় "প্রসন্ন বাবুর বিদ্যালয়" নামে সাধারণ্যে পরিচিত ছিল। প্রসন্নকুমার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শ্যামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রথিতনামা শিক্ষকগণকে এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র কৃতিত্ব প্রদর্শন করিত প্রসন্নকুমার তাহাদিগকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া নিজব্যয়ে তাহাদিগের উচ্চতর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেন। দ্বারকেশ্বর নদীর তটভূমিতে অবস্থিত প্রসন্নকুমারের সেই সুসজ্জিত বিদ্যালয়ভবনে উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রভৃতি মনীষীগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। গ্রীষ্মাবকাশে বিদ্যালয়ে অবকাশ ছিল না, কারণ সেই সময়ে প্রসন্নকুমার স্বয়ং ছাত্রগণকে পড়াইতেন। তাঁহার এই বিদ্যালয় অল্পদিনেই একটি আদর্শ বিদ্যালয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। গভর্নমেণ্ট এই বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া একবার নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু এইরূপ সাহায্য গ্রহণ করিলে গভর্নমেণ্টের নিয়মের অধীন হইয়া বিদ্যালয় পরিচালিত করিতে হইবে বলিয়া স্বাধীনপ্রকৃতি প্রসন্নকুমার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

আজি দ্বারকেশ্বর প্রসন্নকুমারের সেই বিদ্যালয়গৃহ গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু বহুবৎসরকাল উহা শিক্ষাপ্রয়াসব্রত পরোপকারী পণ্ডিত প্রসন্নকুমারের কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিরাজিত ছিল এবং উহার ইতিহাস চিরদিন তাঁহার দেশবাসীর অন্তরে এক গৌরবময় স্মৃতি জাগরিত করিবে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা কাউয়েল ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে তাঁহারই নির্দেশানুসারে প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। বলা বাহুল্য এই পদের জন্য

তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি অতি অল্পই ছিল। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের মহত্তম গৌরবের দিন গিয়াছে। দর্শনাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, অলঙ্কারশাস্ত্রাধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, সাহিত্যাধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ব্যাকরণাধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্রাণকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সানন্দে প্রসন্নকুমারের নেতৃত্বে কার্য করিয়া সংস্কৃত কলেজের সুনাম ও গৌরব শতগুণে বর্ধিত করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার কায়স্থবংশসমুদ্ভূত হইলেও এই সকল দেশবিখ্যাত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন, কারণ প্রসন্নকুমারের মহাভারতোক্ত ব্রাহ্মণের গুণগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্তমান ছিল।—

জিতেন্দ্রিয়ো ধর্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ
কামক্রোধৌ বসে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।।

এই সময়ে একটি ভয়ানক পারিবারিক দুর্ঘটনায় প্রসন্নকুমার অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। একদিন অকস্মাৎ বিসূচিকারোগে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী দেহত্যাগ করেন। ইনি হরিপালনিবাসী হলধর ঘোষের কন্যা, এবং অতিশয় ধর্মপরায়ণা পতিব্রতা ও গুণবতী রমণী ছিলেন। ইঁহার গর্ভে প্রসন্নকুমারের একটি মাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের অন্যতম প্রিয় শিষ্য আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেন যে প্রসন্নকুমারের পত্নীবিয়োগ হইলে কৃষ্ণকমল শ্মশান পর্যন্ত তাঁহার শবের অনুগমন করিয়াছিলেন। পত্নীবিয়োগে প্রসন্নকুমারকে নিরতিশয় কাতর দেখিয়া তাঁহার কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে সান্ত্বনালাভের জন্য কিছুদিন স্থানান্তরে যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কর্মব্রত প্রসন্নকুমার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"উহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল"—এবং কর্মেই, তিনি যথার্থ সান্ত্বনা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার একদিকে যেমন কুসুমাপেক্ষা কোমল ছিলেন, অপরদিকে তিনি বজ্রাদপি কঠিন ছিলেন। দরিদ্র ও বিপন্নের দুঃখে যেমন তিনি বিগলিতহৃদয় হইতেন, অন্যায়ের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার সময় তিনি সেইরূপ কঠোর মূর্তি ধারণ করিতে পারিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্ব ও স্বাধীন প্রকৃতির একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় এইবার আমরা প্রদান করিব।

সেকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের স্বতন্ত্র গৃহ না থাকায় সংস্কৃত কলেজ গৃহের একাংশেই উক্ত কলেজ অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত কলেজ গৃহের দ্বিতলে একটি প্রশস্ত গৃহে অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুঁথি রক্ষিত হইত। পৃথিবীর আর কোথাও এইরূপ বহুমূল্য সংস্কৃত পুঁথির সংগ্রহ ছিল না এবং প্রসন্নকুমার উহা অমূল্যরত্নজ্ঞানে অতি যত্নে তাহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিষ্টার সাটক্লিফের সংস্কৃত কলেজের এই প্রশস্ত গৃহটির প্রতি লোভ হইল। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে সংস্কৃত পুঁথিগুলি নীচের একটি ঘরে রাখা হউক এবং উপরের প্রশস্ত

গৃহটি প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যবহারার্থ প্রদত্ত হউক। অবশ্যই প্রসন্নকুমার ঘোর আপত্তি করিলেন। তিনি বুঝাইলেন যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে সকল প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নতলে রাখিলে উহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু সাটক্লিফ তাঁহার যুক্তিতর্ক শুনিলেন না। তিনি শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ (Director) এটকিন্সনের সহিত কৌশল করিয়া ছোটলাট সার সিসিল বীডনকেও হস্তগত করিলেন। আদেশ হইল সংস্কৃত পুঁথিগুলি নিম্নতলস্থ একটি কক্ষে রক্ষিত হইবে। বহুমূল্য প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিগুলি অযত্নের সহিত নিম্নতলস্থ গৃহে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া প্রসন্নকুমার আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি তদ্দণ্ডেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দুর্লভ পদ ত্যাগ করিয়া গভর্নমেণ্টে পত্রপ্রেরণ করিলেন। প্রসন্নকুমারের আর কোন বিশেষ আয় ছিল না, পক্ষান্তরে এই চাকুরিলব্ধ আয় (তখন মাসিক ২৫০) হইতে তাঁহার আশ্রিতগণকে এবং প্রাণতুল্যপ্রিয় স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়টি রক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই ত্যাগের মূল্য যে কত তাহা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এবং তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি ও বিরাট মনুষ্যত্বের নিকট আমাদের হৃদয় সহজেই শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে অবনত হইয়া পড়ে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৪ এপ্রিল দিবসে প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিলে উক্ত কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী বিষাদসাগরে নিমগ্ন হন। প্রসন্নকুমারের অনুপস্থিতিতে সংস্কৃত কলেজে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তদানীন্তন ছোটলাট সার সিসিল বীডন প্রসন্নকুমারকে তাঁহার পদত্যাগের পত্রখানি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু প্রসন্নকুমার নিজ মত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। অতঃপর গভর্নমেণ্ট প্রেসিডেন্সী কলেজের দুইজন নবীন অধ্যাপককে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কার্যভার প্রদান করিলেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান মিঃ সান্ডার্স—তিনিও কলেজে শৃঙ্খলাস্থাপন করিতে অকৃতকার্য হইলেন। এই সময়ে পুণ্যস্মৃতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্যর সিসিল বীডনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। অন্যান্য কথার পর সংস্কৃত কলেজের কথা উঠিল। স্যর সিসিল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নতুন ব্যবস্থানুসারে সংস্কৃতকলেজের উন্নতি হইয়াছে—সে সম্বন্ধে তিনি কোন সংবাদ রাখেন কি না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "আপনাদের ব্যবস্থায় আমার একটি গল্প মনে পড়িল। কোন বিলাসী ধনী তাঁহার বাটীতে গান করিবার জন্য কোন কর্মচারিকে আদেশ দেন একটি সুন্দরী ষোড়শী গায়িকা লইয়া আইস। অনেকক্ষণ পরে সেই কর্মচারি দুইটি আটবৎসর বয়স্কা বালিকা লইয়া উপস্থিত হইয়া প্রভুকে বলিল যে ষোড়শীবর্ষীয়া একটি সুন্দরী গায়িকা না পাওয়ায় দুইটি আট বৎসর বয়স্কা বালিকা আনিয়াছি। সংস্কৃত কলেজের একজন অভিজ্ঞ অধ্যক্ষকে অপসারিত করিয়া দুইজন নবীন অধ্যাপককে উহার দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার প্রদান করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সংস্কৃত কলেজে বাস্তবিকই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে।" অতঃপর

স্যার সিসিল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন যে, কোন প্রকারে প্রসন্নকুমারকে তিনি পুনরায় কর্মগ্রহণ করিতে স্বীকার করাইতে পারিলে তিনি আনন্দিত হইবেন। প্রসন্নকুমার পুনরায় অনুরুদ্ধ হইলে তিনি এই সর্তে পুনরায় কর্ম গ্রহণ করিবার স্বীকার করিলেন যে হয় পুঁথি রক্ষার্থ সংস্কৃত কলেজ ভবনের দ্বিতলের প্রশস্ত কক্ষটি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে নতুবা দ্বিতলে একটি নূতন পুস্তকাগার নির্মিত করিয়া দিতে হইবে। গভর্নমেণ্ট প্রসন্নবাবুর সর্তে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজ গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম কোণে দুইটি প্রশস্ত কক্ষ নির্মিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি প্রসন্নকুমারকে পুনর্নিযুক্ত করিবার সময় বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী সাহিত্যিক ও পরিহাসরসিক স্যার এশলি ইডেন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, "Now that the 'battle of books' is over, Babu Prasannakumar may be reappointed &c."

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১ সেপ্টেম্বর প্রসন্নকুমারের পুনর্নিয়োগে সকলেই আনন্দিত হইলেন। এই উপলক্ষে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ সণ্ডার্স সাহেবের সমক্ষেই উল্লাসধ্বনি করিতে করিতে মহাসমারোহে 'হরির লুট' দিয়াছিলেন এবং খানাকুল কৃষ্ণনগরের বিদ্যালয় শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী কর্তৃক বিবিধ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। সেদিন প্রসন্নকুমারের অসংখ্য ভক্তের আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

ইহার পর তেজস্বী প্রসন্নকুমারের নির্ভীক স্বাধীন অভিমত চিরদিন গভর্নমেণ্ট যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উড্রো প্রভৃতি চিরঃস্মরণীয় শিক্ষাধ্যক্ষগণ মুক্তকণ্ঠে প্রসন্নকুমারের কার্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিভাগে উত্তরোত্তর প্রসন্নকুমারের পদবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে তাঁহার বেতন মাসিক ৩০০্ টাকা, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৯ সেপ্টেম্বর হইতে তাঁহার বেতন ৫০০্ টাকা ; ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১৯ সেপ্টেম্বর হইতে তাঁহার বেতন ৫৫০্ টাকা এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৯ সেপ্টেম্বব হইতে তাঁহার বেতন ৬০০্ টাকা হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের এত বেশী বেতন প্রদত্ত হইবে না বলিয়া 'কাগজে কলমে' ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৯ সেপ্টেম্বর হইতে তিনি রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধি ইনেস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ৬০০্ টাকা বেতন হইবার পর আর তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে রাখা হইল না। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ২১ মার্চ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রসন্নকুমার বহরমপুরের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। উক্ত বৎসর ১৪ মে তারিখ হইতে প্রসন্নকুমার বেঙ্গল এডুকেশনাল সার্ভিসে ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৮ জুন দিবসে ইনি প্রেসিডেন্সী কালেজে সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রসন্নকুমার রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমারের পিতৃবিয়োগ ঘটে, এ কথা যদুনাথ সর্বাধিকারীর পরিচয়-প্রসঙ্গে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রসন্নকুমার পিতৃবিয়োগে অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। তিনি মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ এই শ্রাদ্ধসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। দীনদরিদ্রকে প্রসন্নকুমার এই উপলক্ষে অকাতরে অর্থ ও অন্নবস্ত্র দান করিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমারের প্রথমা পত্নী একটিমাত্র কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পূর্বে প্রসন্নকুমার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এইবার বসো-বেলমুড়া নিবাসী রায় বিশ্বম্ভর সিংহ মহাশয়ের কন্যা সুরঙ্গিনী দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। প্রসন্নকুমার তাঁহার এই পত্নীকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে *সুরঙ্গিনী দেবী* প্রণীত *তারাচরিত* নামক গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটি উদ্ধারযোগ্য :

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় করকমলেষু—
স্বামীন,

আমার যে লেখাপড়া শিক্ষা হওয়া তাহা আপনার যত্নেই হইয়াছে। আপনি যত্ন না করিলে আমার বিদ্যা শিক্ষা হওয়া ভার হইত। আমার বিদ্যাচর্চা দেখিয়া আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ইহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হই। একদা তারাবাই নামক নাটকখানি আমি পাঠ করিতেছি দেখিয়া আপনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কেমন পড়িলে ! আমি বলিলাম যে গ্রন্থকার যদি নাটক না লিখিয়া আখ্যায়িকা লিখিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। আমি বলিবামাত্র আপনি বলিলেন যে তুমিই কেন লেখ না। শুনিয়া আকাশ পাতাল ভাবনা হইল। মনে করিলাম যে আমাকে অধমা নারী ভাবিয়া তামাসা করিলেন। কি করি ভাবনা প্রবল হইল। এদিকে স্বামী-বাক্য অলঙ্ঘনীয় ভাবিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। লেখা সমাপ্ত হইলে আপনাকে শুনাইলাম। শুনিয়া আপনি আহ্লাদিত হইলেন। তাহাতেই আমি স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম। এতদিনে আমার বিদ্যাশিক্ষা সার্থক হইল। এখন আপনার হস্তে আমার এই তারাকে অর্পণ করিলাম। আপনার চরণে স্থান পাইলেই যথেষ্ট হইবে। আমার আশা মহৎ হইল বটে, কিন্তু কি করি। সমুদ্রে সকল নদীই যায়, কেহই ত বিমুখ হয় না, আমি সেই ভাবিয়া অগ্রসর হইলাম। ইতি—

১৫ আশ্বিন   নিয়ত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী
১২৮১ সাল।   শ্রীমতী সুরঙ্গিনী

প্রসন্নকুমারের এই দ্বিতীয়া বিদূষী ও সাধ্বী পত্নীর গর্ভে তাঁহার তিন কন্যা ও এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা জ্যোতিষ্মতীর সহিত শোভাবাজারের বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব

বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও পরমবন্ধু রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীমতী রাণী জ্যোতিষ্মতী দেবী সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও বিদুষী রমণী। ইনি অনেকগুলি সুন্দর কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙলাসাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের চিরপ্রসিদ্ধ সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইঁহার সন্তানগণও পিতা ও মাতামহের বিনয় ও বিদ্যার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

প্রসন্নকুমার তাঁহার বহুকষ্টার্জিত পেন্সন অধিককাল ভোগ করিতে পারেন নাই। ২০ মাস পেন্সন ভোগ করিতে না করিতেই ৬২ বৎসর বয়সে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর, বাঙলা ১২৯৩ সাল ২০ কার্তিক) জগদ্ধাত্রী পূজার দিন দিবা ৪টা ৪০ মিনিটের সময় নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।

প্রসন্নকুমার বহুগুণের আধার ছিলেন। তাঁহার তুল্য বিনয়ী, নিরহঙ্কার, ধর্মভীরু, অমায়িক ও সদালাপী ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি অকৃত্রিম স্বদেশবৎসল ছিলেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিকল্পে চিরদিন নীরবে কার্য করিয়াছেন। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না। সর্বশাস্ত্রেই তাঁহার সমান অধিকার ছিল। তিনি ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপনা করিলেও সংস্কৃত ও বাঙলায় পণ্ডিত ছিলেন এবং গণিতশাস্ত্রে এতদূর তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল যে এক সময়ে কিছুকাল উক্ত শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও এম-এ পরীক্ষার্থীকে দুরূহ বিষয়ে উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতীত হয় যে তিনি চিরদিন বিদ্যাচর্চা করিতেন। তিনি কিরূপ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং মাতৃভাষায় উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে তিনি কি করিয়াছিলেন পূর্বেই তাহা উক্ত হইয়াছে। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহার কিরূপ আগ্রহ ছিল এবং স্বীয় আয়ের অধিকাংশ কিরূপে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয় করিতেন তাহারও পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। প্রসন্নকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের একজন সদস্য ছিলেন এবং গণিত শাস্ত্রের পরীক্ষক ছিলেন। প্রসন্নকুমার পিতৃভক্ত পুত্র, সন্তানবৎসল জনক এবং প্রেমময় স্বামী ছিলেন। তাঁহার দাম্পত্যজীবন অতিমধুময় ছিল। তাঁহার ভ্রাতৃবাৎসল্য অসীম ছিল। শৈশবে মাতৃহীন ভ্রাতৃগণকে তিনি কিরূপে "মানুষ" করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বঙ্গবিখ্যাত ভ্রাতৃগণের জীবনকাহিনীতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। নীলমণি কুমার মহাশয় একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে প্রসন্নকুমার যদি কোন সাধারণ হিতকর কার্য না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার ভ্রাতা সূর্যকুমারকে দিয়া যাইতেন তাহা হইলেও বাঙলাদেশ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিত। বাস্তবিক যেরূপ স্নেহ ও যত্নসহকারে প্রসন্নকুমার তাঁহার মাতৃহীন ভ্রাতৃগণকে সুশিক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহাদের চরিত্র গঠিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিবাৎসল্য অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সমুচিত বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

প্রসন্নকুমারের তেজস্বিতা ও স্বাধীন প্রকৃতির পরিচয় আমরা পূর্বেই প্রদান করিয়াছি। কিন্তু প্রসন্নকুমারের একটি গুণের তুলনায় তাঁহার অন্যান্য সকল গুণ নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা তাঁহার দয়া ও দাক্ষিণ্যের কথা বলিতেছি। পরোপকার যেন প্রসন্নকুমারের একমাত্র ব্রত ছিল, এবং এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি নিজের ও নিজপরিবারের সহস্র অসুবিধা উপেক্ষা কবিতেন। দবিদ্র ও বিপন্নের সাহায্যার্থ তাঁহার দক্ষিণহস্ত সর্বদা প্রসারিত থাকিত। শেষ জীবনে তিনি সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতন পাইতেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার পাটীগণিত ও বীজগণিত পুস্তকবিক্রয় দ্বারাও যথেষ্ট আয় হইত। তখন জীবনধারণোপযোগী উপকরণাদিও এত মহার্ঘ ছিল না। কিন্তু যখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন এই বিলাসবিদ্বেষী আড়ম্বরশূন্য মহাত্মা তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য কিছুই সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা হইতে পাঠকগণ প্রসন্নকুমারের দানের পরিমাণ অনুমান করিতে পারিবেন। যে বৎসর প্রসন্নকুমার ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা পরিত্যাগ করেন সেই বৎসর তাঁহার ভ্রাতা সূর্যকুমার উক্ত কলেজ হইতে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমারই সূর্যকুমার ও তাঁহার সতীর্থ জগদ্বন্ধু বসু মহাশয়কে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন। উভয়েই কিরূপ সুচিকিৎসক হইয়াছিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সূর্যকুমারকে চিকিৎসক করিবার আর্তবন্ধু প্রসন্নকুমারের এক গূঢ় উদেশ্য ছিল। দরিদ্র ছাত্র বা শিক্ষক পীড়িত হইলে প্রসন্নকুমার তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহাদের বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিতে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে কত দরিদ্র ছাত্র ও শিক্ষক মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

প্রসন্নকুমারের তিরোধানে সমগ্র বঙ্গদেশ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন সরকারী সর্বাধ্যক্ষ পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার উইলিয়াম হাণ্টার উপাধি' বিতরণ উপলক্ষে আহূত সভায় প্রসন্নকুমারের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন :

"But chiefly we lament the loss of Babu Prasanna Kumar Sarvadhikari—the erudite Principal of the Sanskrit College, the conscientious custodian and spirited defender of its precious manuscripts, the ingenious mathematician who translated the Arithmatic and Algebra of Europe into the Vernacular of Bengal."

প্রসন্নকুমারের অসংখ্য ভক্তগণ তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র সংস্কৃত কলেজে তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১২ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের পুরস্কার বিতরণ সভায় বাঙলা গভর্নমেণ্টের তদনীন্তন চীফ্ সেক্রেটারী মাননীয় মিঃ ডব্লিউ বোণ্টন মহোদয় উক্ত প্রতিকৃতি উন্মোচিত করিবার

সময় প্রসন্নকুমারের বিবিধ সদ্‌গুণনিচয়ের উচ্চ প্রশংসা করিয়া দেশবাসীগণকে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'প্রসন্নকুমার স্মৃতি-সমিতি' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার নামে একটি মেডেল প্রদানেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই এই পদক প্রাপ্ত হন।

প্রসন্নকুমার তাঁহার গভীর স্বদেশানুরাগ ও শিক্ষাবিস্তারে অসীম উৎসাহের কয়েকটি সজীব স্মৃতিস্তম্ভ স্বয়ং রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই অকৃত্রিম স্বদেশবাৎসল্য ও বিদ্যোৎসাহ সর্বাধিকারী পরিবারের অনেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন। প্রসন্নকুমারের তিরোধানের পরেও, ডাক্তার সূর্যকুমার, ডাক্তার স্যার দেবপ্রসাদ, ডাঃ সুরেশপ্রসাদ, রাজকুমার ও জ্যোতিঃপ্রসাদ একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে সর্বাধিকারী বংশের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুরাগের তথা শিক্ষা বিস্তারে অসীম আগ্রহ ও উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। আর কোন পরিবারে একই সময়ে এতগুলি সুপণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন নাই। প্রসন্নকুমারের ছাত্রপ্রতিম ভ্রাতৃষ্পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সরকারী কর্মাধ্যক্ষ মাননীয় ডাক্তার স্যর দেবপ্রসাদ এবং ডাক্তার সুরেশপ্রসাদকে প্রসন্নকুমারের সঞ্জীব স্মৃতিচিহ্ন বলা যাইতে পারে। প্রসন্নকুমারের এই স্মৃতিস্তম্ভগুলি বহুদিন সগৌরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখুন এবং দেশবাসীকে নবজীবনে উদ্বোধিত করুন।

সূত্রাবলি

[১] সন ১০২৩ সালের কার্তিকের যমুনায় আমরা কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের জীবন-কথা প্রকাশিত করিয়াছি। লেখক।

[২] রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর'।
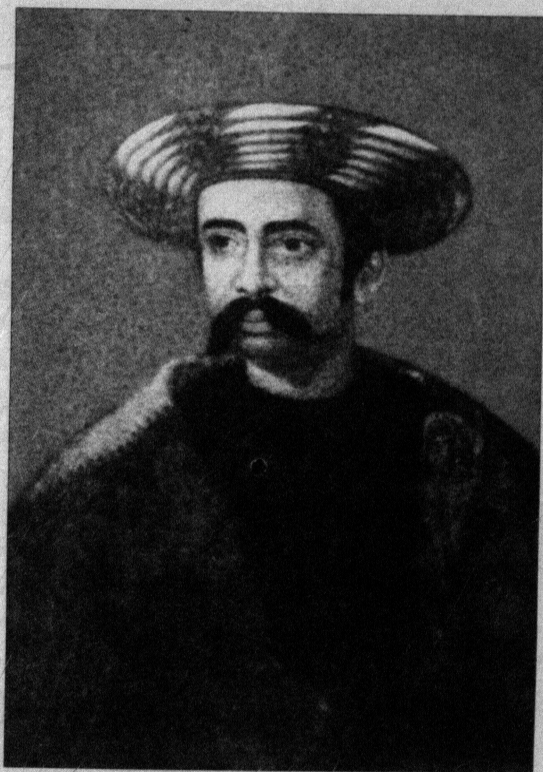
কৈলাসচন্দ্র বসু

মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু

উপক্রমণিকা

এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম যুগে আমাদের মৃতপ্রায় সমাজে এক নূতন জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কি ধর্ম সংস্কারে, কি সমাজ-সংস্কারে, কি শিক্ষাবিস্তারে, কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে, নূতন ও মহান আদর্শ বহন করিয়া অনেকগুলি একনিষ্ঠ সাধক অবিচলিত উৎসাহ, অসীম আগ্রহ, অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সহিত, অপূর্ব প্রতিভা ও অতুল শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে যুগে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ধর্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছিল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী রাজনীতিকগণ আবির্ভূত হন, রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি মনীষীগণ জন্মগ্রহণ করেন, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণের উদ্ভব হয়, সেই অসামান্য মানসিক উদ্দীপ্তির যুগের বিস্তৃত ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইতিহাসের অভাবেই হউক বা উপকারকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অভাবেই হউক, যে সকল অগ্রণীর হৃদয়-শোণিতে আমাদের ধর্ম ও সমাজ পুষ্ট হইয়াছে, শিক্ষা-প্রণালী উন্নত হইয়াছে, রাজনীতিক অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে, জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্ধ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই আমরা তাঁহাদের অনেকেরই সাধনা ও আত্মত্যাগের কথা, অনেকেরই কীর্তিকাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছি। যে প্রতিভাশালী বাঙালির নাম লইয়া আজি আমরা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার নাম অনেকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত। অথচ পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে এই অকৃত্রিম সাহিত্য-সেবক, দেশপ্রিয় বাগ্মী ও স্থিত প্রাজ্ঞ জননায়কের নাম শিক্ষিত বাঙালির নিত্যস্মরণীয় ছিল। বেথুন সোসাইটি নামক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সভার সুযোগ্য সম্পাদকরূপে

তিনি দীর্ঘকাল ইউরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ বিরাজিত ছিলেন। তিনি শক্তিশালী লেখক ছিলেন এবং যেখানেই তিনি দেখিতেন—

"দুর্বল হইছে চূর্ণ প্রবলের বিজয় গৌরবে।"

সেইখানেই তিনি দুর্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সমগ্র শক্তির সহিত প্রবলকে আক্রমণ করিতেন। দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য, তিনি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ঢক্কানিনাদে আত্মঘোষণা না করিয়া তিনি নীরবে যথাশক্তি দেশের সেবা করিতেন। তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত জননায়কগণই চরিত্রের মহত্ত্বে, নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্যে, নির্ভীক দেশপক্ষ-সমর্থনে, ও অপূর্ব ন্যায়নিষ্ঠায় ইউরোপীয়দিগের নিকট আমাদের জাতীয় সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাদিগকে সমগ্র জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ করিয়াছিলেন ; তাহাতে দেশের যে কি মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের সামাজিক ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবে। আমরা দীর্ঘ ভূমিকা অপ্রয়োজনীয় বোধে সংক্ষেপে এই বিস্মৃতকীর্তি বাঙালির পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইব।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র কলিকাতার একটি অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ বসু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং সমসাময়িক সমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র ছিল এবং দানশীলতার জন্য তিনি তৎকালীন সমাজে সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী ছিলেন এবং শিষ্টাচারে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি অতি বিরল ছিল। দরিদ্র-পালন ও অতিথি-সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার অতিথিশালায় যত অতিথি আসিতেন কেহই বিফল-মনোরথ হইতেন না, সকলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিতেন। শুনা যায়, অতিথিগণের নিক্ষিপ্ত পাতা ও গেলাসে অতিথিশালার পুষ্করিণীটি প্রায় বুজিয়া গিযাছিল। তিনি সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া বিষয়কার্য করণান্তর, সন্ধ্যাকালে অতিথি কেহ অভুক্ত আছেন কি না দেখিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন। ভবানীচরণের পত্নী ভুবনেশ্বরীও তাঁহার স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন। ভবানীচরণের চারি পুত্র—রামনিধি, রামতনু, রামমোহন ও ফকীরচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ রামনিধি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য করিতেন। ইনিও পিতার ন্যায় চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। ইঁহাদের বাটীর সম্মুখস্থ রামতনু বসুর লেন, মধ্যম ভ্রাতা রামতনুর সামাজিক প্রতিপত্তির পরিচায়ক। রামনিধির চারি পুত্র ছিল—জ্যেষ্ঠ হরলাল, মধ্যম দুর্গাচরণ, তৃতীয় নন্দলাল ও কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র।

হরলালের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ কৈলাসচন্দ্র ও কনিষ্ঠ যদুনাথ। জ্যেষ্ঠ কৈলাসচন্দ্রের জীবনকাহিনী বিবৃত করাই বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা

শৈশবে কৈলাসচন্দ্র নবীন মাধব দে কর্তৃক পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন। তাঁহার ছাত্রজীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি ও উহার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় সম্বন্ধে দুই-একটি কথা এইস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উচ্চশিক্ষা

ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি ও গৌরমোহন আঢ্য। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ২০ জানুয়ারি দিবসে গৌরমোহন আঢ্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। বাল্যকালে তিনি সামান্য শিক্ষাই প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি সাধু ও ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বদেশপ্রেম ও জনহিতৈষণার জন্য, বিশেষত এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের একজন প্রধান উদ্যোগী বলিয়া, তিনি দেশবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে Calcutta Literary Observer নামক অধুনাবিলুপ্ত একটি পত্রে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারির যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈমাসিকের ত্রয়োদশ খণ্ডে একজন লেখক তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের 'কলিকাতার ইতিহাসে' উহা পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। আমরাও এস্থলে উহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :

> সপ্তবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি (গৌরমোহন) উপার্জনের জন্য কোন সুবিধাজনক পথ না দেখিয়া স্বদেশীয়দিগের নিমিত্ত একটি স্কুল স্থাপন করিলেন এবং কয়েক বৎসর অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার ছাত্র-সংখ্যা যখন প্রায় ২০০ হইয়া উঠিল, সেই সময়ে তিনি টার্নবুল নামক এক সাহেবকে অংশী করিয়া লইলেন। ইহার পর ক্রমশই তাঁহার স্কুলের উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার অংশীর মৃত্যুর পর হইলে তাঁহার নিজ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি অতি দক্ষতার সহিত নিজ তত্ত্বাবধানে স্কুলের কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি হার্মান জিওফ্রি নামক একজন দুঃস্থ ব্যারিস্টার প্রাপ্ত হন ; সেই ব্যারিস্টারের উৎকৃষ্ট শিক্ষায় গৌরমোহনের স্কুল বিলক্ষণ প্রাধান্য লাভ করিল। গৌরমোহনকে দেখিলেই ধর্মভীরু বলিয়া বোধ হইত। তিনি এরূপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি প্রথম শ্রেণীর বালকদিগকে অকপটে

বলিয়া ফেলিতেন যে, আমি তোমাদিগকে পড়াইতে পারি না। বৃথা অভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। যাহা তিনি জানিতেন, তাহা অন্য সমস্ত দেশীয় শিক্ষক অপেক্ষা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তিনি অতি মৃদুস্বভাব ছিলেন ; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নানা প্রকার স্বভাব ও মেজাজের লোকের সহিত তাঁহাকে কাজ কারবার করিতে হইলেও তিনি অতি সুকৌশলে আপনার কার্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি কখনও কাহারও বিরাগভাজন হন নাই। তিনি ছাত্রমণ্ডলীর অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন ; আর যদিও তিনি নিয়মানুগামিতা ও বশবর্তিতা সম্বন্ধে কঠোর শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এবং যদিও তাঁহাকে এমন অনেক স্বেচ্ছাচারী বালককে লইয়া চলিতে হইত যাহাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু তথাপি তিনি সকলেরই সম্মানভাজন ও অনেকের প্রণায়াস্পদ হইয়াছিলেন।[১]

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের লেখক লিখিয়াছেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বিবরণী প্রভৃতি হইতে প্রতীত হয় যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১ মার্চ দিবসে উহা স্থাপিত হয়। বোধ হয় এই সময়েই টার্নবুল সাহেবের মৃত্যু হয় এবং গৌরমোহন বিদ্যালয়ের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। যাহা হউক, গৌরমোহনের প্রযত্ন ও চেষ্টাতেই এই বিদ্যালয় অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করে এবং এই বিদ্যালয় বরাবর 'গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল' বলিয়াই পরিচিত।

গৌরমোহন তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। উৎকৃষ্ট বালকগণকে তিনি প্রয়োজন হইলে বিনাবেতনে শিক্ষা দিতেন এবং তাহাদের কেহ কোনও দিন অনুপস্থিত হইলে স্বয়ং তাহার বাটীতে গিয়া সংবাদ লইতেন। প্রত্যেক ছাত্রের চরিত্রের প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুশিক্ষা প্রদানের জন্য ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর হিন্দু ছাত্রগণ স্বাধীনচিন্তা শিক্ষা করিয়া যে ভাবে হিন্দুসমাজের বক্ষে শেলাঘাত করত চিরানুসৃত আচারাদি পদদলিত করিতেছিলেন, সংস্কারের নামে যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবর্তন করিতেছিলেন, তাহাতে হিন্দু অভিভাবকগণ সন্তানদিগকে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডফ্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্মপ্রচারকগণ হিন্দু বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা প্রদানের সহিত যে ভাবে তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল করিয়া দিতেছিলেন তাহা দেখিয়া হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও এই জন্য সকল হিন্দু অভিভাবক সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে তাদৃশ উৎসুক ছিলেন না। গৌরমোহন আঢ্যের চেষ্টাতেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার আদর বাড়িয়াছিল। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারির ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়াও স্বধর্ম ও দেশাচার পরিত্যাগ করেন নাই। বিদ্যার সহিত বিনয় ও শিষ্টাচার সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে সমাজের যথার্থ অলঙ্কাররূপে পরিণত করিয়াছিল। যে বিদ্যালয়ে বাঙলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক অক্ষয়কুমার দত্ত,

হাইকোর্টের সর্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত. 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশব্রতী গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মহাত্মগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী যে কিরূপ উৎকৃষ্ট ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্বে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে কেবলমাত্র স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাদি পঠিত হইত না ; আজিকালি উচ্চশ্রেণীর কলেজে যে উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হয়, ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারির প্রথম শ্রেণীতে সেইরূপ উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র স্কুলপাঠ্য পুস্তক পড়ান হইতেছে। যাহাতে ছাত্রগণ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী পড়িতে ও লিখিতে পারেন সেই দিকে গৌরমোহনের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বল্পবেতনে সঙ্গতিহীন অথচ কৃতবিদ্য ইউরোপীয় শিক্ষক সংগ্রহ করিতেন এবং নিম্নতম শ্রেণীতেও বালকদিগকে ইংরাজ শিক্ষকের দ্বারা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করাইতেন। ফলে, শৈশব হইতেই বালকগণ ইংরাজী শব্দ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে শিখিত।

যে সময়ে কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে প্রবিষ্ট হন, সেই সময়ে হার্মান জেফ্রয় নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ইউরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় ইঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি প্রথমে ব্যারিস্টার হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন, কিন্তু অত্যধিক পানদোষ থাকায় ইনি ব্যারিস্টারিতে প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই এবং নিতান্ত দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। গৌরমোহন ইঁহাকে একশত মুদ্রা বেতনে স্বীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। হার্মান জেফ্রয় তাঁহার ছাত্রগণকে অতিশয় যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার একজন ছাত্র তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে এক এক দিন তিনি প্রমত্ত অবস্থাতেও ইংরাজী গ্রন্থাদি হইতে সুন্দর সুন্দর অংশের এরূপ মনোহর আবৃত্তি করিতেন যে তদ্দ্বারা তাঁহার ছাত্রেরা যথেষ্ট উপকৃত হইতেন। গৌরমোহন বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগারেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের ছুটির পরেও তথায় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইতেন। হার্মান জেফ্রয়ের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের একটি তর্কসভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইস্থানে শম্ভুনাথ পণ্ডিত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছাত্রাবস্থায় বিচার ও তর্ক করিবার শক্তি অর্জন করিতেন।

গৌরমোহন আঢ্য সম্বন্ধে আমরা এত অল্প জানি যে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ তৎসম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ৬ মার্চ দিবসে তাঁহার ও তাঁহার বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদ করিলে, আশা করি পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম এই :

কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির চেষ্টা ও উদ্যম কিরূপে জনসাধারণের কুসংস্কার ও ঔদাসীন্য পরাভূত এবং শিক্ষার আদর্শ উন্নত করিতে পারে তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারির ইতিহাসে যেরূপ পরিলক্ষিত হয় সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপয়িতা এক্ষণে ইহলোকে নাই। যে মহৎ কার্য তিনি তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কার্যেই তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহার অদৃষ্ট তাঁহাকে অন্যভাবে পরিচালিত করিত তাহা হইলে হয়ত তিনি একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ হইতে পারিতেন। বিদ্যালয়েব শিক্ষকরূপে অবশ্যই তিনি অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য স্তূপ হইতে তিনি উত্তুঙ্গ পর্বতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় ওরিণ্ট্যোল সেমিনারির ছাত্রসংখ্যা এক শতও ছিল কিনা সন্দেহ, তাঁহার মৃত্যুকালে উহার ছাত্রসংখ্যা আটশত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয় কেবল একজন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে এবং উহা তাঁহাব অবিচলিত উদ্যম ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। হিন্দু কলেজ ও মিশনারি বিদ্যালয়গুলির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উহাব গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পাবে নাই। পক্ষান্তরে, উহার পরলোকগত প্রতিষ্ঠাপয়িতা যে উত্তম শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত কবিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে উহা সর্বসাধারণের নিকট যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। সুকুমারমতি বালকগণের মনে উচ্চ নৈতিক ভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অমায়িক ও নির্মল স্বভাব এবং চরিত্রগত বিবিধ সদ্‌গুণাবলীর সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মিত করিয়া দেওয়াই এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দাম্ভিক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির পরিবর্তে বুদ্ধিমান এবং কর্তব্যপরায়ণ নাগরিকের সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্য অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে লর্ড অকল্যাণ্ড এডওয়ার্ড রায়ানের সহিত এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ও লর্ড জোস্‌লিন বিদ্যালয়ের তরুণ বয়স্ক ছাত্রদিগের সাহিত্যে অধিকার ও ব্যুৎপত্তি দেখিয়া যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সে কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকাব করিয়াছিলেন। গভর্নর জেনারেল এ কথাও বলিয়াছিলেন যে এই বিদ্যালয় হিন্দু কলেজ হইতে কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট নহে। গভর্নমেণ্ট কলেজে যে সকল সুবিধা আছে এখানে তাহা নাই, তথাপি যে উহা গভর্নর জেনারেলের নিকট এরূপ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে ইহা নিশ্চিতই অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারির একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের ইংরাজীতে যথেষ্ট অধিকার থাকিলেও তিনি গণিতশাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। সেই জন্য বাৎসরিক পরীক্ষায় গিরিশচন্দ্র প্রতিবারই দ্বিতীয় স্থান এবং কৈলাসচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। উভয়েরই সুন্দর আবৃত্তিশক্তি ছিল। তাঁহাদের সেক্ষপীয়রের আবৃত্তি যাঁহারা শুনিতেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইতেন। প্রসিদ্ধ বক্তাদের বক্তৃতাভঙ্গী অনুকরণ করিবার কৈলাসচন্দ্রের অসামান্য ক্ষমতা ছিল। কৈলাসচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র যে ভবিষ্যতে অসাধারণ

প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন তাঁহাদের শিক্ষকগণ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল।

হস্তলিখিত সাময়িক পত্র

ছাত্রাবস্থায় কৈলাসচন্দ্র বিদ্যালয়ে এক হস্তলিখিত সাময়িক পত্রের প্রবর্তন করেন। কৈলাসচন্দ্র, তাঁহার সতীর্থ গিরিশচন্দ্র এবং গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম অগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র ও শ্রীনাথ (যিনি পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন) এই পত্রে সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভাদি লিখিতেন। কৈলাসচন্দ্রের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে সেই সকল প্রবন্ধ একটি খাতায় নকল করিয়া পত্রিকাখানি সহপাঠিগণকে পাঠ করিতে দিতেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২৩ ফেব্রুয়ারী দিবসে গৌরমোহন আঢ্য পরলোকে গমন করেন। গৌরমোহন বাল্যকাল হইতে জলপথে ভ্রমণ করিতে ভয় পাইতেন, কারণ তিনি সন্তরণ জানিতেন না। জীবনে একবার মাত্র তিনি বিদ্যালয়ের জন্য একজন য়ুরোপীয় শিক্ষকের অন্বেষণে শ্রীরামপুরে জলপথে গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ঝটিকাবেগে তাঁহার ক্ষুদ্র-নৌকা উল্টাইয়া যায় এবং গৌরমোহন জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। গৌরমোহন আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্মৃতি তাঁহার কৃতজ্ঞ দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি বাস্তবিকই গৌরমোহনের অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। কয়েক বৎসর হইল বাঙলার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারির গৃহে গৌরমোহনের একটি প্রস্তরময় স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মহাত্মার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

পিতৃবিয়োগ

গৌরমোহনের মৃত্যুর কিছু পূর্বে কৈলাসচন্দ্র উচ্চতম শিক্ষালাভের জন্য হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অধিককাল তিনি হিন্দুকলেজে পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার পিতার অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্রের পিতৃব্যগণ পৃথক হইলেন। অল্প বয়সেই কৈলাসচন্দ্র অভি-ভাবকশূন্য হইয়া নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি অল্প বয়সেই কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন।

কর্মজীবনে প্রবেশ

তিনি প্রথমে মেসার্স ককারেল্ এণ্ড কোম্পানির (Messrs. Cockerell & Co.) আফিসে একটি সামান্য কেরাণির পদ প্রাপ্ত হন। পরে, বোধ হয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে, তিনি মিলিটারি একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আফিসে তদানীন্তন রেজিস্ট্রার মিস্টার হিলের অধীনে একটি কর্মপ্রাপ্ত হন। এই সময়ে নিমতলা স্ট্রিটে অবস্থিত ফ্রি চার্চ ইন্‌স্টিটিউসনের গৃহে প্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্মপ্রচারক ও বাগ্মী রেভারেণ্ড ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফ্ খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কৈলাসচন্দ্র সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া অপূর্ব তর্কশক্তি দ্বারা আলেক্‌জাণ্ডার ডফের যুক্তিগুলির ভ্রম প্রদর্শন করিতেন। তরুণ বাঙালি যুবকের এই অদ্ভুত তর্কশক্তি অবলোকন করিয়া সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইতেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজীতে Christianity, what is it? বা "খৃষ্টধর্মের স্বরূপ কি ?" শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। এইস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে কৈলাসচন্দ্র হিন্দুধর্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান সভ্যগণ বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থাদিতে শিক্ষাদানের জন্য তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামক যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, কৈলাসচন্দ্র উহাতে কিছুকাল হিন্দুধর্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

লিটারারি ক্রনিক্‌ল্

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র 'The Literary Chronicle' নামক একখানি ইংরাজী মাসিক-পত্রিকা প্রবর্তিত করেন। সেপ্টেম্বর মাসে উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদকতায় এই পত্রিকাখানি শিক্ষিত বাঙালিসমাজে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। পত্রিকাখানি কিঞ্চিদধিক দুইবৎসর কাল প্রকাশিত হয়। পরে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। কৈলাসচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ ও সহচর গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই পত্রিকায় অনেকগুলি সুন্দর প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। সে প্রস্তাবগুলিতে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে তিনি সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির আলোচনা করিতেন। প্রথম সংখ্যায় তিনি East India Company's Policy বা "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নীতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কোম্পানির সর্বগ্রাসিনী নীতির যে ন্যায় ও যুক্তি সমন্বিত অথচ কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। মৎসম্পাদিত "Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee" নামক গ্রন্থে এই প্রস্তাব পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৈলাসচন্দ্রের অনেকগুলি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ এই পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়। হিন্দু ও ইউরোপীয় নাটক সম্বন্ধে তাঁহার একটি সুন্দর প্রবন্ধ এই পত্রিকায় পড়িয়াছি বলিয়া আমাদের স্মরণ হয়। এই পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবিতাও প্রকাশিত হইত। 'রেইস এণ্ড রায়ত' সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সাহিত্য-গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকাশিত 'Notes' হইতে প্রতীত হয় যে কৈলাসচন্দ্রের Literary Chronicle পত্রে গিরিশচন্দ্র শিখ যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাণোন্মাদিনী কবিতা লিখিয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্রের পূর্বে আর কোনও দেশীয় ব্যক্তি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কৈলাসচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাঙালি আজ এই কৃতী পুরুষের নাম পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে।

'চার্টার' সভা

কৈলাসচন্দ্র কেবল সুলেখক ছিলেন না। তাঁহার অপূর্ব বক্তৃতাশক্তি ছিল। জনহিতকর প্রকাশ্য সভা সমিতিতে তিনি প্রায়ই উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন দিবসে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি সার চার্লস উড হৌস অব কমন্স সভায় ভারতবর্ষীয় রাজকর্মচারী নিয়োগ বিষয়ক একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তখন কি কি সর্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নূতন চার্টার বা সনন্দ প্রদত্ত হইবে, কমন্স সভায় তাহা আলোচিত হইতেছিল। স্যর চার্লসের প্রস্তাবটি কতিপয় বিষয়ে অতি উত্তম হইলেও অনেক বিষয়ে উহা শিক্ষিত ভারতবাসীর আশার অনুরূপ হয় নাই। উহাতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং সিভিল সার্ভিসে ভারতবাসীর নিয়োগ, বিচার বিভাগে দেশীয় কর্মচাবীদের বেতনবৃদ্ধি, লাভজনক পূর্তকার্যের বিস্তার প্রভৃতি অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। এই সকল বিষয়ে এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাঙলার জননায়কগণ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ জুলাই দিবসে টাউন হলে এক বিরাট সভা আহূত করেন। উহার পূর্বে এদেশে কোনও প্রকাশ্য সভায় এত জনতা হয় নাই। টাউন হলে ও উহার সন্নিহিত স্থানেও লোকসমাগম হইয়াছিল তাহার সংখ্যা সম্বন্ধে ৩০০০ হইতে ১০০০০ পর্যন্ত নানালোকে নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ সকল সম্প্রদায়ের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক ব্যক্তিকে স্থানাভাবে নিরাশ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, রামগোপাল ঘোষ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। পঞ্চবিংশবর্ষীয়

যুবক কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতাটি এত হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল যে এই সময় হইতেই কৈলাসচন্দ্র সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পার্লিয়ামেন্টের কমন্স সভায় এই সভার কার্য বিবরণী ও শিক্ষিত ভারতবাসীর একটি আবেদন পত্র[২] প্রেরিত হয়। ফলে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টার স্থানে স্থানে সংশোধিত হয় এবং ভারতবাসী সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার লাভ করেন।

বেথুন সভা

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ ডিসেম্বর দিবসে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব, শিক্ষাপরিষদের সভাপতি ও ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ডাক্তার মৌয়েট এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সহযোগিতায় 'বেথুন' সোসাইটি নামক এক সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা।[৩] এই সভা এক্ষণে মৃত কিন্তু বহু বৎসরকাল ব্যাপিয়া এই সভা আমাদের মানসিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছে তাহা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবে। যখন ডাক্তার মৌয়েট, ডাক্তার ডফ্, আর্চডিকন প্র্যাট, অধ্যাপক কাউয়েল, কর্ণেল ম্যালিসন, কর্নেল গুড্উইন, ডাক্তার রোয়ার, ডাক্তার চেভার্স, বেভারেণ্ড ডল প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং গুডিব চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, কৈলাসচন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবীনকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত বাঙালির বাগ্মিতায় বেথুন সভার গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত তখন সভার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে ! তখন গভর্নর জেনারেল, লেফটেনাণ্ট গভর্নর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বিনা নিমন্ত্রণে এই সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। কৈলাসচন্দ্র কেবল এই সভার প্রতিষ্ঠাতা সভ্য ছিলেন না, তিনি এই সভায় বহু সারগর্ভ সন্দর্ভাদি পাঠ করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতার পরে যে তর্কবিতর্ক হইত তাহাতে প্রায়ই যোগদান করিতেন। এই সভায় সর্বপ্রথমে তিনি 'A comparative view of the European and Hindu Drama' (ইউরোপীয় ও হিন্দু নাটকের তুলনায় সমালোচনা) শীর্ষক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। বোধ হয় Literary Chronicle-এ প্রকাশিত সন্দর্ভটি ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়াই এই প্রস্তাবটি রচিত হইয়াছিল। প্রস্তাবটি পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই সভায় তিনি Thc Woman of Bengal (বঙ্গনারী) সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব পাঠ করেন। ইহাও পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বাঙলা গভর্নমেন্টের তদানীন্তন সেক্রেটারি মিস্টার (পরে স্যর) সিসিল

বীডন এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এতদূর প্রীত হন যে বাঙলা গভর্নমেন্টের দপ্তরে একটি উচ্চবেতনের পদ শূন্য হইলে কৈলাসচন্দ্রকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র প্রায় আটবৎসরকাল বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে কার্য করেন।

কৈলাসচন্দ্র এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য সর্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ আগস্ট দিবসে বেথুন সভায় কৈলাসচন্দ্র "On the Education of Hindu Females---how best achieved under the present circumstances of Hindu Society"—অর্থাৎ "হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়" সম্বন্ধে একটি মনোহর প্রস্তাব পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় তিনি অবান্তর কথা না বলিয়া কিরূপে তৎকালীন সমাজের প্রতিকূল অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি এরূপ সারগর্ভ ও প্রয়োজনীয় কথায় পরিপূর্ণ ছিল যে সভা নিজব্যয়ে বক্তৃতাটি মুদ্রিত করিয়া উহার প্রচার করেন। বক্তৃতাটির উপসংহারাংশে এরূপ ওজস্বিনী ভাষায় দেশবাসীকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকার্যে সহায়তা কবিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন যে উহা পাঠকালে মনে হয় বক্তার উচ্চ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাক্যগুলি নিঃসৃত হইতেছে। এইরূপ শব্দচয়ন-নৈপুণ্য ও আবেগময়ী ভাষা তাঁহার সতীর্থ ও সহকর্মী গিরিশচন্দ্র ঘোষ ব্যতীত আর কোনও বাঙালি লেখকের রচনায় দৃষ্ট হয় না। প্রস্তাবটি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট দিবসে "হিন্দু পেট্রিয়টে' গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাবটির যে সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন মৎসম্পাদিত *Selections from the writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee* নামক গ্রন্থের ২২৩-২২৬ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠকগণ এই সমালোচনাটি পাঠ করিলে কৈলাসচন্দ্রের প্রস্তাবটির সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ হেনরী উড্রো সাহেবের মৃত্যু হইলে কৈলাসচন্দ্র-তাঁহার সম্বন্ধে বেথুন সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, *Laurie's Distinguishea Anglo-Indians* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বেথুন সভার সম্পাদক

ডাক্তার মৌয়েট, মিস্টার হজ্‌সন্ প্র্যাট, কর্নেল গুড্‌উইন, ডাক্তার বেডজফোর্ড, মিস্টার জেম্‌স্ হিউম প্রভৃতি মনস্বিগণ যথাক্রমে এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৯ জুন দিবসে ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্ এই সভার সভাপতি পদে বৃত হন। ডাক্তার ডফের সভাপতিত্বে এই সভার যথেষ্ট উন্নতি হয়। সভার প্রায়

প্রারম্ভ হইতে[৪] প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। ইনি অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। কৈলাসচন্দ্রের ভগ্নীর[৫] সহিত রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেশচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হয়। কৈলাসচন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধি ও সরল স্বভাবের জন্য রামচন্দ্র তাঁহাকে পুত্রাধিক ভালবাসিতেন। তিনি অবসর গ্রহণকালে কৈলাসচন্দ্রকেই বেথুন সভার সম্পাদক পদের উপযুক্ত ভাবিয়া ডাক্তার ডফ্‌কে তাঁহার বিষয়ে বলেন। ফ্রিচার্চ ইন্‌স্টিটিউসনে তর্ক-বিতর্কের সময় হইতেই ডাক্তার ডফ্ কৈলাসচন্দ্রকে চিনিতেন এবং তাঁহার প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কৈলাসচন্দ্রকে সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় অষ্টাদশবর্ষ কাল এই সভার, অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদকত্বকালে এই সভা প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সম্পাদকের কার্য অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। কৈলাসচন্দ্র কেবল দেশহিতের জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময় নীরবে এই সভার উন্নতিকল্পে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসামান্য পরিশ্রম করিতে হইত, তিনি অম্লান বদনে সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করিতেন। বেথুন সভার সকল সভাপতিই মুক্তকণ্ঠে কৈলাসচন্দ্রের কার্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। এরূপ প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই প্রতিপত্তি সম্পাদকের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে। বেথুন সভার প্রতিষ্ঠা কৈলাসচন্দ্রের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। চল্লিশ বৎসর পূর্বে বেথুন সভার সুযোগ্য ও সুধী সম্পাদকের নাম শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেরই সুপরিচিত ও সম্মানার্হ ছিলেন। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসের অভাবে আজি তাঁহার নাম বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

রাজকর্মে উন্নতি

১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে শাসনকার্যে ব্যয়সঙ্কোচের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য Civil Finance Commission নামক অনুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত হয়। মিস্টার (পরে স্যর্) রিচার্ড টেম্পল এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ডাক্তার ডফ্ কৈলাসচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। ডাক্তার ডফ্ স্যর রিচার্ড টেম্পলের সহিত কৈলাসচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দিলে স্যর রিচার্ড কৈলাসচন্দ্রের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে Finance commission অফিসের প্রধান সহকারী নিযুক্ত করেন। কমিশনে কৈলাসচন্দ্র অতিশয় যোগ্যতার সহিত সকল কার্য সম্পাদিত করেন এবং স্যর রিচার্ড টেম্পল্ তাঁহার কার্যের অতি উচ্চ প্রশংসা করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজস্বসচিব মাননীয় মিঃ লেঙের প্রস্তাবানুসারে রাজস্ববিভাগে চারিটি উচ্চ পদের সৃষ্টি হইলে স্যর রিচার্ডের প্রশংসাবাক্য স্মরণ করিয়া গভর্নমেণ্ট কৈলাসচন্দ্রকে

উহার একটি পদ প্রদান করেন। তিনি শেষ অবধি এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল কণ্ট্রোলার জেনারেলের সহকারী এবং অবশেষে মণি-অর্ডার অফিসের অধ্যক্ষের (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের) পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্যর রিচার্ড টেম্পল তাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন যে শুনা যায় যে তিনি তাঁহাকে বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারির পদের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই পদে বসিবার পূর্বেই কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্রাদি

কৈলাসচন্দ্র দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্ম এবং বেথুন সভার সম্পাদকের পরিশ্রমসাধ্য কার্য সম্পাদিত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সাহিত্য-সেবা ও দেশ-সেবাই তাঁহার জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। কৈলাসচন্দ্র-সম্পাদিত 'লিটারারি ক্রনিক্‌লে'র কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তদীয় মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ "বেঙ্গল রেকর্ডার' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রবর্তিত করেন। সম্পাদকদ্বয় তরুণ বয়স্ক হইলেও তাঁহাদের প্রস্তাবাদি এরূপ সুচিন্তিত ও সারগর্ভ হইত যে 'ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া'-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ মিস্টার ম্যার্শম্যান এই প্রস্তাবাদির উচ্চ প্রশংসা করিতেন। কলিকাতার তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ আর্থার গ্রোট এই সকল রচনা পাঠ করিয়া এতদূর প্রীত হন যে তিনি ডেপুটি কলেক্টর শিবচন্দ্র দেব[৬] মহাশয়ের নিকট ইঁহাদের পরিচয় লন এবং শ্রীনাথের অন্য কোনও চাকুরী নাই শুনিয়া তাঁহাকে একটি কর্ম প্রদান করেন। শ্রীনাথ পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং শেষে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্‌চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন। কৈলাসচন্দ্র "বেঙ্গল রেকর্ডারে" মধ্যে মধ্যে মনোহর প্রস্তাবাদি লিখিতেন। তিনি Morning Chronicle, Citizen, Phoenix প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field পত্রে এবং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত Hindoo Patriot-পত্রেও তিনি মধ্যে মধ্যে দেশোন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র Hindoo Patriot-এর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা কোনও কারণে সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলে স্বত্বাধিকারী কালীপসন্ন সিংহ মহোদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে কৈলাসচন্দ্র বসু, নবীনকৃষ্ণ বসু ও কৃষ্ণদাস পাল এই তিনজন সুলেখকের হস্তে উহার সম্পাদনভার অর্পণ করেন। কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদকত্বকালেও কৈলাসচন্দ্র নিয়মিতরূপে Hindoo Patriot-এ লিখিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ মে দিবসে দরিদ্রপ্রজাপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্তন করেন। কৈলাসচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের 'বেঙ্গলী'তেও মধ্যে মধ্যে লিখিতেন এবং গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে 'বেঙ্গলী'তে রীতিমত

লিখিতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গলী'তে গিরিশচন্দ্রের জীবনকথা-সম্বলিত-মৃত্যু-বিষয়ক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা কৈলাসচন্দ্রের রচনা। মৎপ্রকাশিত *Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee* নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

যেখানে জনহিতকর সভা সমিতির অধিবেশন হইত, সেইখানেই কৈলাসচন্দ্র উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতেন। সহপাঠী গিরিশচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেলুড় স্কুল এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং শিক্ষার উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। "দরিদ্রদিগকে শিক্ষা দান, অভাবগ্রস্তদিগকে সাহায্য প্রদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধদান, দরিদ্র বিধবা ও অনাথদিগকে সাহায্যদান" প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান এই সভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। এই সভা এককালে নীরবে যে সকল মহৎকার্য সংসাধিত করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দে অভিভূত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক কর্নেল ম্যালিসন, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র, মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জননায়কগণ এই সভায় বাৎসরিক অধিবেশনাদিতে উপস্থিত থাকিয়া ও বক্তৃতাদি করিয়া সভার উৎসাহবর্ধন করিতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল দিবসে এই সভার এক বার্ষিক অধিবেশনে কৈলাসচন্দ্র Claims of the Poor বা 'দরিদ্রের দাবি' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে এই সভাদ্বারা অনুষ্ঠিত কার্যের উপকারিতা প্রদর্শিত করিয়া তিনি দেশের লক্ষপতিদিগকে এই প্রতিষ্ঠানের পোষকতা করিতে আহ্বান করেন। দরিদ্র দেশবাসীকে শিক্ষাপ্রদানের আবশ্যকতা প্রদর্শিত করিয়া তিনি বলেন যে, শিক্ষার অভাবই আমাদের দেশের দুরবস্থার প্রধান কারণ, দরিদ্র প্রজাদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে যে জমিদারই লাভবান হইবেন তাহাও তিনি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। তাঁহার সমগ্র বক্তৃতাটি উচ্চ নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি তাঁহার প্রতি বাক্যে পরিস্ফুট। এই বক্তৃতার উপসংহারে তিনি দেশের ধনী সন্তানগণকে অন্ধ, খঞ্জ, বধির প্রভৃতি দুর্ভাগ্যগ্রস্ত দরিদ্রের ক্লেশনিবারণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা পাইতে অনুরোধ করেন।

বক্তৃতার সময় সভাস্থলে প্রসিদ্ধ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও ওজস্বিনী বক্তৃতায় কৈলাসচন্দ্রের মতের সমর্থন করিয়া তাঁহার বক্তৃতার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রাদিতে উহা উচ্চপ্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছি। 'কলিকাতা রিভিউ'-এর তৎকালীন সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ কর্নেল ম্যালিসন উহার সুদীর্ঘ সমালোচনা কৈলাসচন্দ্রের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। আমরা কর্নেল ম্যালিসনের সমালোচনার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :

> The author of this address is, if we mistake not, the able and indefatigable Secretary of the Bethune Society. To see him come forward in the noblest of all causes,—the cause of the poor,—is calculated to make those hope, who had begun to despair of the effect of education upon the native of this great country,—for it is a striking proof of one, at least, of the tendencies which that education produces on the gentle nature of the Hindoo who may submit himself to its influence.
> We have ourselves read the lecture with the greatest pleasure. It is admirable in style, and excellent in its moral tone. Baboo Koylas has set and example which, we believe, his countrymen will imitate, and has made an appeal to which, we fervently hop±, they may respond.

রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিসভা

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৯ এপ্রিল দিবসে শ্রীবৃন্দাবন ধামে হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কে. সি. এস. আই. দেহত্যাগ করেন। ইহাতে দেশে জাতিসাধারণ শোক উপস্থিত হয়। দেশের সর্বপ্রধান রাজনীতিক সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আহ্বানে ঐ বৎসর ১৪ মে দিবসে এই স্বর্গগত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ এক বিরাট স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। মনীষী প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি-এস-আই, মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু (পরে মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর, বাবু (পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মিস্টার জন কক্রেন, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, মিস্টার মন্ট্রিউ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, রেভারেণ্ড মিস্টার ডল্, রেভারেণ্ড মিস্টার লঙ্, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র, অধ্যাপক লব্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর প্রস্তাব করেন যে রাজা স্যর রাধাকান্তের স্মরণার্থে তাঁহার একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি কোনও প্রকাশ্য

স্থলে প্রতিষ্ঠিত হউক। দরিদ্রের বন্ধু কৈলাসচন্দ্র এই প্রস্তাবের পরিবর্তে প্রস্তাব করেন যে, দরিদ্র বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য একটি সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দয়ার সাগর রাধাকান্তের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতার মর্মানুবাদ প্রদান করিতেছি :

সভাপতি মহাশয়,—এই মাত্র যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত ও সমর্থিত হইল, তদ্বিষয়ে সভার সম্মতি গ্রহণের পূর্বে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য আপনার প্রশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি ও এই বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। মহাশয়, স্বর্গীয় রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিপূজার জন্য আহূত এই সভা, আমার মতে একটি গভীর অর্থ বহন করিতেছে তদ্বিষয়ে কোনও ভুল নাই। সকল বিষয়েই রাজা দেশীয় সমাজের নেতা ও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। যদিও তাঁহার মর্ত্যজীবনের শেষ দিনগুলি তিনি আত্মীয়, স্বজন ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বৃন্দাবনের ছায়াস্নিগ্ধ পুষ্পসুরভিত কুঞ্জমধ্যে ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার অবস্থিতিতে যেরূপ, তাঁহার অনুপস্থিতিতেও সেইরূপ, তাঁহার নৈতিক প্রভাব আমাদের উপর অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইতেছিল। সমধর্মী হউন বা বিধর্মী হউন, উদারনীতিক হউন বা রক্ষণশীল হউন, সকলেই তাঁহাকে সমভাবে সম্মান করিতেন। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কোনও পরিবার বা জাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে রুচি, মত বা ধর্মবিশ্বাসের বৈষম্য থাকিলেও যথার্থ মহত্ত্ব সেই বৈষম্য সত্ত্বেও সেই পরিবার বা জাতির উপর তাহার মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তারিত করিতে পারে। আমাদের সমাজের নব্য সংস্কারকগণ, যাঁহারা আমাদের সামাজিক আচারাদির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত অসংখ্য সামাজিক দোষগুলি দূর করিবার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত প্রয়াস পাইতেছেন—এমন কি রাজবিধি দ্বারাও বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা পাইতেছেন, যাঁহারা মুমূর্ষু পিতামাতাকে 'অন্তর্জলি' করিতে দিতে অসম্মত এবং শবদাহের পরিবর্তে সমাধির পক্ষপাতী—সেই সকল নব্য সংস্কারকগণের রুচি, অভিমত ও ধর্মবিশ্বাসের সহিত রাজা রাধাকান্ত দেবের রুচি, মত ও ধর্মবিশ্বাসের একতা ছিল না। তথাপি, মহাশয় যদি আমি ভুল বুঝিয়া না থাকি, তবে যাঁহাবা বিধবা-বিবাহ এবং অন্যান্য সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী, রাজা রাধাকান্ত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া যাঁহাদের মত ও কার্যের চিরবিরোধী ছিলেন, তাঁহারাই এই সভার প্রধান উদ্যোগী। সুতরাং আমরা যে সকলে একভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিতে এই স্থলে সমবেত হইয়াছি, ইহা কি একটি গভীরতম তাৎপর্যের সূচনা করিতেছে না? যখন কোনও ভিন্নমতাবলম্বী সংস্কারক আন্তরিকতার সহিত রক্ষণশীল বিরুদ্ধবাদীর পূজা করে তখন ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সকল প্রতিবিধায়িনী শক্তির অস্তিত্বসত্ত্বেও মহত্ত্ব সকল ধর্ম ও সামাজিক মতদ্বৈধ অতিক্রম করিয়া সর্বত্র তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

মহাশয়, আমরা স্বর্গীয় মহাত্মাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতাম, কেবল তিনি সাদ্বিদ্বান ছিলেন বলিয়া নহে, কিম্বা তিনি শব্দকল্পদ্রুমের সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া নহে, তিনি ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, কিম্বা তিনি সাধু ও মিষ্টভাষী ছিলেন বলিয়া নহে, কিন্তু তাঁহাতে

হৃদয় ও মনের সেই সকল মহৎগুণের অধিষ্ঠান ছিল, যে সকল গুণ যে কোনও সময়ে যে কোনও জাতীয় ব্যক্তিকে মহত্ত্ব প্রদান করিতে পারে। যদি এ দেশের কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে তাঁহার স্বভাব রাজার ন্যায় উদার, যে তাঁহার প্রসন্ন আনন করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সতত উদ্ভাসিত, যে তাঁহার হৃদয় দেশপ্রেমে আলোকিত ছিল—তবে সে কথা ন্যায় ও সত্যের সহিত এই প্রবীণ ও ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারিত—যিনি সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন যাঁহার চিতাভস্ম পুণ্যসলিলা ভাগীরথী এখনও বহন করিতেছে এবং যাঁহার আত্মা চিরশান্তিময় রাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে চলিবে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহার বিষয় লোকে বিস্মৃত হইবে এবং অনাদৃত অবস্থায় উহা কোথাও পড়িয়া থাকিবে। তাঁহার দেশবাসী ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তিনি যে অনন্যসাধারণ গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার সেই গুণ স্মরণ করাইয়া দেয় ইহাই বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য দানশীলতার জন্যই তিনি সমধিক বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা কোনও সৎকার্যে দানের জন্য ব্যয় করা উচিত। যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হইয়াছে উহার পরিবর্তে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে দরিদ্র হিন্দুবিধবা ও অনাথদিগকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখা হউক।

রাজা রাধাকান্তের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য যে কার্যনির্বাহক সমিতি সংগঠিত হয়, কৈলাসচন্দ্র তাহার একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পুণ্যস্মৃতি কুমারী মেরী কার্পেন্টার ভারতবর্ষে আগমন করেন। কলিকাতায় আসিলে একদিন প্রসঙ্গক্রমে রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইংলণ্ডে যেরূপ একটি সমাজ-বিজ্ঞান সভা আছে, এদেশে সেইরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কি না? মেরী কার্পেণ্টার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ এবং কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালি জননায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া ১০ ডিসেম্বর দিবসে এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করেন। মহামান্য গভর্নর জেনারেল, লেফটেনাণ্ট গভর্নর এবং বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হন। মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় এদেশে একটি সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "জনসাধারণের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগকে সম্মিলিত করিয়া বঙ্গদেশে সামাজিক উন্নতির সহায়তা করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল।" প্রথম বৎসর মাননীয় মিস্টার

জাষ্টিস্ ফিয়ার (পরে স্যর জন্ বড্ ফিয়ার) এই সভার সভাপতি এবং মাননীয় মিস্টার জাষ্টিস্ নরম্যান ও বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সভার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। মিস্টার বিভার্লি ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র উহার সম্পাদক হন। কৈলাসচন্দ্র এই সভার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। এই সভা চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল ; ব্যবস্থাশাস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য। কৈলাসচন্দ্র স্বাস্থ্যশাখার অন্যতম প্রধান সভ্য হইলেও অন্যান্য শাখার প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৬ জুলাই দিবসে শেষোক্ত শাখায় 'হিন্দুদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা' (Domestic Economy of the Hindus) শীর্ষক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। উহাতে তিনি মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণের গ্রন্থাদি হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করেন, এবং বর্তমান আচার ব্যবহারাদির দোষে আমাদের কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে বা হইতে পারে তাহা প্রদর্শিত করেন। সন্তানদিগের প্রতি মাতাপিতার অত্যধিক স্নেহ এবং তাঁহাদের বিলাসিতায় প্রশ্রয় দান, স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য করিয়াও হিন্দুসন্তানগণ কর্তৃক ভ্রান্ত মাতাপিতার আদেশ অনুপালন, একান্নবর্তী পরিবারে বাস করিয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ, বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়ায় আয়ের অনুপাতে অত্যধিক ব্যয় প্রভৃতি দোষে কিরূপে আমাদের সমাজ অবনতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। পূবের্ব সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ নৃত্যগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা শিখিতেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে বিরাট রাজান্তঃপুরে অর্জুন নৃত্যগীতাদিতে শিক্ষা দিতেন কিন্তু এক্ষণে হিন্দু পরিবারে এই সকল নির্দোষ কলাবিদ্যাশিক্ষা দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয়, এই জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পুনরায় হিন্দু স্ত্রীলোকগণকে এই সকল বিদ্যায় শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। কুমারী মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার Six months in India নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতার এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন।

রামগোপাল ঘোষের জীবনী

হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ও সুলেখক মিস্টার এস্, লব্, ছাত্রগণের তথা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মানসিক উন্নতি বিধানকল্পে মধ্যে মধ্যে তাঁহার ইউরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুগণকে কলেজগৃহে নীতিগর্ভ উপদেশ ও বক্তৃতাদি প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহারই আমন্ত্রণে একবার 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ হুগলী কলেজে বাঙালি ক্রোরপতি রামদুলাল দের জীবনকথা বিবৃত করেন। অধ্যাপক লব্ কৈলাসচন্দ্রকেও একটি বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৬ জানুয়ারী দিবসে শিক্ষিত

বাঙালির সর্বপ্রধান নেতা, 'ভারতবর্ষের ডিমস্থিনিস্', 'স্বদেশরক্ষার ভীম' রামগোপাল ঘোষ নামশেষ হন। রামগোপালের জীবনীতে শিক্ষণীয় অনেক কথা আছে এইজন্য কৈলাসচন্দ্র রামগোপাল ঘোষের জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। দেশীয়দিগের অকৃত্রিম বন্ধু লব্ ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হন এবং কৈলাসচন্দ্রকে লিখেন

"I for one, am surfeited with Socrates, Milton, Bacon and such like stock subjects. It will be refreshing to hear the life and labors of one who is not a household word among us Europeans, to listed to the life of a real man who has benefited his countrymen by works of practical usefulness and by leaving behind him a good example, a noble ideal, which all may try to imitate if they cannot thoroughly realise."

কৈলাসচন্দ্র রামগোপালের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার চরিত-কথা রচনা করিয়া ১ ফেব্রুয়ারী দিবসে হুগলী কলেজের গৃহে উহা বিবৃত করেন। কৈলাসচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ গিরিশচন্দ্র এই বক্তৃতার উপসংহারাংশ লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাটি পরে রামগোপাল ঘোষের ছায়াচিত্রের সহিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তৎকালীন সাময়িক পত্রাদিতে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীত হয় যে এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ কৈলাসচন্দ্র রামগোপালের স্মরণার্থ কার্যের আনুকূল্যে প্রদান করিয়াছিলেন :

> আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মৃত বাবু রামগোপাল ঘোষের বান্ধবগণ তাঁহার স্মরণার্থ কার্যের অনুষ্ঠানে উদাসীন নহেন। তাঁহারা সভা করিয়া কর্তব্যাবধারণে উদ্যত হইয়াছেন। আর একটি উদার অনুষ্ঠান দেখিয়া আমরা অধিকতর প্রীতিলাভ করিলাম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু হুগলী কলেজে রামগোপাল বাবুর জীবনবৃত্তান্ত লইয়া এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহা পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়া মুদ্রিত ও বিক্রীত হইতেছে। মূল্য একটাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। উহা বিক্রীত হইয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা রামগোপাল বাবুর স্মরণার্থ কার্যের আনুকূল্যার্থ প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা ঐ পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগের কেবল যে কৈলাসবাবুর বক্তৃতা পাঠ করিয়া এবং রামগোপাল বাবুর জীবচরিত্তগত সবিস্তার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৌতূহল বিনোদিত হইবে এরূপ নয়, তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা করণার্থ কার্যেরও সবিশেষ আনুকূল হইবে। এক প্রযত্নে এই উভয়বিধ ইলোভ সামান্য সুখাবহ নহে।
>
> সোম প্রকাশ, ১৩ই ফাল্গুন, সন ১২৭৪ সাল

রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিসভা

এই বৎসর ২২ ফেব্রুয়ারী দিবসে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহে বাঙলার দেশনায়কগণ রামগোপালের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক বিরাট স্মৃতিসভা আহ্বান করেন। এই সভায় বাবু (পরে মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বক্তৃতাদি করেন। কৈলাসচন্দ্র এই সভাতেও একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। আমরা উহার মর্মানুবাদ পাঠকগণকে উপহার দিতেছি :

ভদ্র মহোদয়গণ, অধিক দিনের কথা নহে, এখনও এক বৎসর অতীত হইয়াছে কি না সন্দেহ, আমরা এই গৃহে একজনের স্মৃতি পূজার জন্য সমবেত হইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সর্ববাদিসম্মত নেতা ছিলেন। তাঁহার মহত্ত্ব, অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, শিশুসুলভ সরলতা, স্বভাবসিদ্ধ দয়া ও বদান্য ব্যবহার অপূর্ব প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া—যে প্রতিভা অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শী জ্ঞানে পরিণতি লাভ করিয়াছিল সেই প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া—তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ের উপর তাঁহাকে এরূপ আধিপত্য প্রদান করিয়াছিল যে কি রক্ষণশীল কি উদারনীতিক, সকলেরই স্মৃতিপটে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে। স্বর্গীয় স্যর রাজা রাধাকান্ত একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি অতিমাত্রার রক্ষণশীল ছিলেন এবং আমাদের পুরোহিতগণ কর্তৃক অত্যাচারিত নির্বন্ধশীল এবং কুসংস্কারাপন্ন দেশবাসীগণের মধ্যে আমরা যে সকল সামাজিক সংস্কার সাধিত করিতে প্রয়াস পাইতেছি তিনি তাহার অনেকগুলিরই বিরোধী ছিলেন। তথাপি স্যর রাজা রাধাকান্ত তাঁহার ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধবাদীগণের নিকট হইতে অল্প সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হন নাই। আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম কারণ তিনি হৃদয়ের ও মনের সেই সকল গুণে ভূষিত ছিলেন, যে সকল গুণ দেশ ও কাল নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকে। আজ আমরা আর একজনের স্মৃতিপূজার জন্য সমবেত হইয়াছি যিনি সম্প্রতি আত্মীয় ও প্রতিভামুগ্ধ জনসাধারণকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি রাজা রাধাকান্তের ঠিক প্রতিরূপ ছিলেন না, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন। রাজা রাধাকান্তকে যদি দেশীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা বলা যায় তবে রামগোপালকে তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে উদারনীতিক সম্প্রদায়ের ও শিক্ষিত সমাজের নেতা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আমাদের আজিকার কার্য অসঙ্গত ও উপযোগিতা-রহিত কিম্বা আমাদের কোনও পাত্রাপাত্র বিচার নাই এবং কোনও রূপে কেহ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেই তাঁহাদিগকে আমরা নিরবিচ্ছিন্ন প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা ধীরভাবে পর্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা আমাদের কার্যে কোনও অসামঞ্জস্য বা অবিবেকতার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন না। কারণ, যে বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছি, তাঁহাদের ধর্ম্মমতে বিলক্ষণ বৈষম্য থাকিলেও তাঁহাবা উভয়েই সেই সকল মহদ্-গুণে ভূষিত ছিলেন, যে সকল গুণ

মানব চরিত্রের যথার্থ অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়—সাধুতা, অধ্যবসায়, বদান্যতা, দানশীলতা, ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রীতি, জনহিতৈষণা পরোপকারের জন্য আত্মবিসর্জনেচ্ছা। স্যর রাজা রাধাকান্ত ও বাবু রামগোপাল উভয়েই খুব অধিক মাত্রায় এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। আপনাদের অনেকেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে এই দুইজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াও ঈর্ষা বা ঘৃণার পরিবর্তে পরস্পরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমি একটি ঘটনা জানি যাহাতে পরস্পরের এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে টাউন হলে চার্টার সভায় রামগোপাল তাঁহার সর্বজন-হৃদয়গ্রাহিণী অগ্নিময়ী বক্তৃতা শেষ করিয়া বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইলে, সেই সভার সভাপতি স্যর রাজা রাধাকান্ত তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রামগোপালকে তাঁহার সুললিত বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রেমভরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন, আপনি আপনার দেশের সেবায় আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হউন। আপনি আমাদের সমাজের মুখপাত্র, আপনি আমাদের জাতির অলঙ্কার স্বরূপ।' রামগোপাল নম্রভাবে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, 'আপনারা আমা হইতে যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপনার মুখ শুনিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। কিন্তু মহাশয়, আমি যতদূর করিতে পারিব, দেশ আপনার নিকট হইতে তদপেক্ষা অধিকতর কল্যাণের আশা করে।'

পূর্ববর্তী বক্তারা অগ্রেই বলিয়াছিলেন যে, রামগোপাল জীবনে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি এতগুলি স্বভাবদত্ত গুণের অধিকারী ছিলেন যে তদ্দ্বারা তিনি তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকথা মুদ্রিত হইয়াছে এবং সাধারণের নিকট সহজলভ্য হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার দেশবাসীর সামাজিক, রাজনীতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির জন্য বিবিধ অনুষ্ঠানে তাঁহার অদ্ভুত পরিশ্রম—যে সকল কার্যের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় থাকিবেন এবং আমাদের উত্তরপুরুষগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন—সে সকলের বিষয় বিস্তারিতভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুতে বঙ্গমাতা তাঁহার একজন অত্যুৎকৃষ্ট সন্তানকে হারাইলেন। অদম্য উৎসাহ, প্রশংসনীয় সাধুতা, অসীম আত্মনির্ভরতা, অবিচলিত অধ্যবসায়, অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও উদারতম হৃদয় তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তিনি কর্তব্যপরায়ণ পুত্র, স্নেহশীল পিতা, আন্তরিক ও অকপট বন্ধু এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে বোধ হয় এমন কোনও যোগ্য ব্যক্তি নাই যিনি তাঁহার পরিত্যক্ত আসন অধিকার করিয়া উহা অলঙ্কৃত করিতে পারেন।

ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারির পরিচালক সমিতি

পূর্বে বলিয়াছি, দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কৈলাসচন্দ্রের অসীম আগ্রহ ছিল এবং বহু বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে তিনি সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশাদি দিয়া এবং ছাত্রগণকে উৎসাহবাক্যাদি দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়া নীরবে শিক্ষার উন্নতি সংসাধিত করিতেন। তাঁহার শিক্ষাস্থল ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর উন্নতির প্রতি চিরদিন তাঁহার দৃষ্টি ছিল। মধ্যে কিছু অবনতি হওয়ায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উন্নতির জন্য উহার পরিচালনভার একটি সমিতির উপর ন্যস্ত হয়। বেঙ্গলী-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার মধ্যম অগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ, যদুলাল মল্লিক, কৈলাসচন্দ্র বসু, 'বেঙ্গলী'র ম্যানেজার বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত ব্যারিস্টার ডব্লিউ, সি, বনার্জী (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) এই সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য সমিতিরি সদস্যগণ সকলেই ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতেই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সমিতিতে থাকিয়া এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিসভা

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র একটি ভীষণ শোকের আঘাত প্রাপ্ত হন। এই বৎসর ২০ সেপ্টেম্বর দিবসে তাঁহার শৈশবের বন্ধু, সতীর্থ ও সহচর, সাহিত্যসেবীর সঙ্গী, অত্যাচারীর চিরশত্রু, অত্যাচারিতের চিরসহায়, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বদেশ-প্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৪০ বৎসর বয়সে জীবনের কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই দারুণ দুর্ঘটনায় দেশব্যাপী শোক উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু কৈলাসচন্দ্রের হৃদয় যে কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। 'বেঙ্গলী'তে তিনি গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐ বৎসর ১৬ নভেম্বর দিবসে বাঙলার জননায়কগণ গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য একটি বিরাট স্মৃতিসভা আহ্বান করেন। শোভাবাজারের সুবিদ্বান রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই শোকসভায় যোগদান করেন। রাজা (পরে মহারাজা) স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কৈলাসচন্দ্র বসু, অধ্যাপক এস্ লব, মৌলবী (পরে নবাব) আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ পত্রের সম্পাদক মিষ্টার জেম্স্ উইলসন, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। এই সভায় কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতাটিই

সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। সকল সংবাদপত্রে এই বক্তৃতাটি প্রশংসিত হইয়াছিল। আমরা এই বক্তৃতাটিরও[৭] মর্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি :

"রাজা কালীকৃষ্ণ এবং ভদ্র মহোদয়গণ,—

যে মহৎ বিষয়ের আলোচনার জন্য আমরা এই স্থানে সমবেত হইয়াছি তাহার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, আমি সে আলোচনায় যথাযথভাবে যোগদান করিতে পারিব কি না আমার মনে এই আশঙ্কা উদিত হইতেছে। কারণ, প্রথমত, যে পরলোকগত মহাত্মার সদ্‌গুণাবলী আজ আমরা কীর্তন করিতে ইচ্ছা তিনি আমার একজন প্রিয়তম ও স্নেহময় বন্ধু ছিলেন। শৈশবে আমাদের বন্ধুত্বের সূচনা হয় এবং তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত উহা অক্ষুণ্ণ ছিল। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন তাঁহার বিবিধ অসাধারণ গুণগুলি সাধারণ কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত হইতেছে ইহাতে আমার মনে সান্ত্বনার পরিবর্তে শোকবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, কারণ যে দুঃখময় ঘটনার বিষয় বিস্মৃত হইয়া আমি মানসিক শান্তির অন্বেষণ করিতেছি উহা সেই দুর্ঘটনার কঠোর সত্যতা আমাকে স্মরণ করাইয়া নিরন্তর শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। কিন্তু যিনি বন্ধুদের গর্বের বিষয় এবং দেশের গৌরব স্থানীয় ছিলেন তাঁহার জন্য শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ্যের জন্য আহূত এই বিরাট সভায় মানসিক শান্তিলাভের প্রয়াস বৃথা। এই ভীষণ ঘটনায় আমি একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি এবং আমার মুখ হইতে বাক্যনিঃসৃত হইবার পূর্বেই আমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমার কর্তব্য আমাকে পালন করিতেই হইবে এবং অতি ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণভাবে উহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেও আমি আপনাদের নিকট কয়েক মুহূর্তের সময় ভিক্ষা করিতেছি। মহাশয়, এই সভায় উচ্চতম উপাধিভূষিত রাজা মহারাজা হইতে আফিসের নিম্নতম পদস্থ কেরানি পর্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন ইহাতে যে নিগূঢ় ভাবের সূচনা করিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করা অসম্ভব। ইহাতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্বের ন্যায় হিন্দুসমাজ এখন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, জাতীয় অভিমান, ঐশ্বর্যগর্ব ও বংশাভিমান দ্বারা কলুষিত নহে, এক সৌভ্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি স্নেহ ও প্রীতিভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইহা আনন্দের বিষয় যে আভিজাত্যগর্ব আজ এতদূর হ্রাস পাইয়াছে। ইহা বর্তমান সময়ে একটি আশা ও আনন্দদায়ক লক্ষণ। যে শিক্ষা দেশের ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বিনষ্ট করিয়া দেয় ইহা নিঃসন্দেহ সেই শিক্ষার ফল। সুতরাং আমি পুনরায় বলি, এই সভা দেশের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির পরিচায়ক। যিনি ঐশ্বর্যে বা পদগৌরবে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র ছিলেন না, অথচ যিনি তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ একজন সাধারণ ব্যক্তির স্মৃতিসভায় যে সকল রাজা জমীদার ও ক্রোরপতি উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা গণনা করিলেই আমাদের দেশ যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা নিজেরাই সম্মানিত হইয়াছেন।

আমার পূর্বেই যে মাননীয় রাজা বাহাদুর বক্তৃতা করিলেন তিনি যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং যে প্রস্তাবটি আমি সমর্থন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি সেই প্রস্তাবে আমার পরলোকগত বন্ধুর চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে তিনি অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতি, প্রশংসনীয় পুরুষকার ও পবিত্র চরিত্রের সহিত সদয়, স্নেহময় এবং সরল ও অকপট স্বভাব, প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁহার প্রবন্ধে ও বক্তৃতাদিতে সেই সকল গুণগুলি অতি উজ্জ্বলভাবে পরিদৃশ্যমান। কিন্তু এই প্রস্তাবে একটি বাক্যপ্রয়োগ করা হইয়াছে যাহাতে সর্বোপরি বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের চরিত্রের যথার্থ ও প্রকৃতস্বরূপ উপলব্ধি হয়। যিনি একদিনের জন্যও বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত পরিচিত হইয়াছেন তিনিই আনন্দের সহিত স্বীকার করিবেন যে তিনি সরল ও অকপট স্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। আজিকালিকার দিনে—বাহিরের চাকচিক্য ও কপট আড়ম্বরপূর্ণ শিষ্টাচার প্রদর্শনের দিনে—সেরূপ ব্যক্তির দর্শন পাওয়া যায় না। আন্তরিকতা বাবু গিরিশচন্দ্রের কোমল হৃদয়ের চিরসঙ্গী ছিল এবং যাহা তাঁহার হৃদয় কর্তৃক অনুমোদিত না হইত বা যাহাতে পরে অনুতাপ আসিতে পারে এরূপ কার্য তিনি কখনও করেন নাই। তিনি অনেক সাংসারিক বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, অনেক পারিবারিক দুর্ঘটনায় ব্যথা পাইয়াছিলেন, বাধ্য হইয়া মামলা মোকদ্দমার অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া দারিদ্র্যে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিদ্র চিরদিন সাধু ও সারল্যমণ্ডিত ছিল। তাঁহার নৈতিক চরিত্র সর্ববিষয়ে আদর্শ স্থানীয় ছিল। তিনি ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই জন্য দরিদ্রপালনে তাঁহার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইত। যদিও তিনি স্বয়ং দরিদ্র ছিলেন তথাপি তাঁহার সেই অল্প আয় অভাবগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সহিত ভাগ করিয়া লইতেন। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে বেলুড়ের অনেক বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকা তাঁহার সাহায্যে প্রাণ ধারণ করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় এবং তাঁহারই মুক্তহস্ত দানে তাঁহার বন্ধু ও সহযোগী স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বসতবাটি নীলাম হইতে রক্ষা পায়। তিনি দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং চিরদিন দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া স্মরণীয় থাকিবেন। গত মহাঝটিকায় বেলুড় এবং তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহের সর্বনাশ হয়। সেই সময়ে তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্বয়ং পদব্রজে গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া সাহায্য ভাণ্ডার হইতে এবং স্বীয় ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া গ্রামবাসীর অভাবমোচন করিয়াছিলেন।

যাঁহাদের সহিত তিনি সংস্রবে আসিতেন তাঁহাদের সকলের প্রতি শিষ্ট ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহার চরিত্রেব সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। তাঁহার জীবনে তিনি কখনও কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ করেন নাই। এরূপ রূঢ় ব্যবহার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে অপরিচিতকে মুহূর্তের মধ্যে পরিচিত এবং পরিচিতকে মুহূর্তমধ্যে বন্ধুরূপে পরিণত করিবার তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। পরিচিত বা অপরিচিত যে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতেন তিনিই তাঁহার নিকট সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু দরিদ্র ও নিরাশ্রয়ের প্রতিই তাঁহার গভীরতম সহানুভূতি ছিল এবং প্রজাপক্ষসমর্থনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। প্রজাপক্ষসমর্থনবিষয়ে তাঁহার যথার্থ অভিপ্রায় কেহ কেহ সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন (যদিও এরূপ অনুমানের কোনও ভিত্তি নাই) যে তিনি

জমিদারদিগের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এতদ্দেশীয় শাসনপ্রণালীর একটি মহা দোষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এরূপ অনুমান নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবল গভর্নমেণ্ট এবং জমিদারগণের মধ্যেই বর্তমান বলিয়াই তিনি ইহার নিন্দা করিতেন। তিনি বলিতেন যে যথার্থ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহাকেই বলা যায় যাহাতে প্রজা তাহাদের জমিতে চিরস্থায়ী স্বত্ব লাভ করিতে পারে। রাজবিধি জমিদারের হস্তে প্রজাপীড়ন, করবৃদ্ধি এবং প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং অনেক অশিক্ষিত, স্বার্থপর এবং উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি জমিদার সর্বদা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দেশের বর্তমান সর্বতোমুখী উন্নতির দিনে এরূপ জমিদার অতি বিরল এবং যেমন একদিকে বাবু গিরিশচন্দ্র এইরূপ নীচাশয় জমীদারদিগকে তাঁহার শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে তীব্র কশাঘাত করিয়া লোকসমক্ষে তাহাদের কলঙ্ককাহিনী প্রকাশিত করিতেন অপরপক্ষে তিনি দেশের গৌরবস্থল, আদর্শ জমীদারবর্গ, যাঁহারা প্রজাগণকে নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় আদর করেন এবং পিতার ন্যায় তাহাদের উন্নতির প্রতি স্নেহশীল দৃষ্টি রাখেন, তাঁহাদের গুণকীর্তন করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিতেন। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বয়ং একজন আদর্শস্থায়ী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা এবং ধর্মজ্ঞানের এরূপ সামঞ্জস্য ছিল যে তাঁহার কার্যে কোনও প্রকার অসংযম বা কপটতার চিহ্ন দেখা যাইত না। তিনি প্রখর কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন কিন্তু এই শক্তি সর্বদাই বিবেক দ্বারা সংযত হওয়ায় তিনি তাঁহার শক্তিশালী লেখনী অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পরের দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করিতেন সেই জন্য তাঁহার ভাষাও অতিশয় ওজস্বিনী ছিল। কিন্তু তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে বিদ্বেষের লেশ থাকিত না। কোনও ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ বা ঈর্ষার ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি আততায়ীকে বিদ্রূপবাণবর্ষণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন কিন্তু তাঁহার এই ক্ষমতা তিনি অভ্যাস দ্বারা অর্জন করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল না। অসংখ্য ইংরাজী উপন্যাস ও সমসাময়িক সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে তিনি এই শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাপদ্ধতিতে এমন একটি মনোহারিত্ব, লালিত্য ও ওজস্বিতা ছিল যে অন্যান্য দেশীয় লেখকগণের ইংরাজী রচনা হইতে তাঁহার রচনা অনায়াসেই পৃথক করা যাইতে পারে। হিন্দু পেট্রিয়ট, রেকর্ডার এবং বেঙ্গলীর স্তম্ভে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন, গিরিশবাবুর লিখিত প্রবন্ধগুলি যেন তাঁহার নামাঙ্কিত বলিয়া প্রতিভাত হইবে। সেগুলি এরূপ বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত যে দেশীয় কোনও লেখকের রচনা তাহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কিন্তু মৌলিকতার জন্যই তাঁহার রচনাগুলি বিশেষরূপে আদৃত হইত। তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার রচনাগুলি অতুলনীয় ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। আমাদের মধ্যে এখন অনেক নবীন ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগকে তিনি নিজ রচনাপদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা এক্ষণে ইঁহাদের প্রতিভাশালী গুরুর সমকক্ষ হইবার আশায় তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত আছেন। বাস্তবিক তিনি অনেককেই বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার শেষজীবন তিনি বেলুড় নামক ক্ষুদ্র গ্রামের—যেখানে তিনি ইদানীং বাস করিতেছিলেন—সেই গ্রামের

সর্ববিধ উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে বেলুড়ের বিদ্যালয় সামান্য পাঠশালা হইতে একটি প্রথম শ্রেণীর এন্‌ট্রান্স স্কুলে পরিণত হইয়াছিল। তিনি যখন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন তখন তাঁহারই উদ্যোগে বেলুড়ের স্বল্পপরিসর গ্রাম্যপথগুলি প্রশস্ত রাজবর্ত্মে পরিণত হইয়াছিল। যেখানে স্যর রিচার্ড টেম্পল ডাক্তার মৌয়েট প্রভৃতি মনীষীগণ সুললিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন, সেই হাওড়া ইনস্টিটিউট তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুতে এই সভা একজন উপযুক্ত ও কৃতবিদ্য সভাপতি হারাইল।

অতএব যে দিক হইতে দেখি, তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা কিছুতেই পূরণ হইবার নহে। একজন সাধু, ধর্মপ্রাণ, উদার দেশহিতৈষী, শান্তস্বভাব, অকপটহৃদয়, পরদুঃখ-কাতর, সৎসাহসসম্পন্ন, তীক্ষ্ণপ্রতিভাশালী, ভাবুক, সুলেখক ও স্বাধীনচেতা কর্মবীর দেশ হইতে অপসৃত হইলেন। দেশের কল্যাণের জন্য দেশের সেবা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার অকালমৃত্যু জাতীয় দুর্ভাগ্যের বিষয়। বর্তমান মনের অবস্থায় আমার পক্ষে আর কিছু বলা অসম্ভব। ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে একজন কবি আমার বর্তমান মনের অবস্থা আমার প্রাণের ভাষায় পূর্বেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

"চিরপ্রিয় বন্ধু মোর! প্রীতির আধার !
নিষ্ফল এ অশ্রুবৃষ্টি চিতায় তোমার!
মৃত্যুযন্ত্রণায় যবে করিল অস্থির,
প্রাণবায়ু ঘনশ্বাসে হইল বাহির,
প্রতিশ্বাসে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম কত,
কি ফল হইল তাহে? সর্বআশা হত!
ক্রন্দনে যমের গতি রোধিবারে নারে।
দীর্ঘশ্বাসে মৃত্যুবাণ কে ফিরাতে পারে?
তাহা যদি হ'ত তবে এখনো নিশ্চয়
রহিত জুড়াতে মোর তপ্ত আঁখিদ্বয় ;
গরবে হরষে তব বন্ধুর হৃদয়
উচ্ছ্বসিত হত লভি তোমার প্রণয় !
ধীর শান্ত আত্মা তব বদ্ধ মায়াপাশে,
এখনো বিলম্বে যদি চিতাভস্ম পাশে,
দেখ লেখা এ অন্তরে কি শোকের ছবি,
প্রকাশিতে নারে তাহা শিল্পী কিম্বা কবি।"

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়, কৈলাসচন্দ্র তাহার অন্যতম সম্পাদক হন। তাঁহার চেষ্টায় এই স্মৃতিসমিতি কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ দ্বারা গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাস্থান ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে একটি ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

পরলোকগমন ও চরিত্র

কৈলাসচন্দ্রের স্বাস্থ্য বরাবর অটুট ছিল। তিনি দীর্ঘকাল কর্ম করিয়া ছিলেন, কিন্তু ছুটি লন নাই। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে এবং তিনি তিন মাস ছুটি লইতে বাধ্য হন। এই বৎসর ১৮ আগস্ট দিবসে বৃদ্ধা জননী, শোককুলা সহধর্মিণী ও অসংখ্য আত্মীয় ও বন্ধুগণকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কৈলাসচন্দ্র ৫১ বৎসর বয়সে অকালে পরলোকগমন করেন।

কৈলাসচন্দ্র দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী, উদারচরিত্র, বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। কৈলাসচন্দ্রের জননীও যেরূপ বুদ্ধিমতী সেইরূপ করুণহৃদয়া রমণী ছিলেন। জননীর আদেশ কৈলাসচন্দ্রের নিকট বেদবাক্য ছিল। আমরা একটি ঘটনার কথা শুনিয়াছি তাহাতে একদিকে যেমন কৈলাসচন্দ্রের মাতৃভক্তির পরিচয়, অপরদিকে তেমনই তাঁহার জননীর উচ্চহৃদয়ের পরিচয়প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে ঘটনাটি এই। সহকারী কন্ট্রোলার জেনারেলের পদে উন্নীত হইবার পর একদিন কৈলাসচন্দ্রের জননী তাঁহাকে বলিলেন, "কৈলাস, এবার তুমি প্রথম যে মাইনে পাবে তাহা আমাকে দিতে হবে।" পরে ঐ পদের প্রথম বেতন পাইলে কৈলাসচন্দ্র গাড়ি হইতে অবতরণ না করিয়া জননীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মা আজ মাইনে পাইয়াছি, টাকা কিসে লইবে?"

জননী বলিলেন, "এই আঁচলে দাও।" তিনি তৎক্ষণাৎ ৮০০ৼ টাকা তাঁহার আঁচলে ঢালিয়া দিলেন। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত টাকা পাড়ার গরীব দুঃখীদের ডাকিয়া বিতরণ করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলের মাহিনা বাড়িয়াছে তোমরা আশীর্বাদ কর।"

তদানীন্তন প্রথানুসারে বাল্যকালেই কলিকাতা (শ্যামবাজার) নিবাসী (ছাপরার প্রসিদ্ধ উকিল) পরলোকগত যদুনাথ মিত্র মহাশয়ের ভগিনীর সহিত কৈলাসচন্দ্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার সহোদর যদুনাথ বসু মহাশয়ের পুত্রদেরই তিনি পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতেন। আর একজন বালক কৈলাসচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাত নন্দলাল বসুর দৌহিত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনবিহারী এবং ভাগিনেয় নরেন্দ্রনাথ দত্ত ভবিষ্যতে যশস্বী হইবেন দূরদর্শী কৈলাসচন্দ্র এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ "বিবেকানন্দ" নাম গ্রহণ করিয়া জগতের ইতিহাসে তাঁহার উচ্চহৃদয়ের ও গভীর জ্ঞানের নিদর্শন রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। বিপিনবিহারী ভারতীয় গভর্নমেন্টের দপ্তরে কার্য করিতেন এবং ইংরাজীতেও কৃতবিদ্য ছিলেন কিন্তু জীবনের কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন।

কৈলাসচন্দ্র বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি অনেক দরিদ্রসন্তানকে অন্নদান এবং বিদ্যালয়ের বেতন ও পুস্তকাদি প্রদান করিতেন। একজন দরিদ্রসন্তান তাঁহারই

সাহায্যে বি-এ পাশ করিয়া, তাঁহাকে বলেন, "আমি আপনারই কৃপায় কৃতবিদ্য ও উপার্জনক্ষম হইয়াছি, এক্ষণে আপনার কোনও উপকার করিতে পারি?" তদুত্তরে তিনি বলে, "তুমি নিজে যেমন কৃতবিদ্য হইয়াছ সেইরূপ চারিটি দরিদ্র সন্তান যাহাতে তোমার মত কৃতবিদ্য হয় তাহাই কর।" বলা বাহুল্য, সেই কৃতবিদ্য ব্যক্তি কোনও কলেজের অধ্যাপক হইয়া তিনি চারিজন দরিদ্রসন্তানকে আপনার বাটীতে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। সদ্গুণ সর্বত্রই সদ্গুণের উত্তেজক।

কৈলাসচন্দ্র ইংরাজীতে সুলেখক ও বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া সর্বজনপ্রশংসিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন, "In the early years of his life, he (Koylas Chandra) acquired the deserving reputation of being one of the sweetest and most fluent public speakers of the time" কৈলাসচন্দ্র ইংরাজীতে একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না।

কৈলাসচন্দ্র অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। স্বধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্তু স্বজাতির উন্নতির জন্য তিনি অন্ধভাবে দেশাচারের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের তিনি একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি সকল বিষয়ে দেশের ও সমাজের গৌরবের বিষয়। তাঁহার স্মৃতি দেশবাসীর শ্রদ্ধার সহিত পূজনীয়। আজ, তাঁহার মৃত্যুর বহু বৎসর পরে এই অক্ষম লেখনী তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে লেখকের গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধার এই সামান্য অর্ঘ্য প্রদানের অবসর পাইয়া ধন্য হইল।

সূত্রাবলি

১ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের "কলিকাতার ইতিহাস"।
সুবলচন্দ্র মিত্রের অনুবাদ।

২ সুপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই আবেদন পত্রের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

৩ যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি এই সভার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন এবং সর্বপ্রথম এই সভার সভ্য হন তাঁহাদের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য :
এফ্, জে, মৌয়েট এম্ ডি ; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড জেম্স লঙ ; মেজর জি, টি, মার্স্যাল, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার স্প্রেঞ্জার, ডাক্তার গুডিব চক্রবর্তী, এল, চ্যাট, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রাধানাথ শিকদার, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু জগদীশনাথ রায়, বাবু নবীন চন্দ্র মিত্র, বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু রসিকলাল সেন, বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র, বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র দত্ত, বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

৪ সর্বপ্রথমে প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি অধিককাল এই কার্য করেন নাই।

৫ ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। বাল্যকালে উপস্থিত কবিত্বরচনাশক্তির দ্বারা ইনি অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। কথিত আছে একবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে "ভায়ের সহিত দেখা বৎসরের পরে" এই কবিতার পাদপূরণ করিতে বলেন। বালিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "ঘটা করে দিব ফোঁটা অতি সমাদরে।" এই পূজনীয়া মহিলার নিকট হইতে বর্তমান প্রবন্ধলেখক অনেক সাহায্য পাইয়াছেন এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ পাইবার আশা করিয়াছিলেন। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার সময়ে অকস্মাৎ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

৬ ইনি অতি সাধু ও ধর্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ইহাঁর বাসস্থান কোন্নগরে ব্রাহ্মসমাজ, বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার, চিকিৎসালয়, ডাকঘর, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার প্রথম সম্পাদক ও দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎপ্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন

চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মদীয় পরম পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় "নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্মিণীর আদর্শ জীবনালেখ্য" নামক গ্রন্থে ইঁহার বিস্তৃততর জীবন-কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাঁ রচিত 'শিশুপালন' নাক গ্রন্থ এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ইহাঁর সম্বন্ধে অমর কবি দীনবন্ধু লিখিয়াছেন :

"কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল,
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,
শিশু পালনের পিতা প্রশান্ত স্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীয় ভাব।"

শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়, সেই সূত্রে শিবচন্দ্র শ্রীনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন।

৭ মূল ইংরাজী বক্তৃতাটি মৎপ্রকাশিত *Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee* নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

নবাব আবদুল লতিফ

মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! প্রতীচ্যজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আবার আমাদের দেশ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের গভীর অন্ধকার আজ অপসারিত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণতা ও জাতি বিদ্বেষ আজ আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের বিভেদ ও পার্থক্য বিদূরিত হইয়াছে। এক দেশমাতার সন্তান বলিয়া উভয়েই আজ মিলিত হইয়াছে। যে অভিমান, যে বৃথা গর্ব পরস্পরকে এতদিন দূরে রাখিয়াছিল আজ তাহা দূরীভূত হইয়াছে। উৎসবে ও ব্যসনে আজ মুসলমান হিন্দুর সাথী। আজ একের সুখে অপরে আনন্দিত, একের বেদনায় অপরে ব্যথিত, একের আশায় অপরে উৎফুল্ল, একের সাফল্যে অপরে গৌরবান্বিত। কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি শিক্ষাবিস্তারে, কি সাহিত্যসেবায়, কি সমাজ-সংস্কারে আজ হিন্দু মুসলমান এক মন এক প্রাণ হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। বহু শতাব্দীর সহবাস সত্ত্বেও যাহা সুদূরপরাহত বিবেচিত হইয়াছিল, প্রতীচ্যজ্ঞানের মোহন স্পর্শে আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে, যখন দুর্ভেদ্য মোহান্ধকার ভেদ করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানের অরুণকিরণরেখা সর্বপ্রথমে আমাদের দেশে নিপতিত হইয়াছিল, তখন কেবলমাত্র উন্নত হিন্দুসমাজের অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গগুলিই ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের উপত্যকাভূমিকে সে আলোক-কিরণ স্পর্শ করে নাই। মুসলমানগণের রুদ্ধবাতায়ন কক্ষেও সে আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহারপর যখন ক্রমে ক্রমে উপত্যকা ভূমিগুলিও আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, যখন রামমোহন, দ্বারকানাথ, হরিশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রামগোপাল, রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণমোহন, কিশোরীচাঁদ,

প্যারীচাঁদ প্রভৃতি মনীষীগণের প্রতিভার প্রতিফলিত জ্যোতিতে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর আলোকিত হইয়া উঠিল, লোকশিক্ষা বিস্তৃতিলাভ করিল, জীবনপ্রভাতের উৎসাহ ও আনন্দের কোলাহলে সমগ্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠিল, তখনও পূর্বগৌরবভ্রষ্ট মুসলমানগণের রুদ্ধবাতায়ন উন্মুক্ত হয় নাই। "কোরাণে যাহা নাই তাহা অপাঠ্য, কোরাণে যাহা আছে তাহা অন্যত্র পাঠ করা বাহুল্য মাত্র"—কালিফ ওমারের এই উপদেশ অনুসারে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের আশীর্বাদ চিহ্নস্বরূপ প্রেরিত এই জ্ঞানসূর্যকে অভিনন্দিত করেন নাই। ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে, যখন সমগ্র ইউরোপ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন যে মুসলমানগণ স্পেন দেশের গ্রেনাডা ও সিভিলের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্ঞানশলাকা প্রজ্বলিত করিয়া ইউরোপের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়াছিলেন, বোগদাদের চিরস্মরণীয়কীর্তি কালিফগণের অভ্যুদয়কালে যে মুসলমানগণ গ্রীক্ ও সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া আপনাদিগের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় মোগল সম্রাটগণের প্রতিষ্ঠাকালে আকবরের বিশ্বস্ত সচিব ও সহচর ফৈজী ও ভাগ্যহীন সম্রাটপুত্র দারাশেখো প্রমুখ যে মুসলমান পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে জ্ঞানরত্ন উদ্ধার করিয়া স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই মুসলমানগণের বংশধরগণ তাঁহাদের পূর্বগৌরবকাহিনী বিস্মৃত হইয়া স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে কুসংস্কারের দৃঢ়নিগড়ে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সময়ে একজন মুসলমান এই আলোক রেখায় জাতীয় জীবনের উন্নতির পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বধর্মাবলম্বিগণকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রাণপণ প্রযাস পাইয়াছিলেন। রামমোহন, রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাশালী হিন্দুদেশনায়কগণ অপেক্ষাকৃত উন্নত হিন্দু সমাজের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বিদূরিত করিতে ও লোকশিক্ষা বিস্তৃত করিতে যে বাধা ও বিঘ্নপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, হিন্দুর অপেক্ষা রক্ষণশীল অথচ অবনতিগ্রস্ত মুসলমান সমাজে জ্ঞানালোক-বিস্তারের চেষ্টায় সহায়হীন নবাব আবদুল লতিফকে কিরূপ পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আজ মুসলমান তাহার পূর্বগৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ মুসলমান কর্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই তাহার কৃতিত্ব দেখাইতেছে। দেশের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে মুসলমান তাহার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছে, রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রীসভায় সচিবের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছে, অতুলপ্রতাপান্বিত ভারত সম্রাটের সেক্রেটারী অব ষ্টেটের মন্ত্রীসভায় মুসলমান উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য সুসম্পন্ন করিয়াছে। মুসলমান ইহাপেক্ষাও উচ্চতর কার্য সংসাধিত করিয়াছে। অসংখ্য ঘটনায় সে তাহার মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছে—জাতি-ধর্মনির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর উন্নতির জন্য সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, অত্যাচারীর বেত্রদণ্ড হইতে দুর্বলকে রক্ষা করিয়াছে। যে শিক্ষার দ্বারা মুসলমান এই

সকল মহাকার্য সংসাধিত করিতে সমর্থ হইয়াছে—এতদ্দেশে সেই শিক্ষা বিস্তারের যথার্থ ইতিহাস যদি কখনও লিপিবদ্ধ হয় তাহা হইলে নবাব আবদুল লতিফের নাম সর্বাগ্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। কারণ সুপ্রসিদ্ধ স্যর সৈয়দ আহম্মদ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রচারব্রত মুসলমানগণের বহুপূর্বে নবাব আবদুল লতিফ রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের সমস্ত দুরতিক্রমণীয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এতদ্দেশীয় মুসলমানগণের মধ্যে প্রতীচ্যশিক্ষা বিস্তারের আয়োজন করিয়াছিলেন। আবদুল লতিফের স্মৃতিসভায় বঙ্গের সুসন্তান লোকশিক্ষাপ্রচারব্রত মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন :

To Abdool Luteef belongs the unique honour of being the pioneer of English education among the Mahomedans of Bengal. We all admire the great work of Sir Syed Ahmed—the Anglo-Oriental College at Allygurh.

But before Sir Syed Ahmed was on the field, Abdool Luteef was there, exhorting, supplicating, entreating, earnestly appealing to his co-religionists to give their sons an English education, if they wanted to hold their own, in competition with Hindus. Those who enjoy the fruits of the labors of reformer are not always in a position to estimate aright the difficulties by which he was surrounded at the outset, and the efforts which he had to put forth to overcome them. In the case of Abdool Luteef, the difficulties of his position were aggravated by religious considerations. It was asserted that the liberal creed of Islam discountenanced English education."**

অর্থাৎ আলিগড়ের সুপ্রসিদ্ধ এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের জন্য আমরা স্যর সৈয়দ আহম্মদকে সম্মান করি, কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা আবদুল লতিফই প্রথম করেন।

স্যর সৈয়দ আহম্মদের পূর্বেই আবদুল লতিফ এই কার্যে ব্রতী হন। হিন্দুদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সমান হইতে হইলে মুসলমানদিগকে ইংরাজী শিখিতে হইবে এ বিষয়ে তিনি সর্বদা সকলকে বলিতেন। এই শিক্ষাবিস্তার কার্যে প্রথমে যে কত বাধা ছিল, তাহা সকলে ধারণাও করিতে পারেন না, আর সে বাধা কাটাইতে যে তাঁহাকে কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহাও ধারণাতীত। সকলে বলিত যে ইংরাজী শিক্ষা ইসলাম ধর্ম সম্মত নহে। এই যুক্তি তাঁহার কার্য আরও কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু, উদার-হৃদয় স্যর হেন্‌রী কটন যথার্থই বলিয়াছেন :

It is absolutely true that Nawab Abdool Luteef did more to encourage the progress of education among Mahomedans than any other man in Bengal.

অর্থাৎ আবদুল লতিফ মুসলমানদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছেন বঙ্গদেশে আর কেহ সেরূপ করেন নাই। ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে।

আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মাধিকারী সূক্ষ্মদর্শী স্যর কোমার পেখারাম নবাব আবদুল লতিফের জীবনের কার্য সমালোচনায় বলিয়াছেন :

> The real work of Abdool Luteef's life, as far as I can gather from the enquiries which I have made, was in connection with education in this country, more particularly with the education of his own co-religionists. He was a man who at an early period of the century realized the fact that we live in an age of progress, that things are changing around us, and that the wants and the wishes of men are changing, and being affected by the rapid means of communication with other parts of the world, and by other circumstances. He realized the fact that to enable the young men of this country to compete successfully and to take their proper places in the world generally and in their own country it was necessary that they should educate themselves and receive education which should enable them to obtain the benefits which are open to educated men.
> He found his countrymen backward in modern education. He devoted a great part of his life, I may say his whole life was devoted, to endeavour to provide for them the means of education, which they were in a position to secure. This, as I said, was the work to which he devoted his life.

"আমি যতদূর জানি মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টাই আবদুল লতিফের জীবনের প্রধান কাজ ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যাতায়াত ও খবরাখবরের সুবিধার সঙ্গে পৃথিবীর একটা বিরাট পরিবর্তন হইতেছে। আর এই দেশের লোককে এই পরিবর্তিত ও উন্নতিশীল জাতিসঙ্ঘের মধ্যে নিজের উপযুক্ত স্থান লইতে হইবে, উপযুক্ত শিক্ষা পাইতে হইবে। শিক্ষিত লোক যে সব সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছেন তাহা পাইতে হইলে তাহাকেও সেইরূপ ভাবে শিক্ষিত হইতে হইবে।

কি উপায়ে এই দেশের লোক শিক্ষা পাইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগের জন্য তিনি সারাজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।"

নবাব আবদুল লতিফ কেবল আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাই নহে, তিনি 'মুসলমান সাহিত্যসভা'র (Mahomedan Literary Association) প্রতিষ্ঠা করিয়া তদ্দারা দেশের বহুবিধ কল্যাণকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তিনি গভর্নমেণ্ট ও মুসলমান সমাজের মধ্যে সেতুস্বরূপে বিরাজিত ছিলেন। গভর্নমেণ্টের কোনও কোনও ব্যবস্থার জন্য অশিক্ষিত অথচ ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ বহুবার উত্তেজিতপ্রায় হইয়াছিল, তিনিই তাহাদিগকে প্রতিবারে গভর্নমেণ্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া শান্ত করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে গভর্নমেণ্টকেও

তৎপ্রস্তাবিত ব্যবস্থার যথোচিত পরিবর্তন করাইয়াছিলেন। তিনি গভর্নমেণ্ট ও দেশীয় সমাজ উভয়েরই সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় মুসলমানগণ যে কতদূর উপকৃত হইয়াছেন তাহা বক্তব্য নহে। সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একস্থানে লিখিয়াছেন—

To his own community in both its sections, Shea and Soonee, he was of incalculable service. He loved to call himself the representative of the Mahomedans. He was their guide, philosopher, and friend.

The Mahomedan society, and interest of the day is of his making.

"বর্তমান মুসলমান সমাজ তাঁহারই সৃষ্ট।

সিয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায়েরই উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। নিজেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলিতে তিনি গৌরব ও আনন্দ উপভোগ করিতেন। বাস্তবিক তিনি একাধারে মুসলমানদের নেতা, ধর্মগুরু ও বন্ধু।"

কিন্তু কেবল স্ব-সম্প্রদায়ের হিতসাধন ও উন্নতির চেষ্টাতেই মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন নাই। সকল সম্প্রদায়ের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতিই উদারহৃদয় আবদুল লতিফের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। মুসলমানের সহিত হিন্দুর আজ যে প্রীতিসম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে ইহার জন্য উভয় সম্প্রদায়ই আবদুল লতিফের নাম কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ করিবেন। আবদুল লতিফের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাব সঞ্চারিত করা। দেশপ্রাণ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একস্থানে বলিয়াছেন :

The late Nawab Bahadur was a familiar figure in Hindoo gatherings and social parties. He was the guide, philosopher and friend of many a head of a Hindoo family. If there was one creed more than another which-was the creed of his heart and of his affections it was this—that Hindoos and Mahomedans should live together in peace, and amity and concord, and in the cultivation of those mutual charities which contribute alike to the happiness of the people and the purposes of an enlightened and beneficent administration.

অর্থাৎ স্বর্গীয় নবাব বাহাদুরকে প্রায়ই হিন্দুদিগের সভাসমিতিতে দেখা যাইত। নবাব বাহাদুর অনেক হিন্দুপরিবারের প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

তিনি বলিতেন হিন্দু মুসলমান মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে দেশের লোকে সুখে শান্তিতে থাকে ও দেশের শাসনকার্য শান্তিতে নির্বাহ হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

কেবল হিন্দুর সহিত নহে, সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিতই নবাব আবদুল লতিফ প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। সুদক্ষ রাজকর্মচারী বলিয়া নহে, কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক বলিয়া নহে, সঙ্কীর্ণতা ও জাতি-বিদ্বেষের অন্ধকূপ হইতে মুসলমানগণকে উদ্ধার করিয়া সকল

সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদিগকে মিলিত করিয়াছিলেন বলিয়া নবাব আবদুল লতিফ এতদ্দেশীয় মুসলমানগণের জাতীয়জীবনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। লর্ড ল্যান্সডাউন যথার্থই বলিয়াছেন :

Nowab Abdool Luteef owed his position not only to his official services, or to his connection with numerous public bodies, or to the distinctions and decorations which had been bestowed upon him but to the fact that he devoted his life to the promotion of two great principles, the encouragement of education amongst his Mahomedan fellow-subjects, and the promotion of confidence and good-will between those who professed his own religion and their Hindoo and European neighbours.

অর্থাৎ নবাব আবদুল লতিফ দেশে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা যে তিনি বড় সরকারি চাকরি করিতেন, অথবা তাঁহার এত বড় লোকদের সঙ্গে জানাশুনা ছিল অথবা তিনি যে অনেক রাজ সম্মান পাইয়াছিলেন তাহার জন্য নয়। মুসলমানদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা ও হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য জাতির মধ্যে সৌহার্দ স্থাপন ইহাই তাঁহার সম্মান লাভের কারণ।

"উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"—এই মহাকাব্যের সার্থকতা নবাব আবদুল লতিফের জীবনে যেরূপ উপলব্ধি হইয়াছিল, এরূপ অতি অল্পলোকের জীবনেই পরিদৃষ্ট হয়। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র বলিয়াছিলেন :

It is difficult to name a single resident in this vast community fo Calcutta, who was more popular and who had a larger number of friends and admirers than Nowab Abdool Luteef.

"কলিকাতার এই বিরাট জনসঙ্ঘের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি নবাব আবদুল লতিফ হইতে বেশী জনপ্রিয়।"

সকল সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়াই তিনি দেশের উন্নতি সাধনে সংকল্প করিয়াছিলেন। 'সংহতিঃ কার্যসাধিকা' এই ঋষিবাক্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী দেশনায়ক ছিলেন। দেশের কল্যাণকর সকল সৎকার্যে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও গভর্নমেন্টের নীতির তীব্র সমালোচনা দ্বারা বা দেশবাসীকে নিষ্ফল রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে উত্তেজিত করিয়া কার্যসিদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইতেন না। কেহ কেহ এইজন্য তাঁহাকে গভর্নমেন্টের পক্ষসমর্থক বলিয়া তাঁহার তথাকথিত চরিত্রদৌর্বল্যের অকারণ নিন্দা করিতেন। তাঁহারা বিস্মৃত হইতেন যে নবাব আবদুল লতিফ কোনওপ্রকার বিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন না। সমন্বয়ই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি গভর্নমেন্টের বিপক্ষে কখনও দণ্ডায়মান হন নাই বটে, কিন্তু সে তাঁহার চরিত্রেরই বিশেষত্ব মাত্র। তিনি কাহারও

বিপক্ষ ছিলেন না, সকলকেই তিনি স্বপক্ষে টানিয়া আনিতেন, সমন্বয়ের দ্বারাই তিনি সকল কার্য সহজে এবং শান্তিতে সম্পাদিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। 'ইণ্ডিয়ান নেশনে'র সুধী সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার এই চরিত্রের বিশেষত্বটুকু অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন :

> The Nowab. whose loss we mourn. was brought up in a school which believed that more could be accomplished by conciliation than by contradiction. He was much too dignified to be an agitator but he sympathised with many of the ends of current agitation. If it is true that. he did not offend the officials, it has to e remembered that it was not in his nature to offend any body.
> His universal bonohomie was not a weakness but a strength. It raised him higher than mere intellect has raised others.

নবাব বাহাদুর হুজুগ ভাল বাসিতেন না, কিন্তু দেশের বড় বড় সব আন্দোলনের সঙ্গেই তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল। কাহাকেও কোন বিষয়ের জন্য কষ্ট দেওয়া তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

"His unrivalled social accomplishments have their lesson. Its success in life. like life itself. is an adaptation to environment : let no one aspire success who cannot above all else be social."

এ সার্বজনীন সহৃদয়তা মানব চরিত্রে দুর্বলতার লক্ষণ নহে, বরং শক্তিরই লক্ষণ। এই গুণ এই সত্যেরই প্রমাণ দেয় যে, মানবজীবনকে পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া চলিতে হয়। যে তাহা না পারে, এরূপ সামাজিক যে না হয়, জীবনে সাফল্যের আশা তার বৃথা।

নবাব আবদুল লতিফ যেরূপ গভর্নমেণ্টের সুদক্ষ কর্মচারী ছিলেন, সেইরূপ অকৃত্রিম দেশসেবক ছিলেন, তিনি যেরূপ একনিষ্ঠ স্বধর্মপ্রেমিক ছিলেন, সেইরূপ উদারহৃদয় বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। স্যর উইলিয়ম হন্টার তদ্বিরচিত "Our Indian Musalmans" নামক গ্রন্থে আবদুল লতিফকে তাঁহার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মহাপুরুষগণ কোনও দেশবিশেষের, কোনও জাতিবিশেষের, কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব নহেন। তাঁহারা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের। মহাত্মা আবদুল লতিফের জীবনও কেবল মুসলমানের গৌরবের বিষয় নহে। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি জৈন, কি শিখ, কি মুসলমান, সকলেই এই মহাপুরুষের বহু শিক্ষাপ্রদ জীবন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, উপযুক্ত সাধনা দ্বারা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন, জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবেন। এই আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আমরা কর্মবীর আবদুল লতিফের কর্মময় জীবনের গৌরবময় কাহিনী

লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র, পরলোকগত নবাবজাদা আবুল খয়ের মহম্মদ আবদুল শোভান খাঁ বাহাদুর আমাকে নবাব বাহাদুরের জীবনচরিতের অনেক উপকরণাদি প্রদান করিয়াছিলেন। এবং নবাব বাহাদুরের পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ পাঠ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার নিকট আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্যজীবন

নবাব আবদুল লতিফ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের বংশের আদিপুরুষ খালিদ-বিন্ ওয়ালিদ ধর্মবীর মহম্মদের অন্যতম সহচর ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং বহুদেশে ইস্লাম ধর্ম প্রচার করিয়া "ঈশ্বরের তরবারি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ২১ হিজিরায় ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে কালিফ-গণের রাজধানী তুরস্ক দেশের অন্তঃপাতী বোগ্দাদ নগরে বাস করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে শাহ্ আইনউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া দিল্লিনগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইনি পাণ্ডিত্য ও বদান্যতার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অসাধারণ ধর্মনিষ্ঠার জন্য ইনি সাধু বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইঁহার পুত্র আবদুর রসুল বাদশাহের সনন্দ দ্বারা বার ভুইঞার অধীনস্থ সরকার ফতেহাবাদ চাক্লা, ভূষণা প্রভৃতি পরগণায় (এক্ষণে ফরিদপুর জিলার) বিচারক বা কাজী নিযুক্ত হন। এই স্থানেই তিনি ফতেহাবাদের সমৃদ্ধিশালী জমিদার মস্লজি বয়াজিরে দৌহিত্রী, লস্করদিয়ানিবাসী কুতুব দানিসমন্দের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পরে এইস্থানে চিরকাল বাস করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বাদশাহের নিকট হইতে মৌজা সঙ্কপইলদিয়ায় ১২ খাদ নিষ্করভূমি চাহিয়া লন। ইঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কাজী আবদুল ওয়াহাব মৌজা রাজাবেনী নিবাসী সৈয়দ বাহ্রামের (ইঁহাদেরও আদিনিবাস বোগ্দাদে) কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সনন্দ দ্বারা মৌজা রাজাপুরে ১২ খাদ নিষ্কর জমির অধিকারী হন। এইস্থানের তিনি একটি নির্জন ও দুর্গমপ্রদেশে গৃহনির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। সেকালে জলদস্যুর ভয়ে নদীতীরে ও ডাকাত তথা রাজসৈন্যের ভয়ে প্রকাশ্য রাজপথে ও সুগম প্রদেশে অবস্থান করা নিরাপদ ছিল না। ইঁহাদের বাসস্থান এখনও আবদুল ওয়াহাব কর্তৃক প্রদত্ত 'বারখাদিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। আবদুল ওয়াহাবের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে এই প্রদেশস্থ কাজীর পদ অধিকৃত

করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য ও বদান্যতা, সৌজন্য ও শিষ্টাচারের জন্য, তত্রত্য অধিবাসীগণের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া, উকীল মোক্তারাদির ব্যয়প্রদানে অসমর্থ নিঃস্ব প্রজাগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দিয়া, মুসলমান প্রজাগণের বিবাহ দিতে পৌরোহিত্য করিয়া, তাহাদের বিপৎকালে ও দুর্দিনে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া আবদুল ওয়াহাবের বংশধরগণ রাজাপুরে অতি সুখে ও শান্তিতে কাল অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবদুল ওয়াহাবের পরবর্তীগণের বংশতালিকা পাঠকগণের অবগতির জন্যে নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কাজী আবদুল ওয়াহাব
↓
কাজী মহম্মদ আস্রফ
↓
কাজী আবদুস্ শুকুর
↓
কাজী মহম্মদ রেজা
↓
কাজী ফকির মহম্মদ
↓
নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, সি আই ই

রাজাপুরের কাজীগণ প্রথমে বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন ; কিন্তু বহুবিবাহ প্রথার ফলে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি হওয়ায় এবং মুসলমানগণের ব্যবস্থানুসারে ইঁহাদের বিষয়াদি ক্রমে ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় ইঁহাদের অবস্থা ক্রমশ নিতান্ত অসচ্ছল হইয়াছিল। আবদুল লতিফের পিতা কাজী ফকির মহম্মদ স্বীয় অবস্থার উন্নতিকল্পে বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার সহধর্মিণীর খুল্লতাত মুন্সী বকাউল্লা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। ফকীর মহম্মদ ইঁহার সহকারীরূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। কিছুদিন পরে মুন্সী বকাউল্লার দেহাবসান হইলে বিচারপতিগণ ফকীর মহম্মদকে উকীলের পদে নিযুক্ত করেন। ফকীর মহম্মদ ২৮ বৎসরকাল সম্মানের সহিত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দান ও সৎকার্যে যেরূপ মনোযোগ দিয়াছিলেন অর্থসঞ্চয়ে তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইনি বিলক্ষণ বিদ্যানুরাগী ছিলেন। আরব্য ও পারস্য ভাষায় ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইতিহাস পাঠে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইনি অনেকগুলি সদ্গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত জামি-উল-তাওয়ারীখ নামক পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসগ্রন্থ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। লক্ষ্ণৌ নগরে

এই গ্রন্থ দুইবার লিথোগ্রাফিতে মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজাপুরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কাজী ফকীর মহম্মদের তিন পুত্র। দ্বিতীয় পুত্র আবদুল লতিফের কথাই এই প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়। ইনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পুত্র আবদুল গফুরও গভর্নমেণ্টের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে আবদুল লতিফের ন্যায় পারদর্শী না হইলেও আরব্য, পারস্য, উর্দু ও হিন্দুস্থানী ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। পারস্য-ভাষায় কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করিয়া তিনি তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

শৈশবেই আবদুল লতিফ কলিকাতায় নীত হন এবং কলিকাতাতেই তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আবদুল লতিফ কলিকাতা মাদ্রাসার একজন্য সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহা ছাত্রজীবনের কথা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে কলিকাতার মাদ্রাসার ইতিহাসের দুই একটি কথা স্মর্তব্য।

ইংরাজী শাসনের প্রথমযুগে আমাদের দেশে ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ বাণিজ্যবৃদ্ধি ও রাজস্ব আদায়ের প্রতিই সমস্ত মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। শাসন ও বিচার পদ্ধতিতে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। ব্রিটিশ অধিকারের সহিত দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে কোনও বিদেশীয় রীতি বা আচার প্রবর্তিত হয় নাই। মুসলমানগণের অধিকারকালে দেশে শান্তিরক্ষা ও বিচারকার্যাদি যেভাবে সম্পন্ন হইতেছিল ব্রিটিশ অধিকারের প্রথম যুগেও সেইভাবে সাধিত হইতে লাগিল। মুসলমান ব্যবস্থাশাস্ত্রানুসারে মুসলমান বিচারকগণ কর্তৃক বিচার কার্যাদি নিষ্পন্ন হইতেছিল। সুবাদারগণের আমলে যেমন উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত হইবার জন্য আরব্য ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকার প্রয়োজন ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগেও সেইরূপ এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকা নিতান্ত আবশ্যক ছিল।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ ও বিদ্বান মুসলমান ভারতবর্ষের তাৎকালীন গভর্নর জেনারেল মিস্টার ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে একটি আবেদন পত্র প্রদান করেন। উহার মর্ম এই : মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সহিত ক্রমে ক্রমে মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টাও অন্তর্হিত হইয়াছে। সকল দেশেই প্রজাগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিতরণ রাজপুরুষগণের কর্তব্য বলিয়া গণ্য,—কলিকাতা এক্ষণে ক্রমে ক্রমে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়াছে সুতরাং এখানে মুসলমান বিদ্যালয় সমূহে যেরূপ উচ্চশিক্ষা সাধারণত প্রদত্ত হয় সেইরূপ শিক্ষাবিতরণের জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপিত করা অত্যন্ত আরশ্যক। সম্প্রতি মহম্মদ মজিদউদ্দিন নামে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই প্রদেশে আগমন করিয়াছেন, মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে, ব্যবস্থাশাস্ত্রে, তথা বিজ্ঞানাদিতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার আছে।

একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে ঐ বিদ্যালয়ে মুসলমান বালকগণকে উপদেশ প্রদান করিতে অনুরোধ করা হউক। বিচারকার্যের উপযুক্ত করিবার জন্য মুসলমান ধর্ম ও ব্যবস্থাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা নিতান্ত প্রয়োজন।

এই আবেদনপত্র প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যোৎসাহী মিস্টার ওয়ারেন হেস্টিংস মজিদ-উদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা পরিচালিত করিতে অনুরোধ করেন এবং মজিদ-উদ্দিনও স্বীকৃত হন। প্রথমে মজিদউদ্দিনের বেতন মাসিক ৩০০ টাকা প্রভৃতি মাদ্রাসার সমস্ত ব্যয়ভার ওয়ারেন হেস্টিংস স্বয়ং বহন করিতেন। মজিদউদ্দিনের পাণ্ডিত্যের এত সুখ্যাতি ছিল যে সুদূর কাশ্মীর, গুজরাট ও বোম্বাই হইতেও ছাত্রগণ কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিতেন। এক বৎসরের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা এত বর্ধিত হয় যে ওয়ারেন হেস্টিংস ৫৭,৭৪৫ টাকা ব্যয়ে "বৈঠকখানার সন্নিকটে পদ্মপুকুর নামক স্থানে" মাদ্রাসার সুপ্রশস্ত গৃহনির্মাণ করাইয়া দেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পরে হেস্টিংসকে এই টাকা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন এবং হেস্টিংসের প্রস্তাবানুসারে মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহার্থ একটি সনন্দ দ্বারা মাদ্রাসামহল নামক প্রায় ২৯০০০ টাকা মুদ্রা বার্ষিক আয়ের জমিদারি মজীদউদ্দিন ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তে প্রদান করেন।[১] পরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি এই জমিদারির পরিবর্তে ৩০০০০ টাকা অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ইউরোপীয় সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন।

পাঠকগণ উপরিবর্ণিত বিবরণ হইতে দেখিতে পাইবেন যে পুলিশ ও বিচারবিভাগের উপযুক্ত কর্মচারী গঠন করিবার উদ্দেশ্যেই কলিকাতা মাদ্রাসা প্রধানত প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব্য ও পারস্য ভাষায় মুসলমানগণের ধর্মশাস্ত্র ব্যবস্থাশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়াই মাদ্রাসার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে প্রতীচ্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেওয়া উহার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বিচার বিভাগের কর্তা নায়েব নাজিমের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল যে ফৌজদারী আদালতসমূহে কোনও পদ শূন্য হইলে মাদ্রাসার অধ্যক্ষের প্রশংসা প্রাপ্ত ছাত্রগণকে উহাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।[২]

১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাসার ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই বৎসর একটি ইংরাজী শ্রেণী খুলা হয় কিন্তু মুসলমান ছাত্রগণের ইংরাজী শিক্ষার কোনও আগ্রহ পরিদৃষ্ট না হওয়ায় উহা শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসার একটি স্বতন্ত্র ইংরাজী বিভাগ স্থাপিত হয়।

আবদুল লতিফ প্রথমে মাদ্রাসার আরব্য বিভাগে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের মাদ্রাসার রিপোর্ট হইতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি ঐ বৎসরে ব্যাকরণ ও হিক্‌মতে পারদর্শিতার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ইংরাজী বিভাগে প্রবেশ করেন। তখন অতি অল্প মুসলমান ছাত্রই ইংরাজী শিক্ষার জন্য উৎসুক ছিলেন।[৩]

হিন্দু কলেজে এই সময়ে হিন্দু বালকগণ যে প্রকার আগ্রহ ও অধ্যবসায় সহকারে প্রতীচ্য সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদির জ্ঞানসঞ্চয় করিতেছিলেন তাহা স্মরণ করিলে মুসলমান ছাত্রগণের ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় বিরাগের কারণ সহজে উপলব্ধ না হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা কোনও পরবর্তী পরিচ্ছেদে, মুসলমানগণের মধ্যে প্রতীচ্য শিক্ষা বিস্তারে আবদুল লতিফের চেষ্টার পরিচয় প্রদান করিবার সময়, ইহার যথার্থ কারণ বিবৃত করিব। এক্ষণে ইহা স্মরণ রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে আবদুল লতিফের ছাত্রাবস্থায় কয়েকজন শিক্ষকের ও দূরদর্শী মধ্যবিত্ত মুসলমানের পরিবারস্থ বালক ব্যতীত কেহই ইংরাজী শিক্ষার জন্য উৎসুক ছিলেন না।

আবদুল লতিফ যথেষ্ট উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয় পরিত্যাগ কাল পর্যন্ত আবদুল লতিফ ইংরাজী বিভাগে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসরেই ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ১৮৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা পরিষদ্ গভর্নমেণ্ট সমীপে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন তাহাতে শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডাক্তার মৌয়েটের অনুরোধক্রমে হিন্দু-কলেজের অধ্যক্ষ মিস্টার কার (J. Kerr) মাদ্রাসার ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা উহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে আবদুল লতিফের ছাত্রজীবনের অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিব। কার সাহেব ডাক্তার মৌয়েটকে লিখিয়াছিলেন :

> The first class consists of six students whose names are given in the margin i.e. Abdool Luteef, Waheeddoon Nubee, Nuzue Alee, Mahammad Hossen, Mahamood and Roushan Ali. Only five however were examined, one of them, Roushan Ali being absent.
> The first two in the list who are holders of Scholarships are quite ahead of the rest of the class. Abdool Luteef in particular passed a most creditable Examination. He demonstrated with great readiness two Propositions of the 3rd Book of Euclid and two deductions from Euclid of moderate difficulty, besides answering corrently several questions in Simple equations in Algebra and in Fractions and Proportion in Arithmetic

অর্থাৎ—১ম শ্রেণীতে ৬টি মাত্র ছেলের মধ্যে আবদুল লতিফ একজন। আবদুল লতিফ বিশেষ প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বীজগণিত, পাটীগণিত, ও জ্যামিতির অনেক প্রশ্নের উত্তরে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আবদুল লতিফ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার কর্মজীবনের পরিচয় পরবর্তী পরিচ্ছেদ সমূহে প্রদত্ত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকর্ম

বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিলেও, তখনকার দিনে শিক্ষিত দেশবাসীর উচ্চ রাজকর্ম লাভের সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হইলেও দেশবাসীগণ তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় প্রদানের অতি অল্পই অবসর ও সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর আবদুল লতিফ কি করিবেন, তাহার কোনও স্থিরতা ছিল না।

লর্ড এলেবরা ও নেপিয়ার কর্তৃক রাজ্যচ্যুত কয়েকজন সিন্ধু প্রদেশীয় আমীর এই সময়ে নজরবন্দী অবস্থায় কলিকাতার উপকণ্ঠে—দম্‌দমায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা তখন গভর্নমেণ্টের পেন্সনভোগী। ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সহিত পত্র ব্যবহারাদির জন্য তাহাদের মধ্যে একজন ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ একজন মুসলমান কর্মচারির অন্বেষণ করিতেছিলেন। আবদুল লতিফের আরব্য ও ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান, সুন্দর আকৃতি ও বিনয় সৌজন্যাদি-ভূষিত চরিত্র, সর্বতোভাবে তাঁহাকে এই কাজের উপযুক্ত করিয়াছিল। তিনি এই আমীরের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। এই আমীরের অধীনে কার্যকালে আবদুল লতিফ কেবল মাত্র কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাই নহে, অনেক উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন।

কিছুদিন পরে তিনি এই কার্য পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে ঢাকার নবাব আবদুলগণি মিঞার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। পরে মিস্টার স্যামুয়েল্‌স্ নামক জনৈক সিভিলিয়ানের অধীনে কিছু দিন কার্য করেন। তখন মিস্টার স্যামুয়েল্‌স্ জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত কয়েকটি অভিযোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহার পর আবদুল লতিফ পুনরায় শিক্ষাবিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন এবং কলিকাতা মাদ্রাসায় নব প্রতিষ্ঠিত ইঙ্গ -আরব্য বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আবদুল লতিফ বাঙলার তদানীন্তন ডেপুটি গভর্নর স্যর হার্বার্ট ম্যাডক কর্তৃক মাসিক ২০০্ দুই শত টাকা বেতনে আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এবং সেই বৎসর জুলাই মাসে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যায় 'জাস্টিস্ অব্ দি পীসের' ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাঙলার গভর্নররূপে লর্ড ড্যালহৌসী তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে ২৪ পরগণার অন্তর্গত কালারোয়া নামক নূতন মহকুমায়

(এক্ষণে খুলনার অন্তর্গত সারক্ষীরার) শাসন ভার প্রদান করেন। তিনি পরে এই স্থানের কালেক্টরের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন। এই স্থানে অবস্থান কালে আবদুল লতিফ দরিদ্র প্রজাগণের উপর ইউরোপীয় নীলকরগণের অত্যাচার কাহিনী সর্বপ্রথম গভর্নমেণ্টের গোচরীভূত করেন। তাঁহার পরে সার এস্‌লি ইডেন এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করিয়া দরিদ্র প্রজাগণকে এই অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং যেরূপ ইণ্ডিগো কমিশন নিযুক্ত ও নীল বিপ্লব নিবারিত হয়, তাহা শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেই অবগত আছেন। অতঃপর আবদুল লতিফের কার্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া গভর্নমেন্ট তাঁহাকে হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ সাবডিভিসনের শাসনভার প্রদান করেন। এই মহকুমার ন্যায় বিশৃঙ্খল অবস্থা বাঙলার আর কোনও স্থানে পরিদৃষ্ট হইত না। গভর্নমেণ্ট এই মহকুমায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠিত ছিলেন। দাঙ্গাহাঙ্গামা চুরি ডাকাইতি প্রত্যহই হইত। অধিকন্তু স্থানীয় দুর্দান্ত উকীল মোক্তারাদির সহিত কাছারীর আমলাদের এরূপ ষড়যন্ত্র ছিল যে তাহাদের দ্বারা উপস্থাপিত মিথ্যা অভিযোগের জন্য সাবডিভিসন্যাল অফিসারকে প্রায়ই গভর্নমেণ্টের নিকট কৈফিয়ত প্রদান করিতে হইত, কার্যের বিন্দু মাত্র দোষ থাকিলে ত কথাই নাই! বাঙলা গভর্নমেণ্ট এই স্থানে শান্তিস্থাপনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কর্মচারিগণকে প্রেরণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্মচারীগণ এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও এই অশান্তির দুর্নিমিত্তসমূহ সম্পূর্ণ রূপে রহিত হয় নাই। আবদুল লতিফ সরল ব্যবহার ও বিনয়নম্র আচরণে সকলকে শান্ত, ও অসাধারণ কর্মপটুতা ও দৃঢ়তা গুণে শৃঙ্খলাস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাব চাঁদ বাহাদুরের সহিত পরিচিত হন। এখনও বর্ধমান রাজপ্রাসাদে আবদুল লতিফের তৈলচিত্র রক্ষিত আছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আলিপুরে একজন সুদক্ষ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রয়োজন হইলে আবদুল লতিফ জাহানাবাদ হইতে স্থানান্তরিত হন। জাহানাবাদ পরিত্যাগকালে হুগলির তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট লর্ড এইচ, উলিক ব্রাউন (Lord H. Ulick Browne) আবদুল লতিফকে যে উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ একটি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"As the tenure of his office is drawing to a close, his services are acknowledged with thanks, as he has discharged very satisfactorily the duties of a most difficult sub-division, such as Jahanabad, where his loss is to be deeply regretted."—No. 325, dated 27th June 1859.

[মর্মানুবাদ—"তাঁহার কার্যকাল শেষ হইয়া আসিতেছে বলিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার কার্যাদির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। জাহানাবাদের ন্যায় একটা দুঃশাসনীয়

মহকুমার সমস্ত কার্য তিনি প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। জাহানাবাদ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া সমস্ত জাহানাবাদ তার জন্য বিশেষ দুঃখিত।"

কিন্তু তিনি যে কেবল উর্ধতন রাজকর্মচারীর প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই নহে। স্থানীয় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া তাঁহার সৎকার্য সমূহের উচ্চ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের অন্যতম জমিদার সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের প্রধান উকীল, যিনি পরে দেশের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে দেশবাসীর যোগ্যতা সর্বপ্রথমে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন রায়ের সেই স্বনামধন্য পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ইঁহাদিগের নেতৃরূপে আবদুল লতিফের নিকট এই অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। সেকালে এখনকার মত অভিনন্দন পত্রের বাহুল্য ছিল না। গভীর ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই যে স্থানীয় ব্যক্তিগণ এই অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই অভিনন্দন পত্র ও রমাপ্রসাদ রায়ের যে পত্রের সহিত উহা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

To

Maulvie Abdul Lateef Esq.
Deputy Magistrate,
Jahanabad.

Sir,

We cannot permit you to leave this part of the country without attempting to express to you our regret at your removal, and the satisfaction we have enjoyed in having you among us as a magistrate.

The manner in which you have conducted the administration of justice has given general content to great and small.

Those who were capable of judging of your acts have applauded you for your thorough knowledge of your duties, and your strict impartiality on all occasions. But all who have had the opportunity have been gratified by the suavity of your demeanour and your readiness to accommodate yourself to the wants of the public, so that all who have had occasion to approach you or to scan your proceedings have regarded you rather as an umpire selected by themselves to arbitrate their differences, than as a minister of justice entrusted by the state with the power of the sword.

Moreover, not content with reforming the routine duties of your office, you have been solicitious to make yourself useful to the people under your administration by promoting the means of internal communication, and every measure that promised to increase their convenience and advantage.

The inhabitants of this Sub-Division cannot, therefore, but regret that you should so early be taken away from this scene of your honourable and useful labours.

But let us assure you, in bidding you farewell, that they can never fail, wherever you may by located, to fell highly interested in your future happiness and prosperity.

[মর্মানুবাদ—"মহাশয়, আপনি যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিয়া এবং আপনাকে আমাদের বিচার কর্তারূপে পাইয়া কত সুখী হইয়াছিলাম তাহা প্রকাশ না করিয়া আমরা আপনাকে বিদায় দিতে অক্ষম।আপনি যেভাবে বিচার করিয়াছেন তাহাতে ছোট বড় আমরা সবাই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।

আপনার বিচার ক্ষমতায় ও সুব্যবহারে এই দেশবাসী এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে তাহারা মনে করিত, তাদের বিবাদ মিটাইবার জন্য আপনি তাহাদের দ্বারাই মধ্যস্থরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নাই।

সরকারী কাজ করিয়াই আপনি নিশ্চিন্ত হন নাই। আপনার শাসনাধীন লোকদের সর্বতোভাবে সুখ বিধানের জন্য আপনি সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন।"]

Maulvie Abdool Luteef Esq.

Alipore.

My Dear Sir,

I have the pleasure to send you an Address, which has been put into my hands for the purpose, from the principal inhabitants and landholders of that portion of the Hooghly and Burdwan Districts comprised in the Sub-Division of Jahanabad.

You have, I am aware, secured the approbation of your superiors in the ,conduct of your magisterial duties. Nothing was wanting to your satisfaction but to obtain an expression of similar approbation from the people among whom you lived, and to whom you administered justice. I am happy to be able to supply this in the accompanying document.

It will afford you pleasure to see therein the names of some of the most respectable persons spontaneously offering you this testimony of their approbation and esteem.

Calcutta,
27th September, 1859 }

Yours sincerely,
Ramapersad Roy.

[মর্মানুবাদ—"মহাশয়, জাহানাবাদের অধিবাসীর পক্ষ হইতে এই অভিনন্দন আমি আপনাকে পাঠাইতেছি ! সরকার বাহাদুর আপনার কার্যের প্রশংসা করিয়াছেন। দেশবাসীও আপনার গুণগান করিতেছে।"]

আবদুল লতিফও যথোচিত বিনয়ের সহিত এই অযাচিত পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ রায়ের পত্রের উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

To

Babu Ramapersaud Roy Esq.

Calcutta.

My Dear Sir,

Allow me to tender my best acknowledgments for the address from the principal inhabitants and landholders of the Sub-Division of Jahanabad, enclosed in your kind note of the 27th September last.

The gentlemen, who have presented me this token of their kindness and good-will, have been pleased to speak of my services in their District in terms, which I feel to be better suited to guide my future than to describe my past conduct.

You have alluded to the satisfaction I must feel in receiving such testimony, offered so spontaneously by gentlemen of the rank, influence and discrimination of those, who have been pleased to subscribe their names to the address. It has been my object to perform the duties entrusted to me to the best of my humble abilities and judgment, without looking very sanguinely for the approbation of the community with which my office brought me in contact ; but if I have had the good fortune, as the address now before me amply proves, to secure that approbation, I prize it as a reward not to be lightly regarded, nor as small recompense for the hardest labor and most anxious toils.

I repeat, my dear sir, the offer of my heartfelt thanks with which I commenced this letter, to the gentlemen who have been so kind as to express, in such a handsome manner, their approval of my conduct in the district of Jahanabad.

In conclusion allow me to state that if anything could add to the value of the Address I am now acknowledging, it is the act of the subscribes in making you the medium of its presentation.

I remain,
Yours very Sincerely
Abdul Luteef

[মর্মানুবাদ—"আপনার পত্র ও অভিনন্দনের জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আমি এমন কিছু করি নাই যাহাতে আপনারা আমার অত প্রশংসা করিতে পারেন। আপনাদের কথা বরং ভবিষ্যতে আমাকে অনেক সাহায্য করিবে। আমি কায়মনোবাক্যে আমার কাজ সুচারুভাবে করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে লোকের প্রশংসার এত আশা রাখি নাই। কিন্তু আমার কাজে আপনারা যদি সন্তুষ্ট থাকেন তবে আমি নিজেকে গোরবান্বিত মনে করিব।"]

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আলিপুরে পুলিসকোর্ট স্থাপিত হইলে আবদুল লতিফ উহার বিচারপতি নিযুক্ত হন। দশবৎসর এইস্থানে সুখ্যাতির সহিত কার্য করিলে তিনি অস্থায়ীভাবে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১ অক্টোবর তিনি শিয়ালদহ পুলিসকোর্টের বিচারপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর গভর্নমেণ্টের কার্য হইতে অবসর গ্রহণকাল পর্যন্ত এই আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

এস্থলে আবদুল লতিফের বেতনাদি বৃদ্ধির কথা না বলিলে তাঁহার রাজকর্মের ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু পাঠকগণকে সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়া বিরক্ত করিব না। মোটামুটি এই কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২০০ টাকা বেতনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া তিনি তেরো বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ৭০০ বেতনের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৮০০ টাকা হইলে আবদুল লতিফ এই বেতনপ্রাপ্ত হন। গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে আবদুল লতিফের ন্যায় কর্মপটু রাজকর্মচারীও ৮০০ টাকার বেশি বেতন পান নাই! 'রেইস এণ্ড রায়তে'র সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন :

> That was the highest regular pay this faithfull servant of the State, whose name was in every mouth and whose fame filled the whole country and who was not unknown in England among those there who knew anything of India, received from the British Government!

[মর্মানুবাদ—"দেশে এমন লোক ছিল না যে আবদুল লতিফের নাম জানিত না। তাহার সুনাম ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে যাঁরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সামান্য কিছুও জানিতেন, তাঁদের কাছেও আবদুল লতিফের নাম সুপরিচিত ছিল, কিন্তু গভর্নমেণ্টের এই বিশ্বাসী, সুদক্ষ কর্মচারীর বেতন মাসিক ৮০০ টাকার বেশি হয় নাই।"]

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য ব্যতীত আবদুল লতিফ অনেক দায়িত্বপূর্ণ অবৈতনিক রাজকার্যও সম্পাদিত করিয়াছিলেন। নীলকরগণের অমানুষিক অত্যাচার হইতে দরিদ্র

প্রজাগণকে মুক্ত করিয়া বাঙালির যে সমদর্শী শাসনকর্তা আমাদের আবালবৃদ্ধবনিতার চিরস্মরণীয় হইয়াছেন সেই, সূক্ষ্মদর্শী লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর স্যার জন পিটার গ্রান্ট সর্বপ্রথমে মৌলবী আবদুল লতিফের ক্ষমতার অধিকতর সদ্ব্যবহার করিতে সঙ্কল্প করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি আবদুল লতিফকে বোর্ড অব্ একজামিনার্স বা পরীক্ষা পরিষদের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত করেন। আবদুল লতিফ শেষ পর্যন্ত এই পদ অধিকৃত করিয়াছিলেন। এসিস্টান্ট ও ডেপুটিমাজিস্ট্রেট এবং এসিস্টান্ট পুলিস সুপারিন্টেণ্ডগণের জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা পরিষদ (Central Examination Committee) সংগঠিত হইলে আবদুল লতিফ উহারও সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আয়কর কমিশন (Income Tax Commission) নিযুক্ত হইলে সান জন আবদুল লতিফকে উহার অন্যতম কমিশনার রূপে নিযুক্ত করেন। আবদুল লতিফ চারি বৎসর কাল এই কমিশনে নিযুক্ত ছিলেন, এবং কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে নূতন বিধি অনুসারে যাহাতে সুশৃঙ্খলে কার্য হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আয়কর সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া বিনামূল্যে সাধারণে বিতরণ করিয়া এই দুরূহ কার্য সরল ও সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তিকার পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিংযের শাসনকালে দেশীয় সভ্য লইয়া ছোটলাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবার প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে, স্যর জন পিটার গ্রান্ট আবদুল লতিফকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অন্যতম সদস্য নিযুক্ত করেন। মুসলমানগণের মধ্যে আবদুল লতিফই সর্বপ্রথমে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করেন! দুই বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল এই সভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদিত করিয়া বিদায় গ্রহণের সময় সার জনের পরবর্তী লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যর সিসিল বীডন তাঁহাকে এইরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন—

"The Lieutenant-Governor fully recognises the value of services you have rendered to the State as a Member of the Local Legislative, and desires to express his acknowledgments for the valuable counsel and assistance he has received from you."

[মর্মানুবাদ—বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে আপনি যে কাজ করিয়াছেন ছোটলাট সাহেব তাহার প্রশংসা করিতেছেন এবং শাসনকার্যে আপনার সাহায্য ও উপদেশের জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন।]

আবদুল লতিফ ব্যবস্থাপক সবার সদস্যরূপে এই সময়ে (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে) ভাড়াগাড়ির আইন Hackney Carriages Act. এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া উহা অন্যান্য সদস্যগণের প্রবল বাধাসত্ত্বেও বিধিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশীয় সদস্যের পক্ষে একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও বিধিবদ্ধ করা কতদূর কঠিন, তাহা

যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা আবদুল লতিফের ক্ষমতার সমুচিত প্রশংসা করিবেন সন্দেহ নাই। এই আইন বহুদিন আবদুল লতিফের আইন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত The Company of the Crown নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লর্ড এলগিনের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস্টার হলেন মার্লো বাঙলা ব্যবস্থাপক সভায় আবদুল লতিফের কার্য সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন :

> Of Lieutenant Governments, Bengal alone as yet possesses its own Parliament.*** In this Council, Natives have as yet been chosen with almost equal wisdom, and among them one, must here be mentioned. Maulavi Abdul Luteef Khan Bahadur, a Mahammedan, as his name denotes, had won distinction as a classic jurist and supporter of British Institutions in Bengal, and Lord Elgin had availed himself of an early opportunity to appoint him to the Senate of the Calcutta University in the faculty of Law. Of each successive honour his past conduct has well proved him worthy. Somewhat young in years, and younger still in looks, whenever lacked detractors, covert and avowed ; but in corrupt Bengal this can hardly be considered as a matter for surprise, and all admitted to his intimacy must acknowledge that this keen Mussulman formed a valuable element in the Bengal Council, not only as a fluent native counterpoise to special Hindoo interests, so largely represented in that province, but further, as a zealous advocate of well-considered Legislation.

[মর্মানুবাদ—প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলির মধ্যে বাঙলায় একরূপ পার্লামেণ্ট আছে বলিলেই হয়। এই সভায় যে দেশীয় লোককে মনোনীত করা হয় তাঁহারা জ্ঞানে পার্লামেণ্টের সভ্যদের সমান। ইহাদের মধ্যে নবাব আবদুল লতিফ খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ব্যবস্থাশাস্ত্রে ইনি সুপণ্ডিত। বাঙ্গলায় বৃটিশ শাসন-বিধিরও ইনি বিশেষ পক্ষপাতী। লর্ড এল্‌গিন কলিকাতা বিদ্যালয়ের সাহিত্য সমিতির একজন সদস্যরূপে ইঁহাকে নিযুক্ত করেন। বয়সে অপেক্ষাকৃত যুবা বলিয়া অনেকে ইঁহার বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু যাহারা তাঁর সঙ্গে সুপরিচিত হইয়াছেন সকলেই স্বীকার করিবেন যে এই তীক্ষ্ণধী মুসলমানের সদস্যতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমিতির যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

আবদুল লতিফ আরও দুইবার বাঙলায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়োর শাসনকালে স্যর উইলিয়ম গ্রে কর্তৃক এবং পুনরায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে স্যর জর্জ ক্যাম্বেল কর্ত্তৃক আবদুল লতিফ ব্যবস্থাপক সভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনার্থ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শেষবারে তাঁহার নিয়োগ কালে স্যর জর্জ ক্যাম্বেল লিখিয়াছেন :

Belvedere, Alipore,
The 30th December 1872,

My dear Moulvie,—

I dont think the Mahommedan community could be better represented in the Legislative Council than by yourself, and I shall be glad if you will serve for another term. I understand that you have only served two years since you last came in.

Yours Sincerely,
G. Campbell.

(বেল্‌ভেডিয়ার, আলিপুর।
৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৭২)

প্রিয় মৌলবী সাহেব,

মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থাপক সভায় আসিতে পারেন এরূপ লোক আপনার ন্যায় দ্বিতীয় কাহাকেও আমি দেখিতে পাই না। অতএব আপনি যদি আর একবারের জন্য সভ্যপদ গ্রহণ করেন তবে অত্যন্ত সুখী হইব।

আবদুল লতিফের তৃতীয়বার নিয়োগের কিছুদিন পরেই স্যর জর্জ অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পরবর্তী লেফটেনান্ট গভর্নর সুপণ্ডিত ও সুলেখক স্যর রিচার্ড টেম্বলের ব্যবস্থাপক সভাতেই আবদুল লতিফ সদস্যের কার্য নির্বাহ করেন। তাঁহার কার্য সম্বন্ধে স্যর রিচার্ড পরে বোম্বাই হইতে আবদুল লতিফকে লিখিয়াছিলেন, "I have a very favourable impression of your services in the Legislative Council of Bengal!"

এইবারেও সদস্যরূপে আবদুল লতিফ একটি নূতন আইন প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করেন। মুসলমানগণের বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিস্ট্রেশনের আইন (Act 1 of 1876 B.C.) আবদুল লতিফের অসামান্য সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১১ আইন অনুসারে কাজীগণের পদ উঠিয়া গেলে অনেক মুসলমান অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথমত অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মুসলমান, যাঁহারা এই কার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন, তাঁহারা উপায়শূন্য হইলেন। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র ও নিরক্ষর মুসলমানগণ বিবাহ বিষয়ক দলিলাদির একমাত্র রক্ষকের অভাবে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিলেন। সুতরাং মুসলমানগণের বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য রেজিস্ট্রারের পদের সৃষ্টি করিয়া প্রকারান্তরে কাজীগণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আবদুল লতিফ সমগ্র মুসলমান সমাজের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য আবদুল লতিফকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কাজীগণের

উচ্ছেদের প্রস্তাব সর্বপ্রথম উত্থিত হইবা মাত্র আবদুল লতিফ উহার অনিষ্টকর প্রভাব সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং সুবিধা পাইলেই এই বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে আবদুল লতিফের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি কখনও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নিযুক্ত হন নাই। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে লিখিয়াছেন :

> As a legislator he did more valuable work than almost any native member of either the Bengal Chamber or the Vicergal Council. Yet, such is the mystery of patronage under foreign rule that this loyal subject and tried servant was not once-thought of for the Governor General's Council though indifferent men and decidedly inferior ones in every respect, were ofter appointed.

[মর্মানুবাদ—ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে আবদুল লতিফ যে কাজ করিয়াছেন বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার ভারতবর্ষীয় আর কোন সভ্য সেইরূপ করেন নাই, কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে এরূপ সুদক্ষ ব্যক্তি একবারও বড়লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নিযুক্ত হন নাই। অথচ ইঁহার অপেক্ষা সর্ব বিষয়ে অনেক অক্ষম লোকও অনেকবার নিযুক্ত হইয়াছেন।]

ব্যবস্থাপক সভার কার্য ব্যতীত আরও অনেক কার্যে আবদুল লতিফ বিনা পারিশ্রমিকে গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছেন। মুসলমানগণের বিবাহের রেজিস্ট্রারগণের কার্য পরিদর্শনের জন্য আবদুল লতিফের প্রস্তাবানুসারে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে গভর্নমেন্ট যে স্থায়ী পরিদর্শক সমিতি নিযুক্ত করেন, আবদুল লতিফ উহার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

আবদুল লতিফ মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত কোনও বিষয়ে মুসলমানগণের অভিপ্রায় জানিতে হইলেই গভর্নমেণ্ট আবদুল লতিফের পরামর্শ লইতেন। আবদুল লতিফও তাঁহার উদার ও স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া গভর্নমেণ্টকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইলে আবদুল লতিফ উহার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পদের সৃষ্টি হইলে আবদুল লতিফ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি মিউনিসিপ্যালিটির অনেক কার্য করিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য স্মরণ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির সভাগণ আবদুল লতিফের নামানুসারে তালতলা ও কলিঙ্গার মধ্যবর্তী নবনির্মিত পথের নামকরণ করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উপকণ্ঠে স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইলে আবদুল লতিফ উহারও কমিশনর নিযুক্ত হন। এই মিউনিসিপ্যালিটির মুদ্রিত কার্য বিবরণী হইতে আবদুল লতিফের অনুষ্ঠিত কর্মের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আবদুল লতিফ বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বা সভাপতি এবং বরাহনগর বেঞ্চের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। এই কর্ম পরিত্যাগ কালে মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যগণ ভাইস চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি সভা আহ্বান করিয়া আবদুল লতিফকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং আবদুল লতিফের নামানুসারে বেলঘরের একটি নবনির্মিত পথের নামকরণ করেন। সকলের অনুমতি অনুসারে ভাইস চেয়ারম্যান মহাশয় আবদুল লতিফের কার্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যও লিপিবদ্ধ করেন।

"During the time that Nawab Abdool Luteef Khan Bahadoor, has been with us as our Chairman and as President of the Barranuggur Bench, he has done a great deal for us, and though I am confident that the Government which has hitherto delighted to honour him, will not allow him to leave its service without recognising the work that he has done, I think it is our duty to express our gratitude for the kind interests he has always evinced in our welfare, and the valuable assistance he has rendered to us in our first efforts at Municipal Self-Government. A man of sound judgment and principle, he is one of best administrative officers of the day, and I think the Barranuggur Municipality was most fortunate in getting him as their Chairman. If any proof were required of his ability and sound good sense, I think it is furnished in his popularity with the community and the respect which is everywhere shown to him by all classes alike."

[মর্মানুবাদ—"বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও বরাহনগর বেঞ্চে সভাপতি রূপে নবাব আবদুল লতিফ আমাদের জন্য অনেক করিয়াছিলেন। গভর্নমেণ্ট এ পর্যন্ত তাঁহাকে সম্মান করিয়া আসিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস এই কাজের জন্যও সরকার তাঁহার প্রশংসা করিবেন। আমাদের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। নবাব বাহাদুরের মত বিচক্ষণ, কার্যদক্ষ ব্যক্তিকে সভাপতি ভাবে পাওয়া বরাহনগর মিউনিসিপালিটির বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছে, তাহার উপর তাঁর কার্যক্ষমতার কোন আর প্রমাণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।"]

ভারতবর্ষের রাজস্ব সম্বন্ধে কতিপয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের একটি বিশেষ সমিতি নিযুক্ত হইল, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন সেক্রেটারী অব স্টেট এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে কয়েকজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই সমিতির

নিকট সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে বলেন। স্যর জর্জ ক্যাম্বেলের অনুরোধ অনুসারে লর্ড নর্থব্রুক আবদুল লতিফকে এই কার্যের জন্য ইংলণ্ডে যাইতে আদেশ দেন। কিন্তু পর বৎসরের প্রারম্ভেই পার্লিয়ামেণ্ট সভাভঙ্গ হওয়ায় এবং মন্ত্রীসভার পরিবর্তন হওয়ায় আবদুল লতিফকে ইংলণ্ডে যাইতে হয় নাই। এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কি কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারিরূপে, কি মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিরূপে, আবদুল লতিফ গভর্নমেণ্টের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

গভর্নমেণ্টের জন্য ও দেশের উন্নতির জন্য তিনি অন্যান্য যে সকল কার্য করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে যে সকল রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পরে যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। এক্ষণে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আবদুল লতিফ যাহা করিয়াছিলেন আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে তাহার আলোচনা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিক্ষাবিস্তার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানগণের প্রতীচ্য। সাহিত্যবিজ্ঞানাদি শিক্ষায় অনিচ্ছার কথায় উল্লেখ করিয়াছি। মুসলমানগণ কেন সন্তানদিগকে ইংরাজী সাহিত্যবিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিতে আপত্তি করিতেন তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার কারণ অনুমিত হয়। তবে জাতীয় অভিমান এবং স্বধর্মনিষ্ঠা যে তন্মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইংরাজীশিক্ষার সহিত যে বালকগণের স্বধর্মানুরাগ হ্রাস পাইবে এবং জাতীয় আচার ব্যবহারাদির অনেক অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইবে এরূপ আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাকমিশন ও মুসলমানগণের ইংরাজীশিক্ষার অনিচ্ছার প্রধান কারণগুলি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :

মুসলমানদিগের মধ্যে ইংরাজীশিক্ষা বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে নাই। কারণ, কেহ কেহ মনে করিতেন যে মুসলমান ধর্মমত শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় ইংরাজীশিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদিগের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। আবার কেহ কেহ মনে করিতেন যে ইংরাজী শিক্ষা মুসলমান ধর্মমতে অবিশ্বাস জন্মায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতীয়গর্ব পূর্ব গৌরবের স্মৃতি ; ধর্ম ভয় ও মুসলমান শিক্ষানীতির প্রতি অগাধ বিশ্বাস এই সমস্ত কারণেই মুসলমান দিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হয় নাই।

আবদুল লতিফ স্বয়ং ইংরাজীশিক্ষার সুফল লাভ করিয়া স্বজাতীয়গণকে উহার অধিকারী করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। আমরা দেখিয়াছি প্রথম জীবনে তিনি স্বয়ং শিক্ষাবিভাগে শিক্ষকরূপে প্রবেশ করিয়া মুসলমান বালকগণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষালাভের ইচ্ছা বলবতী করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পরে, শাসনবিভাগের দায়িত্বগ্রহণ করিয়াও তিনি কখনও স্বজাতিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তাররূপ সৎকার্যের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হন নাই।

ইতিমধ্যে হিন্দুগণ অসামান্য অধ্যবসায়ের সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্যবিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। বিচার, শাসন ও অন্যান্য বিভাগের পরিবর্তনের সহিত, মুসলমান আইনের পরিবর্তে নূতন আইনের প্রচারের সহিত, বিচারালয়ে পারস্যভাষার পরিবর্তে বাঙলা ও ইংরাজী ভাষা প্রচলনের সহিত ক্রমে ক্রমে মুসলমান উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইতেছিলেন—ইংরাজীশিক্ষিত হিন্দুগণ কর্তৃক অধিকারভ্রষ্ট হইতে ছিলেন। শিক্ষিত হিন্দুগণ সর্বত্রই গুণগ্রাহী সহৃদয় ইংরাজগণের নিকট উচিত সমাদর প্রাপ্ত হইতেছিলেন। মুসলমানগণ মনে করিতে লাগিলেন যে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ হিন্দুজাতিরই সমধিক পক্ষপাতী। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এরূপ জটিল হইয়া উঠিল যে হিন্দু ও মুসলমানসমাজের অসম-তুল্যতা ভবিষ্যতে একটি ভয়ানক রাজনৈতিক বিপদের কারণ হইবে, কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। শিক্ষাপরিষদ বিশেষভাবে মুসলমানগণের শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইলেন। কেন মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিরূপে মুসলমানবালকগণকে ইংরাজীশিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে নানা প্রস্তাব হইতে লাগিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাপরিষদের অন্যতম সদস্য মাননীয় জে আর কলভিন্ এবং আরও কয়েকজন সদস্য শিক্ষিত মুসলমানগণের অগ্রণী আবদুল লতিফের পরামর্শ গ্রহণ করেন। আবদুল লতিফের প্রস্তাবানুসারে কলিকাতা মাদ্রাসায় একটি ইঙ্গপারস্য বিভাগ স্থাপিত হয় এবং উহাতে সেকালের 'জুনিয়র স্কলার্‌সিপ' পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকাদিতে বালকগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়।

ভারতবর্ষের সর্বত্র মুসলমানগণের মধ্যে যাহাতে ইংরাজী শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হয় এই উদ্দেশ্যে আবদুল লতিফ স্বজাতির মধ্যে মহাআন্দোলনের সৃষ্টি করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি একশত টাকার পারিতোষিক প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। 'ইংরাজী শিক্ষার সুফল' সম্বন্ধে পারস্যভাষায় লিখিত সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য এই পুরস্কার ঘোষণা হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখের কলিকাতা গেজেটে এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয় :

প্রথমে এই প্রবন্ধ রচনার জন্য পাঁচমাস মাত্র সময় প্রদত্ত হয় কিন্তু মুসলমান বিদ্বজ্জন সমাজে যাহাতে এই প্রশ্ন যথোচিতরূপে আন্দোলিত হইতে পারে সেইজন্য পরে সময়

বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। আবদুল লতিফের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ হইতেই বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ মুসলমান ধর্মশাস্ত্রাদি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়াছিলেন। মুসলমান সমাজের সর্বাপেক্ষা বিদ্বান ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে চারিজনকে লইয়া একটি প্রবন্ধ পরীক্ষকসমিতি গঠিত হয়। সমিতির সদস্যগণের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য :

(১) কাজী ফজলুর রহমান খাঁ বাহাদুর, কাজী-উন-কাজাৎ।
(২) কাজী আবদুল বারী (কলিকাতার কাজী)
(৩) প্রিন্স মহম্মদ বসিরুদ্দিন (মহীশূর রাজবংশ)
(৪) সৈয়দ শাহ উলফৎ হোসেন (লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও লেখক)

শিক্ষাপরিষদের অন্যতম সদস্য, প্রাচ্য ভাষাদিতে সুপণ্ডিত মিষ্টার জে, আর, কেলভিন্ এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধ প্রাপ্তির পূর্বেই তিনি সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের বিচারকের পদ হইতে যুক্ত প্রদেশের লেফটেনান্ট গভর্নরের পদে উন্নীত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিতেন বাধ্য হন। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বাঙলার তৎকালীন ডেপুটি গভর্নর (পরে বাঙলার প্রথম লেফটেনান্ট গভর্নর) এবং প্রাচ্য ভাষানুরাগী সার ফ্রেড্‌রিক হ্যালিডেকে এই সমিতির সভাপতির আসন প্রদত্ত হয়। সার ফ্রেডরিকের সভাপতিত্বে এই সমিতি প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির বিচার করিয়া বোম্বাই নগরবাসী সার জামসেদজী জিজিভাই পার্শী দাতব্য বিদ্যালয়ের আরব্য ও পারস্য ভাষার অন্যতম শিক্ষক মৌলবী সৈয়দ আবদুল্ ফতেকে পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

আবদুল লতিফের প্রস্তাবানুসারে কলিকাতা মাদ্রাসার জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য পাঠরূপে ইংরাজী পুস্তকাদি পঠিত হইত। কিন্তু মুসলমান বালকগণকে উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। আবদুল লতিফ এইবার মুসলমানগণকে উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হিন্দু কলেজে কেবল হিন্দু ছাত্রগণেরই প্রবেশাধিকার ছিল, মুসলমান ছাত্র লওয়া হইত না। আবদুল লতিফের চেষ্টার ফলে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের পরিবর্তে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হইল এবং উহাতে সকল সম্প্রদায়ের সকল জাতির ছাত্রকে সমান প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারী দিবসে যখন লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক প্রেসিডেন্সী কলেজের বর্তমান গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তখন আবদুল লতিফ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

এই সময়ে হুগলী মাদ্রাসার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। চিরস্মরণীয় দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন মুসলমানগণের যে শিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থদান করিয়া

গিয়াছিলেন, ইংরাজী কর্তৃপক্ষগণ সে শিক্ষার জন্য সেই অর্থব্যয় না করিয়া অন্য কার্যে উহা ব্যয় করিতেছিলেন। মহসীন ফণ্ড হইতে প্রায় বাৎসরিক ৫০,০০০ টাকা হুগলীর কলেজে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের জন্য ব্যয়িত হইতেছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে মুসলমান ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। হুগলী কলেজে হিন্দু ছাত্রগণই ইংরাজী শিক্ষা করিতেন। সুতরাং স্বজাতীয়গণ আরব্য ভাষায় লিখিত ইসলাম ধর্মশাস্ত্রাদির মর্ম অবগত হইতে পারেন, এইরূপ শিক্ষার জন্য মহম্মদ মহসীন যে অর্থদান করিয়া যান, সেই অর্থে হিন্দুগণ ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া ইস্‌লাম ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া মহসীন প্রদত্ত অর্থের সুফল প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের প্রাণে ইহাতে যে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। অধিকন্তু এই সময়ে মহসীন ফণ্ড হইতে পরিচালিত হুগলী মাদ্রাসা উঠাইয়া দিবারও এক প্রস্তাব হয়। মুসলমান সমাজে অসন্তোষ ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণের প্রতিনিধিরূপে আবদুল লতিফ এই সকল ব্যাপার তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নর সার জন্ পিটার গ্রান্ট মহোদয়ের গোচরীভূত করেন। সার জন আবদুল লতিফকে মহসীন ফণ্ড সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। সার জনের অনুরোধানুসারে আবদুল লতিফ মহসীন ফণ্ডের সুব্যবস্থার জন্য একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব রচনা করিয়া উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে সার জনের নিকট প্রেরণ করেন। এই প্রস্তাবটি পরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রস্তাবে আবদুল লতিফ বলেন যে হুগলী মাদ্রাসার সুসংস্কার ও মুসলমান ছাত্রগণের জন্য মাদ্রাসার ইঙ্গ-আরব্য বিভাগের সৃষ্টিকল্পে ঐ অর্থ প্রযুক্ত হউক। বলাবাহুল্য আবদুল লতিফের প্রস্তাব মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া ছিল। হিন্দু সংবাদপত্র সম্পাদকগণ অনেকেই হিন্দু ছাত্রগণের অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কারণ, হুগলী কলেজ তৎকালে বাঙ্গালার সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইত। জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণ হুগলীকলেজের ছাত্র ছিলেন। হুগলী কলেজে মহসীন ফণ্ড হইতে সাহায্য রহিত হইলে উহার অবনতির যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে' আবদুল লতিফের প্রস্তাব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :

> মাদ্রাসা কলেজের অধ্যক্ষ লিজ সাহেব স্থানীয় মহম্মদ মহসিন কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার্থ কলিকাতার একমাত্র বিদ্যালয় থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। মৌলবী আবদুল লতিফ মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপে এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন মহম্মদ মহসিন আরবীভাষার অনুশীলনের জন্য নিজ নামে কলেজ স্থাপন করিয়া বিস্তর অর্থ দিয়া যান : এখানে সেই বিদ্যালয় উঠাইয়া দিলে দাতার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কার্য হইবে, গভর্নমেণ্ট ন্যায় ও যুক্তি

অনুসারে, এ কার্য করিতে সমর্থ হন না। মৌলবী আবদুল লতিফ যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সহজে খণ্ডন করা যায় না বটে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাহা অখণ্ডনীয় বলিয়াও প্রতীয়মান হয় না। মহম্মদ মহসিন লোকের উপকারার্থ অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। যে কার্য দ্বারা অধিকতর উপকার সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ বিষয়ে সেই অর্থ ব্যয়িত হইলে তাঁহার অপ্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? ঐ অর্থ যদি সাধারণের শিক্ষার্থ প্রদত্ত হয়, দেশের অধিকতর উপকার হইবে, তাহা হইলে তাঁহার অধিকতর প্রীতি না জন্মিবে কেন? তবে গভর্নমেণ্ট ঐ টাকা শিক্ষাকার্যে না দিয়া যদি অন্যকার্যে ব্যয় করেন, তাহা হইলে আবদুল লতিফ যে আপত্তি করিতেছেন, তাহা অবশ্যই আদরণীয় হইবে।

উপকার গণনা করিয়া যদি কার্যাকার্য ব্যবস্থা বৈধ হয়, তাহা হইলে আমাদের মতে কেবল মহম্মদ মহসিনের কলেজ কেন মাদ্রাসা উঠাইয়া দেওয়াও বিধেয়। ঐ উভয় কলেজ দ্বারা এ পর্যন্ত সমাজের কোন উপকার হয় নাই, হইবেও যে এরূপ সম্ভাবনা নাই। কয়জন সুশিক্ষিত ছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া নিজে যশোলাভ ও দেশের উপকার সাধন করিয়াছেন? আরবী ভাষা মুসলমানদিগের কেবল ধর্মার্থ শিক্ষা দেয় ; এই ভাষায় কোরাণ লিখিত আছে বলিয়া তাঁহারা তাহা শিক্ষা করেন। এই ভাষা ভারতবর্ষীয় ভাষা নহে। মুসলমানদিগের কোরাণশিক্ষা ব্যতিরেকে তদ্দ্বারা জাতি-সাধারণের কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। সংস্কৃত ভাষা হইতে যেমন ভারতবর্ষের যাবতীয় নূতন ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, আরবী হইতে কি সে প্রকার নূতন কোন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে? উহার দ্বারা কি কোন ভাষার উন্নতি সাধন সম্ভাবনা আছে? ফলত এক্ষণে এদেশবাসী মুসলমানেরা বাঙালি হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদিগের ইংরাজী ও বাঙলা উভয় ভাষা শিক্ষা করিলে যেরূপ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে, আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষায় তাহার শতাংশের একাংশও উপকার সম্ভাবনা নাই। এখানে মাদ্রাসায় প্রতিবৎসর ৩৩,২০০ টাকা মহম্মদ মসিনে ৫৩,৭১২ টাকা ব্যয় হইতেছে। এই একলক্ষ টাকা কি অন্যপ্রকারে ব্যয় করিলে অধিক উপকার হয় না? ঐ একলক্ষ টাকা প্রতিবৎসর শিক্ষাকার্যে ব্যয়িত হইলে মহত্তর উপকার দর্শিতে পারে। তবে মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষার্থ কলিঙ্গাস্কুল নামে যে স্কুলটি আছে, উল্লিখিত মূলধন হইতে কিছু অর্থ লইয়া উহাকে উৎকৃষ্ট করিয়া তুলা উচিত। পারসী ও আরবী ভাষা এককালে উঠিয়া যায় আমাদের এরূপ অভিপ্রেত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এই ভাষায় এক একজন অধ্যাপক হয় তাহা হইলেই চরিতার্থতা হইল। এই দুটি বিদেশীয় ভাষার জন্য এত ব্যয় ও এত আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু যাহারা নিঃস্বার্থভাবে সমপক্ষপাতিত্ব সহকারে এই প্রস্তাবের আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আবদুল লতিফের এই সুচিন্তিত ও সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবের ও তাঁহার স্বজাতিপ্রিয়তার যথোচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বদেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ওজস্বী ও সুচিন্তিত প্রবন্ধে আবদুল লতিফের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সার জন পিটাব গ্রাণ্টও আবদুল লতিফের প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মার্চমাসে এই সর্বজনপ্রিয় শাসনকর্তা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং এই প্রস্তাবানুসারে কার্য আরম্ভ করিয়া যাইতে পারলেন না। তাঁহার অবসর গ্রহণের সহিত এই বিষয়ও কিছুকালের জন্য চাপা পড়িয়া গেল।

শিক্ষাপ্রচারকল্পে আবদুল লতিফের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলোকন করিয়া তৎকালীন গভর্নরজেনারেল লর্ড এলগিন মুগ্ধ এবং আবদুল লতিফকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ফেলো বা সদস্যের পদ প্রদান করেন।

আবদুল লতিফ আজীবন এই পদ অধিকৃত করিয়াছিলেন। এই স্থলে বলা অপ্রসঙ্গিক হইবে না যে লেডী এলগিনও আবদুল লতিফকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। আবদুল লতিফকে তাঁহার স্বামীর ও পুত্রের এক একখানি ছায়াচিত্র উপহার দিয়াছিলেন। লর্ড এলগিনের পুত্র যখন এদেশে গভর্নর জেনারেল হইয়া আসেন তখন তিনি আবদুল লতিফ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত তাঁহার বাল্যাবস্থার ছবি দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার পরিণত বয়সের একখানি ছবি উপহার দিয়াছিলেন।

মুসলমানগণকে হিন্দু ইংরাজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত করিবার উদ্দেশ্যে, মুসলমানগণকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আনিয়া তাঁহাদিগকে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে, আবদুল লতিফ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে Mahammadan Literary Society বা মুসলমান সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম ত্রিশবর্ষকাল এই সভা মুসলমানসমাজের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিল।

কলিকাতা মাদ্রাসায় যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছিল, তাহা আধুনিক শিক্ষার আদর্শের অনুরূপ নহে বলিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কলিকাতা মাদ্রাসা উঠাইয়া দেওয়া উচিত কি না তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈমাসিকের ৪৫ খণ্ডে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ প্রস্তাব করেন যে কলিকাতা মাদ্রাসা বা হুগলী মাদ্রাসা একটি বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়া হউক। তৎকালে কর্তৃপক্ষগণের যথোচিত যত্নের অভাবে কলিকাতা মাদ্রাসার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইলেও মুসলমানগণ এই বিদ্যালয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসবান্ ছিলেন,—অথচ এই বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। স্বজাতির মধ্যে শিক্ষাপ্রচার বিষয়ে অগ্রণী মৌলবী আবদুল লতিফের পক্ষে এই সময়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকা অসম্ভব হইল। তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ জানুয়ারী দিবসে কলিকাতা টাউন হলে আহূত বঙ্গীয়-সমাজ-বিজ্ঞানসভার একটি অধিবেশনে কলিকাতা রিভিউ পত্রের সমালোচকের যুক্তি প্রভৃতির ভ্রম প্রদর্শন করিয়া এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার স্থাপনকাল হইতে মুসলমানগণের শিক্ষার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলেন যে, কলিকাতা মাদ্রাসা রহিত করিলে মহা অনিষ্টের সম্ভাবনা এবং হাজী মহম্মদ মহসীন প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হুগলী মাদ্রাসা রহিত করিবার ক্ষমতা

গভর্নমেন্টেরও নাই। আবদুল লতিফের এই প্রবন্ধটি তৎকালীন বঙ্গেশ্বর স্যার উইলিয়ম গ্রে মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্যার উইলিয়ম কলিকাতা মাদ্রাসার অবস্থা ও পরিচালন সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি তথ্যানুসন্ধানসমিতি সংগঠিত করেন। এই সমিতিতে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিস্টার সি, এইচ ক্যাম্বেল, প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিস্টার জে, সাটক্লিফ ও নবাব আবদুল লতিফ সদস্য নির্বাচিত হন।

এই সমিতিতে আবদুল লতিফ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাই পরে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। এই সমিতির রিপোর্টে হুগলী মাদ্রাসার অবনতির কথারও উল্লেখ ছিল। লেফটেনান্ট গভর্নর বাহাদুর হুগলী মাদ্রাসার উন্নতির জন্যও এই সমিতির পরামর্শ প্রার্থনা করেন। আবদুল লতিফ হুগলী মাদ্রাসার উন্নতি কল্পেও অনুরূপ প্রস্তাব করেন। এই সমিতির প্রস্তাবানুসারে কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার পরিচালন ভার একটি পরিচালক সমিতির উপর প্রদত্ত হয় (২৪ মার্চ ১৮৭১)। এই পরিচালক সমিতির সদস্যগণের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

মাননীয় বিচারক জে, পি, নরম্যান ; মিস্টার সি, এইচ, ক্যাম্বেল ; মিষ্টার জে, সাটক্লিফ ; মিস্টার এইচ্ ফল হ্যারিসন ; কাপ্তেন এইচ্ এস্ জ্যারেট ; প্রিন্স মহম্মদ রহীম-উদ্দীন ; মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর ; কাজী অবদুল বারী ; মুন্সী আমীর আলি খাঁ বাহাদুর ; মৌলবী আব্বাস আলি খাঁ।

আবদুল লতিফ এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং আজীবন এই পদ অধিকৃত করিয়াছিলেন।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আবদুল লতিফ হুগলী মাদ্রাসার সংস্কারকল্পে একটি প্রস্তাব লিখিয়া সার জন পিটার গ্রাণ্ট মহোদয়কে উহা বিচার করিতে অনুরোধ করেন। মহসীন প্রদত্ত অর্থের অনেকাংশ কেবল হিন্দু ছাত্রগণের ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করায় যে মুসলমান ছাত্রগণের আরবী ও পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য যথোচিত উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে না, তাহা অবদুল লতিফ অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত করেন। সার জন অকস্মাৎ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে আবদুল লতিফ তাঁহার পরবর্তী লেফটেনান্ট গভর্নর সার সিসিল বীডন, স্যার উইলিয়ম গ্রে, স্যার জর্জ ক্যাম্বেলকে— এমন কি লর্ড লরেন্স হইতে লর্ড নর্থব্রুক পর্যন্ত সকল গভর্নর জেনারেলকেও মুসলমান ছাত্রগণের প্রতি এই অবিচারের কথা জ্ঞাপন করেন। অবশেষে সার জর্জ ক্যাম্বেল আবদুল লতিফের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারত গভর্নমেণ্টে এই মর্মে আবেদন করেন যে হুগলী কলেজের ব্যয় নির্বাহার্থ গভর্নমেণ্ট হইতে অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হউক, এবং মহসীন প্রদত্ত সমস্ত অর্থ মাদ্রাসাগুলির উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হউক। লর্ড নর্থব্রুক সার জর্জের এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন এবং হুগলী কলেজের পরিচালনার্থ

৫০,০০০ টাকা বাৎসরিক সাহায্য প্রদান করিয়া মহসীন প্রদত্ত অর্থ মুসলমান ছাত্রগণের মধ্যে শিক্ষাবিতরণের জন্য বিনিয়োগ করিতে আদেশ দেন। এতদিন মহসীন ফণ্ড হইতে প্রতি বৎসরে প্রায় ৫৫,০০০ মুদ্রা হুগলী কলেজের পরিচালনার্থ ব্যয়িত হইতেছিল। এক্ষণে সেই অর্থে হুগলী ও কলিকাতা মাদ্রাসার উন্নতি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী জিলার নূতন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা, সর্বত্র মাদ্রাসাসংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা, গভর্নমেণ্ট স্কুল সমূহে পারস্য ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বহুসংখ্যক ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিয়া মুসলমান ছাত্রগণের জ্ঞানচর্চার অভূতপূর্ব সুযোগ প্রদত্ত হইল।[৪] এই নূতন বন্দোবস্তে মুসলমান ছাত্রগণের প্রায় দ্বি-তৃতীয়াংশ ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ইহাতে সমগ্র মুসলমান সমাজ আবদুল লতিফের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ হইলেন। শিক্ষিত মুসলমান সমাজের নেতা আবদুল লতিফ আনন্দের সহিত তৎপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাহিত্য সভা হইলে লর্ড নর্থব্রুক ও সার জর্জ ক্যাম্বেলকে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মুসলমান সমাজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুকের আদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্য লইয়া পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি রূপে আবদুল লতিফ এই সমিতির অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। স্পেক্টেটর পত্রিকার ৯৪ সংখ্যায় এবং স্কটের ট্যালিস্ম্যান নামক গ্রন্থে ইসলাম ধর্মের নিন্দা আছে এবং তাহা পাঠ করা মুসলমান ছাত্রগণের অনুচিত ও আপত্তিকর, তাহা আবদুল লতিফ দেখাইয়া দেন।

শিক্ষা বিষয়ে দেশের অবস্থা সম্যক্ রূপে জানিবার জন্য ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারী পুণ্যস্মৃতি মার্কুইস অব্ রিপন মহোদয় একটি তথ্যানুসন্ধান সমিতি সংগঠিত করেন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার উইলিয়ম হাণ্টার এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। আবদুল লতিফ দেশে শিক্ষাবিস্তার কল্পে জীবনের অধিকাংশ সময় নিযুক্ত করিয়া ছিলেন ইহা কাহারও অবিদিত ছিল না। সুতরাং বলা বাহুল্য তিনি এই কমিশনে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে বাঙালি মুসলমানগণকে প্রাথমিক শিক্ষা বাঙলা ভাষাতেই দেওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহাদের পাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তকে যাহাতে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ যতদুর সম্ভব কম থাকে এবং আরব্য ও পারস্য শব্দ অধিক থাকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৬ ফেব্রুয়ারী দিবসে কলিকাতার নব প্রতিষ্ঠিত National Mahomedan Association মুসলমানদিগের অভাব অভিযোগাদি বিজ্ঞাপন করিয়া ভারত গভর্নমেণ্ট এক আবেদন করেন। উহার এক কপি বেঙ্গল গভর্নমেণ্টে প্রেরিত হয়। লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুক্রমে তাঁহার সেক্রেটারী এই বিষয়ে আবদুল লতিফের অভিমত প্রার্থনা করেন। এই সময়ে হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহীর মাদ্রাসা উঠাইয়া দিয়া উহার পরিবর্তে কেবল মুসলমান ছাত্রগণের জন্য কলিকাতায় একটি ইংরাজী

কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গভর্নমেণ্টের বিচারাধীন ছিল। আবদুল লতিফ ছোটলাট বাহাদুরের অনুরোধানুসারে—A Paper on the present condition of the Indian Mahomedans, and the best means for its improvement'— এই নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮ ফ্রেব্রুয়ারী লেফটেনাণ্ট গভর্নর বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করেন। আবদুল লতিফের প্রস্তাবানুসারে মফঃস্বলস্থ সমস্ত মাদ্রাসাগুলি রহিত না করিয়া গভর্নমেণ্ট কেবল মাত্র রাজসাহী মাদ্রাসা উঠাইয়া দেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থে কলিকাতা মাদ্রাসার উন্নতি সাধন করিয়া উহাকে উচ্চশ্রেণীর কলেজ রূপে পরিবর্তিত করা হয়।

বাঙলা ভাষা ও পাটীগণিতে অধিকার না থাকায় মুসলমানগণ গভর্নমেণ্টর অধীনে সাধারণত চাকুরী পাইতেন না। আবদুল লতিফ বাঙলা শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মিস্টার ক্রফ্‌টকে কলিকাতা মাদ্রাসায় বাঙ্গালা ও পাটীগণিত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন।

দারিদ্রাধিক্যবশত অধিকাংশ মুসলমান ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন না। যদিও আবদুল লতিফের চেষ্টায় মহসীন প্রদত্ত অর্থ হইতে প্রায় দ্বি-তৃতীয়াংশ মুসলমান ছাত্র বিনাবেতনে পড়িতে পাইতেন, তথাপি উচ্চশিক্ষার আরও সুযোগ প্রদান করিবার জন্য আবদুল লতিফ মুসলমানছাত্রগণকে আরও ছাত্রবৃত্তি প্রদানের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন কলিকাতা মাদ্রাসায় পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে আগমন করিলে আবদুল লতিফ তাঁহার বিদ্যোৎসাহী মুসলমান বন্ধুগণকে বলেন যে মাদ্রাসায় রাজপ্রতিনিধির প্রথম আগমন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার প্রদত্ত হউক এবং তাঁহাদের মধ্যে ১৩,৯০০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া প্রস্তাব করেন যে এই টাকা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথচ অন্যবৃত্তি প্রাপ্ত হন নাই এইরূপ ছাত্রগণকে কয়েকটি বৃত্তি, পুরস্কার ও পদক প্রদত্ত হউক। হায়দ্রাবাদের প্রসিদ্ধ ওমরাহ নবাব সামসুল ওমরাহ আমীর-ই-কবীর খুরসেদ সাহ বাহাদুরও আবদুল লতিফের অনুরোধানুসারে বাঙলায় মুসলমান ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য ১৫০০০৲ টাকা দান করেন। বাঙ্গালা গভর্নমেণ্টের একটি রিপোর্ট এই সকল দানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

আবদুল লতিফ অনেক বিদ্বৎসভার প্রধান সভ্যরূপে স্বজাতির কল্যাণের জন্য যে সকল প্রস্তাবাদি পাঠ, জটিল প্রশ্নাদির আলোচনা ও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন, সে সকলের বিবরণ এস্থানে প্রদান করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে আমরা এই পরিচ্ছেদে তাঁহার যে সকল কার্যের উল্লেখ করিলাম তাহা হইতেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে এদেশে মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য যে সকল অগ্রণী প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের অক্লান্ত অধ্যবসায়, অপ্রতিহত উদ্যম ও অবিচলিত উৎসাহের ফলে আজ ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ তাঁহাদের গৌরবময় স্থান পুনরধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আবদুল লতিফের স্থান অতি উচ্চে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুসলমান সাহিত্য-সভা

মুসলমানগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও স্বদেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিবার জন্য, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আবদুল লতিফ মুসলমান সাহিত্য সভার (Mahomedan Literary Association) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার দ্বারা এতদ্দেশীয় মুসলমানগণ যতদূর উপকৃত হইয়াছেন, আর কোনও প্রতিষ্ঠান হইতে তত উপকৃত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। মুসলমান সাহিত্যসভার ইতিহাস এতদ্দেশীয় মুসলমান সমাজের উন্নতির ইতিহাস। সে ইতিহাস যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করা বর্তমান লেখকের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে ত্রিংশৎবর্ষকাল আবদুল লতিফ মুসলমান সাহিত্য সভা দ্বারা স্বদেশ ও স্বজাতির যে কল্যাণ সাধিত করিয়াছিলেন, এই পরিচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে ও স্থূলভাবে তাহার আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ২ এপ্রিল দিবসে আবদুল লতিফের গৃহে মুসলমান সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতা মাদ্রাসার আরব্যবিভাগের প্রধান অধ্যাপক, তৎকালীন মুসলমান সমাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত মৌলবী মহম্মদ ওয়ামীহ এই দিবসে সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং আবদুল লতিফ "ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণের পক্ষে এইরূপ সভার উপকারিতা।" সম্বন্ধে পারস্য ভাষায় লিখিত একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারত গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থা বিভাগের প্রধান অনুবাদক মৌলবী মহম্মদ আবদুল রূফ, তাঁহার সহকারী মৌলবী আবদুল হাকিম ও মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সভার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। মৌলবী মহম্মদ ওয়মীহ, কাজি আবদুল বারী, মৌলবী হাফিজ আজীব, মৌলবী মহম্মদ আবদুল রূফ, মৌলবী আবদুল হাকিম প্রভৃতি পণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তিগণের প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টায় এই সভা অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

১৩ মে তারিখে সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। উহাতে ইতিহাসের উপকারিতা' 'সংবাদপত্রের ইতিহাস' বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি বিষয়ক নানা প্রবন্ধ পঠিত হয়।

এই বৎসর ১৫ জুন তারিখে এই সভার তৃতীয় অধিবেশনে আবদুল লতিফ কৃষি প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সময়ে বঙ্গেশ্বর সার সিসিল বীডন আলিপুরে একটি কৃষিপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছিলেন, কিন্তু জন-সাধারণ এইরূপ প্রদর্শনীর যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকায় তাহাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে প্যারেন নাই। অনেক মূর্খ লোক এরূপ অনুমান করিয়াছিল যে, দেশের ঐশ্বর্য দেখিয়া ছোটলাট বাহাদুর প্রজার কর বৃদ্ধি করিবেন। এই সময়ে

আবদুল লতিফের বক্তৃতা সাধারণের অমূলক ভয় অপনোদনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। আবদুল লতিফ হিন্দুস্থানী ভাষায় এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত করিলে স্যর সিসিল বীডন উহা বাঙলা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। আবদুল লতিফ এই অনুরোধানুসারে প্রবন্ধটি বাঙলায় ভাষান্তরিত করিয়া উহার কয়েক সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরিত করেন।

৭ আগস্ট এই সভার পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হয়। উহাতে একটু নূতনত্ব ছিল। এই অধিবেশনে টেলিগ্রাফ বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ (Asst Director General) মিষ্টার এফ্ সি টীল (F.C. Teale) ইংরাজীতে (Electricity and the Electric Telegraphy) (বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ) সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি দ্বারা বক্তৃতা বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ মুসলমান শ্রোতাগণের জন্য আবদুল লতিফ এই বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে উর্দুভাষায় উহার অনুবাদিত করিয়া বুঝাইয়া দেন। ইতিঃপূর্বে ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ মুসলমানগণের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার কোনও চেষ্টাই হয় নাই। বলা বাহুল্য এই বক্তৃতা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনই শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

এই বৎসর ৬ অক্টোবর যষ্ঠ মাসিক অধিবেশনেও অনেকগুলি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে গাজীপুরের প্রধান সদর আমীন মৌলবী (পরে স্যর কে. সি. এস. আই) সৈয়দ আমেদ খাঁ বাহাদুর কর্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত "দেশাত্মবোধ ও ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পর বৎসর ৩০ মে এই সভার প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনে সভার কার্যপদ্ধতি ও নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হয় এবং কার্য-নির্বাহক সমিতি সংগঠিত হয়। মৌলবী মহম্মদ ওয়ামীহ সভাপতি, কাজী আবদুল বারী ও মৌলবী হাফিজ আজীব মহম্মদ সহকারী সভাপতি এবং নবাব আবদুল লতিফ এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন। তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যর সিসিল বীডন এই সভার অভিভাবক (patron) হন।

দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মিলন দ্বারা পরস্পরের মধ্যে প্রীতিভাব সঞ্চারিত করা এবং ভাবের আদান প্রদান করা প্রথম হইতেই এই সভার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ মার্চ দিবসে কলিকাতা টাউনহলে একটি সম্মিলনের ব্যবস্থা হয়। ইউরোপীয়, হিন্দু, পার্শী, ইহুদী, মুসলমান প্রভৃতি দেশের সকল সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনে বাঙলার তদানীন্তন লেফ্টেনাণ্ট গভর্নর এবং অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষে ইহার পূর্বে এইরূপ Conversazione বা আনন্দ সম্মিলন আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। তৎকালীন সংবাদ পত্রাদি একবাক্যে এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিয়া ছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২ মার্চ তারিখে তৃতীয় বার্ষিক সম্মিলনীতে গভর্নর জেনারেল স্যার জন লরেন্স প্রায় একঘণ্টা কাল উপস্থিত থাকিয়া সম্মিলনক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলে বাঙলার তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যার সিসিল বীডন স্যার জনকে সম্বোধন করিয়া উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ বক্তৃতায় তাঁহার নিকট আবদুল লতিফের বিবিধ সদনুষ্ঠানের বিষয় জ্ঞাপন করেন।

মুসলমান সাহিত্য সভার উদ্যোগে প্রতি বৎসরেই এই সম্মিলন মহাসমারোহের সহিত সঙ্ঘটিত হইত। গভর্নর জেনারেল, লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর, কমাণ্ডার-ইন-চিফ্ প্রভৃতি সর্বোচ্চ রাজপুরুষগণ প্রতিবৎসর এই সম্মেলনে যোদান করিতেন। য়ুরোপীয় ও তদ্দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারাদি যন্ত্রাদি সহকারে দর্শকগণকে বুঝাইয়া দিতেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৬ মার্চ এই সভার সপ্তবিংশতিতম সম্মিলনীতেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফাদার লাঁফো প্রথম ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের কার্য প্রদর্শিত করেন, এবং গভর্নর জেনারেল, লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর কমাণ্ডার-ইনচীফ প্রভৃতির কণ্ঠস্বর যন্ত্রে ধরিয়া উহার অবিকল প্রতিধ্বনি উপস্থিত দর্শকগণকে শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদিগকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করেন। উৎকৃষ্টতম শিল্পদ্রব্যাদিও সম্মিলনস্থলে প্রদর্শিত হইত। ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মিলনে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা যোগদান করিয়াছিলেন এবং মুসলমান সাহিত্য সভাকে তাঁহার একটি প্রতিকৃতি উপহার দেন।

মাসিক অধিবেশন ও বাৎসরিক সম্মিলন দ্বারা সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কেবল যে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান বিতরিত হইত তাহাই নহে, উহা দ্বারা আরও বহুবিধ উপকার সংসাধিত হইত। তাঁহাদের মনে উহা নূতন চিন্তা, নূতন ভাব সঞ্চারিত করিত। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানাদির জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য তখনও মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক কলিকাতায় বিজ্ঞানাগার (Indian Association for the Cultivation of Science) প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখনও প্রদেশে কৃষিশিল্পাদির প্রদর্শনীর উপকারিতা কাহারও বোধগম্য হয় নাই। এই কথা স্মরণ করিলে আবদুল লতিফ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কার্যের গুরুত্ব সহজেই অনুমিত হইবে। মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে অনুরাগ সঞ্চারিত করিবার জন্য আবদুল লতিফ যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।

মুসলমান সমাজের অভাব অভিযোগাদি গভর্নমেণ্টের গোচরীভূত করিবার জন্য এই সভা অনেকবার গভর্নর জেনারেল ও লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাদের শাসনভারগ্রহণ এবং অবসর গ্রহণের সময়ে মুসলমান সাহিত্য-সভা তাঁহাদিগকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়া দেশের অবস্থা বিজ্ঞাপন করিতেন। ইহারা সকলেই এই সভায় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কেবল অভিনন্দন পত্রাদি প্রদান এবং প্রবন্ধপাঠের দ্বারাই এই সভা দেশের উন্নতি বিধানের চেষ্টা পান নাই। অজ্ঞ অথচ ধর্মপ্রাণ মুসলমান জনসাধারণ যখনই কোনও কারণে অধীর ও অশান্ত হইয়াছে, তখনই এই সভা তাহাদিগকে শান্ত ও সুস্থির করিতে প্রয়াস পাইতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের একটি ঘটনা এস্থলে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মুসলমান ধমশাস্ত্রানুসারে সমস্ত পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত—দার-উল্-ইসলাম [ইসলামের দেশ বা শান্তির রাজ্য] এবং দার-উল্ হার্ব [সংগ্রাম ও শত্রুতার দেশ]। মুসলমানগণ দার উল্-ইসলামে বাস করিবেন এবং দার-উল-হার্বে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ করিবেন, মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ওয়াহাবীদের হাঙ্গামার সময় ভাগলপুরের কমিশনারের পার্সন্যাল এসিস্টাণ্ট সৈয়দ আমীর হোসেন মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত লক্ষ্ণৌনিবাসী প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণের নিকট এক ইস্তিফা [প্রশ্ন] প্রেরণ করেন। উহার মর্ম এই—ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ দার-উল্-হার্ব কি না এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' [ধর্মযুদ্ধ] করা শাস্ত্রসম্মত কি না? উহার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইংরাজগণ মুসলমানদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের ধর্মে কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ করেন না, সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। সৈয়দ আমীর হোসেন এই পত্রখানি তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত করিয়া প্রসিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, ধর্মশাস্ত্রানুসারে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত কিনা এরূপ প্রশ্ন এতদ্দেশীয় মুসলমানদিগের মনে কখনও উদিত হয় নাই। কিন্তু সংবাদপত্রে এই সামান্য বিষয়ের এই প্রকার আড়ম্বরপূর্ণ আন্দোলনে সকলের মনে এইরূপ বোধ জন্মিল যেন মুসলমান জনসাধারণ গোপনে তাহাদের পরোপকারী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। যে প্রশ্ন কোনও কালে মুসলমানগণের মনে উদিত হয় নাই. এক্ষণে মুসলমান সমাজের ঘরে বাহিরে সেই প্রশ্ন আলোচিত হইতে লাগিল। হিতে বিপরীত ফল হইল। এই সময়ে জৌনপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলবী কেরামৎ আলী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আবদুল লতিফ মুসলমান সাহিত্য-সভার এক বিশেষ অধিবেশনে মুসলমান সমাজের নেতৃগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে মৌলবী কেরামৎ আলীকে এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে বলেন। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের জন্য মৌলবী বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ধর্মশাস্ত্রাদি হইতে বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া সকলের নিকট প্রতিপন্ন করেন যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষ দার্-উল-ইস্লাম, কারণ ব্রিটিশ ভারতে কাহারও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না। তাঁহার বক্তৃতার মর্মসম্বলিত এই সভার কার্যবিবরণী ৫০০০ খণ্ড মুদ্রিত করিয়া আবদুল লতিফ ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রেরণ করেন। এবং ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণের মন হইতে এইরূপ প্রশ্নের অযৌক্তিকতা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন।

স্যর উইলিয়ম গ্রে কর্তৃক নিযুক্ত শিক্ষা কমিশনের বিষয় পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই কমিশনের নিকট এই সভা তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহার যথেষ্ট ফল হইয়াছিল।

লর্ড রিপণ কলিকাতা মাদ্রাসায় পদার্পণ করিলে এই সভাও উহার একাদশজন সভ্য প্রায় ১৭০০০্ টাকা উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রদান কল্পে প্রদান করিয়াছিলেন।

মুসলমান আইন সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এবং তদ্বিষয়ে মুসলমান সমাজের অভিপ্রায় জানিতে হইলে গভর্নমেণ্ট মুসলমান সাহিত্যসভারই অভিমত প্রার্থনা করিতেন। লর্ড রিপণ যখন শিক্ষাকমিশন নিযুক্ত করেন, তখন মুসলমান সাহিত্য-সভাই কমিশনের নিকট মুসলমানদিগের শিক্ষাবিষয়ক অভাব অভিযোগাদির বিষয় জ্ঞাপন করেন। সরকারি চাকুরী-কমিশনের নিকটেও এই সভা মুসলমানদিগের অভাব অভিযোগাদি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। মুসলমানগণের শিক্ষার জন্য যে সকল মহাত্মাগণ অর্থদান করিয়া গিয়াছিলেন তাহা কিরূপে প্রযুক্ত হইতেছে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্ট ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। মিস্টার জি, সি. পল উহার সভাপতি, মিস্টার পি, নোল্যান উহার সম্পাদক এবং মৌলবী আবদুল লতিফ, আবদুল জব্বর এবং মীর মহম্মদ আলী উহার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আবদুল লতিফের উপদেশে মুসলমান সভা এই সমিতির নিকট প্রস্তাব করেন যে, এই সকল অর্থ ধর্মমূলক শিক্ষার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল, সুতরাং এই অর্থে এইরূপ শিক্ষারই ব্যবস্থা হউক। বলা বাহুল্য কমিটি মুসলমান সাহিত্যসভার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের বিবাহের যৌতুকাদি সম্বন্ধীয় দলিলে ষ্ট্যাম্পপ্রদান রহিত করিবার জন্যও এই সভা গভর্নমেণ্টে একটি আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফলে এই সকল দলিলে গভর্নমেণ্ট ষ্ট্যাম্প মাশুল রহিত করেন।

আমরা সংক্ষেপে দেখাইলাম, এই সভা দ্বারা মুসলমান সমাজের কত উন্নতি ও উপকার সাধিত হইয়াছে।

আবদুল লতিফ যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন এই সভা দেশ মধ্যে অসামান্য মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার ইহলোক পরিত্যাগের সহিত এই সভাও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই সভা এক্ষণে মৃত। কিন্তু এক সময়ে উহার কিরূপ শক্তিশালী ও সমাজ-হিতকারী ছিল তাহা পাঠকগণ অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্যান্য সদনুষ্ঠান ও শেষ জীবন

পূর্ব পরিচ্ছেদে নবাব আবদুল লতিফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মুসলমান সাহিত্যসভার বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা দেশের অন্যান্য বিদ্বৎসভার সহিত নবাব আবদুল লতিফের সম্বন্ধ বিচার করিব।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব ও শিক্ষাপরিষদের সভাপতি চিরস্মরণীয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন সম্পাদক ডাক্তার এফ্, জে, মৌয়েট ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ ডিসেম্বর দিবসে কয়েকজন ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহযোগিতায় 'বেথুন সোসাইটি' নামক এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগসংস্থাপনের উদ্দেশে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা"[৫] এই সভা এক্ষণে মৃত, কিন্তু এককালে উহা এতদ্দেশীয় সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতিভার লীলাক্ষেত্র ছিল। অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও বাগ্মী রেভারেণ্ড আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্, আচার্য ই, বি কাউয়েল, রেভারেণ্ড ডল, কর্নেল ম্যালিসন, জষ্টিস স্যরজন বাড্‌ফিয়ার প্রভৃতি ইংরাজগণ এবং ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, নবীনকৃষ্ণ বসু, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও কৈলাসচন্দ্র বসু (এই সভার সম্পাদক) প্রভৃতি এতদ্দেশীয় মনীষীগণের বাগ্মিতায় যখন এই সভার গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত, তখন এই সভার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে। তখন সময়ে সময়ে বিশেষ নিমন্ত্রণে গভর্ন্র জেনারেল বা লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর এই সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। বলা বাহুল্য এই সভার মহৎ উদ্দেশ্যের সহিত আবদুল লতিফের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি প্রায় এই সভার প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই উহার সভ্য হইয়াছিলেন এবং উহার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। আমরা যতদূর অবগত আছি, মুসলমানগণের মধ্যে একমাত্র আবদুল লতিফই এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

বেথুন-সোসাইটির ন্যায় বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার (Bengal Social Science Association) অস্তিত্বও আজ বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এক সময়ে উহা সমাজহিতৈষী ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রধান ব্যক্তিগণের সম্মিলনস্থান ছিল। "কুমারী মেরীকার্পেণ্টারের যত্নে এবং মাননীয় জষ্টিস ফিয়ার, বিভার্লি, পাদরি লঙ্ ও নবাব আবদুল্ল লতিফ খাঁ

বাহাদুর প্রমুখ মহোদয়গণের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৬৭ সালে এই সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের ও দেশীয়দিগকে সম্মিলিত করিয়া বঙ্গদেশে সামাজিক উন্নতির সহায়তা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।"

এই সভার প্রথম বৎসরের কার্যবিবরণী হইতে প্রতীত হয় যে ১৮৬৭ সালে মাননীয় বিচারপতি ফিয়ার এই সভার সভাপতি, মাননীয় বিচারপতি নরম্যান ও বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র উহার সরকারি সভাপতি, এবং মিস্টার বিভার্লি ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র উহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণের মধ্যে আবদুল লতিফের নাম দৃষ্ট হয়। এই সভা চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, ব্যবস্থাশাস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য। আবদুল লতিফ প্রথম ও দ্বিতীয় শাখার অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে, আবদুল লতিফ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। আবদুল লতিফ আজীবন এই পদ অধিকার করিয়াছিলেন। এবং এই সভার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই সভার বার্ষিক অধিবেশনে মুসলমানগণের মধ্যে একমাত্র আবদুল লতিফই দুই বৎসর দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ দুইটি সভার নিয়মানুসারে সভার কার্যবিবরণীতে এবং স্বতন্ত্র পুসতকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ দুইটির বিষয় ছিল, 'বঙ্গে মুসলমানগণের শিক্ষা' এবং 'মুসলমানগণের বিবাহ ও যৌতুক সম্বন্ধীয় আইন।'

শেষোক্ত এই প্রবন্ধের আলোচনার সময়েই মিস্টার বেভার্লি মুসলমান বিবাহ রেজিস্ট্রারির কোনও ব্যবস্থা আছে কি না প্রশ্ন করেন। আবদুল লতিফ উহার উত্তরে বলেন যে, কাজিগণের উচ্ছেদের পর রেজিস্ট্রারির কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। ইহাতে নানাবিধ অনিষ্টকর ফল প্রসূত হইতেছে। মুসলমান বিবাহ রেজিস্ট্রারির রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। আমরা তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি, আবদুল লতিফ মুসলমানগণের বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ রেজিষ্ট্রেশনের আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া এবং এই আইনানুসারে রেজিস্ট্রার নেযুক্ত করাইয়া কিরূপে স্বকীয় সমাজের কল্যাণ সাধিত করিয়াছিলেন। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে, আবদুল লতিফ পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য নহে, অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনার জন্যই বিদ্বৎসভায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন।

এসিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা আমাদের দেশের যে উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা সর্বজনবিদিত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আবদুল লতিফ এই সভার সভ্য হন। তিনি বহুকাল এই সভার ভাষাবিজ্ঞান সমিতির [Philological Committee] সদস্য ছিলেন এবং এই সমিতির অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তিনি পরে এই সভার কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য হইয়াছিলেন। আবদুল লতিফের পূর্বে আর কোন মুসলমান এই গৌরবময় পদ অধিকৃত করিতে পারেন নাই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে চীনদেশের অন্তঃপাতি য়ুনান প্রদেশ হইতে পাঙ্‌হে নামক একজাতীয় মুসলমান কলিকাতায় আগমন করে। আবদুল লতিফ তাহাদের নিকট হইতে

আরব্য ভাষায় লিখিত তাহাদের জাতীয় ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া উহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া এই বৎসর ৩ জুন দিবসে এই সভার এক অধিবেশনে পাঠ করেন। উহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য ছিল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের কীর্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা [The Indian Association for the Cultivation of Science] প্রতিষ্ঠিত হয়। আবদুল লতিফ এই সভার প্রতিষ্ঠাকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে পাতিয়ালার মহারাজা এই সভার প্রতিষ্ঠাকল্পে ৫০০০্ টাকা প্রদান করেন। এই অর্থই সভার মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আবদুল লতিফ এই সভার কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য ও ন্যায়রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আবদুল লতিফ মেরী কার্পেণ্টার প্রতিষ্ঠিত National Indian Association in aid of Social Progress in India নামক সভার, Albert Temple of Science ও Albert Institute -এর কার্যনির্বাহক সমিতিরও সদস্য ছিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দেশবাসীর মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানের সহিতই আবদুল লতিফ অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর তদ্বিরচিত 'কলিকাতার ইতিহাস' নামক নানা তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, আবদুল লতিফ "ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়েরই এক প্রধান নেতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন।" স্বজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে আবদুল লতিফ যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, স্ব-সম্প্রদায়ের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্মিলনের জন্য তিনি যে প্রযত্ন করিয়াছিলেন দেশের বিদ্বৎসভা সমূহে স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধনের জন্য তিনি যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল এই সব সভাসমিতির নহে, সাধারণ জনহিতকর যখন যাহা হইত, তাহাতেই আবদুল লতিফ উৎসাহে যোগদান করিতেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত সার্ভিয়া প্রভৃতি রাজ্যের সংগ্রাম বাধিয়া উঠে, এই সময় ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণের হৃদয়ে স্বভাবতঃই তুরস্কের সুলতান ও তাঁহার প্রজাবর্গের প্রতি সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তখনও কোনও পক্ষে যোগদান করেন নাই এরূপ অবস্থায় অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মুসলমান প্রজাগণ গভর্নমেণ্টের প্রতি তাহাদের কর্তব্য বিস্মৃত হইতে পারে, এইরূপ মনে হওয়ায় দেশনায়ক আবদুল লতিফ তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করা প্রয়োজন বোধ করেন। তিনি বাঙলায় তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলের অনুমতি লইয়া ৭ অক্টোবর দিবসে এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করেন। আবদুল লতিফ এই সভার সভাপতিরূপে বিশুদ্ধ উর্দুভাষায় এক দীর্ঘ বক্তৃতায় মুসলমান জন-সাধারণকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং হত তুর্কীগণের পরিবারের সাহায্যার্থে এবং আহত তুর্কীগণের সেবার জন্য সহৃদয় ব্যক্তিগণকে অর্থপ্রদান করিতে

অনুরোধ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে Fredk, F. Wyrman নামক একজন লেখক 'The war. A summary and compilation of all historical and current information and matters of interest in connection with the present war and the Eastern Question.' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই সভার কার্যবিবরণী ও উহার উদ্দেশ্য বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠকগণকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তুরস্কের সহিত যোগদান করিলে আবদুল লতিফ অন্যান্য মুসলমানগণকে স্বীয় আবাসে এক সভার আহ্বান করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট এক অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুরস্কের আহত সেনাগণের জন্য এবং হত সেনাগণের পরিবারের জন্য আবদুল লতিফ ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করায়, তুরস্ক গভর্নমেণ্ট তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন। তুরস্কের প্রধান ইব্রাহিম পাশা স্বহস্তে তাঁহাকে ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং সুলতান তাঁহাকে Order of the Medkidie' নামক সম্মানে সম্মানিত করেন। ভারতবর্ষের কোনও মুসলমান ইতঃপূর্বে এই সম্মান প্রাপ্ত হন নাই।

১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রসিদ্ধ নাট্যকর অতুলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ার্থ ধর্মবীর মহম্মদ নামক একখানি দৃশ্যকাব্য প্রণয়ন করেন। মুসলমানগণের চিরস্মরণীয় মহাপুরুষগণের লীলা, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে কয়েকজন চরিত্রহীন ও চরিত্রহীনা কর্তৃক অভিনীত হইবে শুনিয়া ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ অত্যন্ত ব্যথিত হন। আবদুল লতিফ তাহাদের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই অভিনয় বন্ধ করিয়া দেন। ইংলণ্ডেও একবার প্রকাশ্য থিয়েটারে এইরূপ একখানি নাটকের অভিনয়ের প্রস্তাব হয়। আমাদের স্মরণ হয়, বিলাতের টাইমস্ পত্রে আবদুল লতিফ এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন করায় অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়।

দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত কাজকর্ম সম্পাদিত করিয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ১১ ডিসেম্বর দিবসে আবদুল লতিফ কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার অবসর গ্রহণকালে দেশের সমস্ত সংবাদপত্র মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কৃতকর্মের প্রশংসা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৮ মে তারিখের একখানি পত্রে পুণ্য 'স্মৃতি মার্কুইস অব রিপন লিখিয়াছিলেন, "You tell me that you have retired from Government employ. The Government of India has not had more faithful, zealous, and loyal servant than yourself and I congratulate you upon your long and honourable career." বাস্তবিক সকল শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসালাভ অতি অল্প রাজকর্মচারির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। গভর্নমেণ্ট এই কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারি ও একনিষ্ঠ দেশসেবককে চিরদিন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহাকে বিবিধ রাজসম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ডলিটন তাঁহাকে খাঁ বাহাদুর উপাধি ও এম্প্রেস মেডেল প্রদান করেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আবদুল লতিফ 'নবাব' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ তাঁহাকে সি আই ই উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উপলক্ষে আবদুল লতিফ 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে ইহাপেক্ষা আর উচ্চতর সম্মান নাই।

তখনকার নিয়মে কোন রাজকর্মচারি সাধারণতঃ বাৎসরিক ৪০০০্ টাকার অধিক পেন্সন প্রাপ্ত হইতেন না। কিন্তু আবদুল লতিফের প্রশংসনীয় কার্যের জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট সেক্রেটারি অব্ স্টেটের অনুমতি লইয়া পেন্সনস্বরূপ তাঁহাকে বাৎসরিক ৬০০০্ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। নবাব আবদুল লতিফ রাজকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরে ভূপালরাজ্যে এক ভয়ানক গোলযোগ হয়। ভূপালের বেগম সুলতান শাহজাহান তাঁহার স্বামীর লোকান্তরের পর সিদ্দিক হোসেন খাঁ নামক একজন কাম্বোজনিবাসী মুসলমানকে বিবাহ করেন। সিদ্দিক হোসেন খাঁ বড় ভাল লোক ছিলেন না। বংশ ও পদমর্যাদায়ও তিনি অনেক হীন ছিলেন। তাঁহাকে দেশবাসী, বিশেষত বেগম সাহেবের প্রথম স্বামী নবাব ওমরাওদ্দৌলার ঔরসজাত কন্যা, ভূপালের বর্তমান শাসনকর্ত্রী নবাব সুলতান জাহান বেগম প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। কাম্বোজ আতরের জন্য বিখ্যাত বলিয়া সিদ্দিক হোসেনকে লোকে ঘৃণার সহিত আতরওয়ালা বলিয়া উল্লেখ করিত। বেগম সুলতান শাহজাহান সিদ্দিক হোসেনের পরামর্শানুসারে রাজ্যশাসন করায় রাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। গভর্নর জেনারেলের মধ্যপ্রদেশের এজেন্ট স্যর লেপেল গ্রিফিন অসাধারণ লোকচরিত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি ভূপালে শান্তি সংস্থাপনের জন্য গভর্ণরজেনারেলের নিকট একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী চাহেন এবং নবাব আবদুল লতিফের কীর্তিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকেই এই কার্যের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া নির্বাচিত করেন। স্যর লেপেলের অনুরোধে আবদুল লতিফ তৎক্ষণাৎ ভূপাল যাত্রা করেন (১৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬)। আবদুল লতিফের উপর স্যর লেপেলের এতদূর বিশ্বাস ছিল যে তিনি তাঁহাকে ভূপাল রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে শাসন কার্যের সমস্ত ভার প্রদান করেন এবং এই আদেশ প্রচার করেন যে তাঁহার তত্ত্বাবধানে এবং উপদেশে বেগম সাহেবা রাজ্যশাসন করিবেন।

আবদুল লতিফ ভূপালরাজ্যের সর্বময় কর্তা হওয়ায় সিদ্দিক হোসেন খাঁ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আবদুল লতিফকে বিদূরিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ; কিন্তু স্যর লেপেল আবদুল লতিফের কার্যে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা সহজসাধ্য ছিল না। অবশেষে সিদ্দিক হোসেন খাঁ এক কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। তিনি বেগমকে বুঝাইলেন যে, যদি আবদুল লতিফের পরিবর্তে কোনও ইংরাজ মন্ত্রীর জন্য আবেদন করা হয়, তাহা হইলে গভর্নমেন্ট সে

প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন। স্বামীর প্ররোচনায় বেগম সাহেবা উপর্যুপরি গভর্নমেন্টের নিকট ইংরাজ মন্ত্রীর জন্য আবেদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে গভর্নমেন্ট বিরক্ত হইয়া স্যর লেপেলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কর্নেল ওয়ার্ড নামক একজন ইংরাজ কর্মচারিকে আবদুল লতিফের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১ জুলাই দিবসে নবাব আবদুল লতিফ কর্নেল ওয়ার্ডকে কার্য বুঝাইয়া দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। আবদুল লতিফ ভূপালে যে কার্য করিয়াছিলেন তাহাতে গভর্নমেন্ট যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অক্ষমতা যে পদচ্যুতির কারণ নহে, তাহা স্যর লেপেল গ্রিফিনের একখানি পত্রের তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন।

এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আবদুল লতিফ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যের অবস্থা সূক্ষ্মরূপে জানিতেন। তিনি আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের সকল প্রধান প্রধান স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং দেশীয় রাজা ও শাসনকর্তৃগণের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। যেখানে তিনি যাইতেন, সেইখানেই মুসলমানের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। আর কোনও বাঙালি মুসলমান আবদুল লতিফের ন্যায় বিদেশে সুপরিচিত ছিলেন না।

স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়া আবদুল লতিফ পুনায় দেশ চর্যায় প্রবৃত্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি দেশের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তিনি মাদ্রাসায় একটি বক্তৃতা দিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া বড় অসুস্থ বোধ কিরলেন। চিকিৎসকগণ বলিলেন, তাঁহার হৃদ্‌রোগ হইয়াছে। ডাক্তার স্যাণ্ডার্স, ডাক্তার কোটস্‌ ও মাক্কলেনের পরামর্শ লইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। মে মাসে তাঁহার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু ডাক্তার স্যাণ্ডার্সের অদ্ভুত চিকিৎসাগুণে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন, এমন কি তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হইল। কিন্তু ৬ জুলাই হঠাৎ তিনি পুনরায় রোগাক্রান্ত হইলেন এবং ১০ জুলাই সোমবার বেলা আড়াইটার সময় দেহত্যাগ করিলেন। শেষ অবধি তাঁহার জ্ঞান ছিল। মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়াও তিনি শান্ত ও ধীরভাবে তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গকে যে সকল হিতকর কার্যে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহার জন্য কি কি করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময়ে ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারে নবাব বাহাদুরের শেষ অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু তৎকালীন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মৌলবী আবদুল জব্বর মহাশয় তাঁহার স্বর্গগত আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করেন। তৎপরে তাঁহার নশ্বর দেহ বেনিয়াপুকুরের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হইল। নবাবের বহু য়ুরোপীয়, হিন্দু ও মুসলমান বন্ধু শোকাকুল চিত্তে তাঁহার মৃতদেহের অনুগমন করিয়াছিলেন।

আবদুল লতিফের মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। বাঙ্গলার বাহিরেও শোকের ছায়া পতিত হইয়াছিল। হইবারই ত কথা। মাননীয় মিস্টার ব্যাক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার Bengal under the Leiutenant Governors নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে যথার্থই বলিয়াছেন—"He was altogether a remarkable man in many ways"। কি কর্তব্যনিষ্ঠ রাজকর্মচারীরূপে, কি স্বদেশপ্রাণ জননায়করূপে, আবদুল লতিফের সমকক্ষ ব্যক্তি অতি বিরল। আমরা পূর্বপরিচ্ছেদ সমূহে তাঁহার কর্মময় জীবনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, আশাকরি, পাঠকগণ তাহা হইতেই আবদুল লতিফের আলোকসামান্য চরিত্রের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কারণ বাহিরের কার্যেই তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং এস্থলে আমরা তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। গভীর স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি-হিতাকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বরে নির্ভর, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অদম্য উৎসাহ তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। আবদুল লতিফের একজন চরিতকার যথার্থই বলিয়াছেন যে, "প্রতীচ্য অধ্যবসায়ের সহিত প্রাচ্য রক্ষণশীলতা তাহাতে সম্মিলিত হইয়াছিল। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় অদম্য, তাঁহার কর্মনিপুণতা অসামান্য এবং সামাজিকগুণসমূহ অনন্যসাধারণ ছিল। এই সকল গুণের দ্বারা তিনি সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও আমায়িকতা শত্রুকেও বশীভূত করিত।" শিষ্টাচার আবদুল লতিফ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

আবদুল লতিফ অতিশয় বন্ধুবৎসল ছিলেন। পারিবারিক জীবনেও তিনি আদর্শচরিত্র ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্রকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য অসামান্য যত্ন করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল রহমানকে লণ্ডনে বিদ্যাশিক্ষার্থে প্রেরণ করিয়া মুসলমান সমাজে এক নূতন আদর্শ প্রদান করেন। ইতঃপূর্বে দুই একজন মুসলমান গভর্নমেন্টের খরচে লণ্ডনে বিদ্যাশিক্ষার্থে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশের কোনও মুসলমান নিজব্যয়ে সন্তানকে লণ্ডনে পাঠাইতে ঔৎসুক্যপ্রকাশ করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহারা এরূপ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। আবদুল লতিফের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কয়মাসের মধ্যেই স্বর্গীয় নবাব আমীর আলি খাঁ তাঁহার পুত্রকে বিলাতে প্রেরণ করেন। আবদুল লতিফের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব আবদুর রহমান বাহাদুর ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এতদ্দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং এক্ষণে ছোট আদালতের অন্যতম বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নবাবজাদা আবদুল শোভান খাঁ বাহাদুর মাদ্রাসা ও প্রেসিডেন্সি কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন এবং পরে বাঙলায় প্রেসসেন্সরের দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইনি পরলোকগমন করিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র নবাবজাদা আবদুল হাফিজ কিছুদিন কলিকাতায় রেজিস্ট্রারের কার্য করিয়া এক্ষণে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অবসর

গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া থাকেন। আবদুল লতিফের কনিষ্ঠপুত্র নবাবজাদা আবদুল আলী এম, এ এক্ষণে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি বিলক্ষণ সাহিত্যানুরাগী। প্রায় ৫ বৎসর কাল ইনি যোগ্যতার সহিত Journal of the Moslem Institute of Calcutta নামক ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইনি মুসলমানগণের মধ্যে সর্বপ্রথমে Royal society of Literature নামক লণ্ডনের বিদ্বৎসভায় ফেলো বা সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। ইনি বিলাতের আরও অনেক বিদ্বৎসভার সভ্য। আবদুল লতিফের জামাতা নবাব সেয়দ মহম্মদ খাঁ বাহাদুর কয়েক বৎসর বাঙলায় রেজিস্ট্রেশন বিভাগের অধ্যক্ষের (Inspector general of Registration) কার্য সুসম্পাদিত করিয়া এক্ষণে পেনশন ভোগ করিতেছেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি আবদুল লতিফের পরলোকগমনে সমগ্র দেশ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ শোকসভা আহূত হইয়াছিল।

নবাব আবদুল লতিফ কেবল মাত্র কোনও বিশিষ্ট সভা-সমিতির উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন না। তিনি একজন সর্বজনপ্রিয় দেশনায়ক ছিলেন। সুতরাং সকল জাতি ও সম্প্রদায় একত্রে সম্মিলিত হইয়া দেশের এই প্রসিদ্ধ জননায়কের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ আগস্ট দিবসে টাউনহলে এক বিরাট সভা করেন। মাননীয় চিফ জস্টিস্ স্যর কোমার পেথারাম এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মাননীয় মিষ্টার (পরে স্যর কে সি এস আই) হেনরি কটন, মহারাজা স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিস্টার জে জি রিচি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, মাননীয় মৌলবী আবদুল খাঁ বাহাদুর, মিস্টার আর ডি, মেহেটা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন।

এই সভার প্রস্তাবানুসারে মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের সভাপতিত্বে যে স্মৃতিরক্ষা-সমিতি সংগঠিত হয়, তাহার চেষ্টায় ৫৪০০্ টাকা সংগৃহীত হয়। মুসলমান ছাত্রগণকে বিদ্যা অর্জনে সকল প্রকার সুবিধা প্রদানের জন্য, তাহাদের জন্য ছাত্রাবাস প্রভৃতির প্রতিষ্ঠান জন্য আবদুল লতিফ তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইলিয়ট মাদ্রাসা হোস্টেল নামক মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণকল্পে এই অর্থ প্রদান করিয়া স্মৃতিরক্ষাসমিতি উপযুক্ত রূপেই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ আগস্ট দিবসে বাঙ্গালার তৎকালীন লেপ্‌টেন্ট গভর্ণর স্যরজন উডবার্ন কর্তৃক এই ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের নামানুসারে উহার উপরিতলের পশ্চিমাংশের নামকরণ করা হইয়াছে। এই অংশে আবদুল লতিফের স্মরণার্থ একটি প্রস্তরময় স্মৃতিফলকও স্যর জন কর্তৃক-স্থাপিত হয়। উহাতে লিখিত আছে "With the concurrence of the Government of Bengal

this tablet is erected by the Memorial committee to the memory of a great benefactor of Muhammedans of Bengal, Nawab Bahadur Abdul Lateef, C.I.E., in greateful commemoration of his life long services in the encouragement of Western and Oriental education among his coreligionists, and his worm interest in the Calcutta Madrasah Hostel. He was foremost in every good work calculated to promote the moral social and intellectual advancement of the Muhammadans of India. Born March 1828, died 10th July 1893."

সম্প্রতি নবাব বাহাদুরের আর একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভায় নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুরের কার্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। আবদুল লতিফের মৃত্যুর পরে এই সভা প্রাণহীন হইয়া পড়ে এবং অবশেষে উহা বিলুপ্ত হয়। সভা বন্ধ হইবার সময়ে সভার কার্য-নির্বাহক সমিতির নিকট কিছু অর্থ ছিল। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে ঐ অর্থে এই সভার পরম উপকারক নবাব বাহাদুরের একটি প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা হউক। এই প্রস্তাবানুসারে নবাব বাহাদুরের একটি সুন্দর অর্ধাঙ্গ মূর্তি প্রস্তুত করা হয়। এবং গত বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর লর্ড কারমাইকেল উহা সেনেট গৃহে স্থাপিত করিয়াছেন।

যে শিক্ষামন্দিরে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান দেশের সকল সমাজের নবীন যুবকগণ তাঁহাদের জাতীয় গর্ব ও অভিমান এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দিয়া জ্ঞানমূলক একতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মহত্তম আদর্শের অনুসরণ করিতে শিক্ষালাভ করেন, সেই মন্দিরে শিক্ষা-প্রচার-ব্রত নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুরের প্রতিমূর্তি স্থাপনা অতিশয় শোভন হইয়াছে। হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, বা খৃষ্টান হউন, যখনই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল জ্ঞানপিপাসু এবং শিক্ষিত তরুণ যুবকগণ এই মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, তখনই তাহারা দেখিতে পাইবেন জাতীয় ঐক্য সাধনার্থ উৎকৃষ্ট-জীবন, আজীবন শিক্ষাবিস্তারপ্রয়াসী একজন অকৃত্রিম স্বদেশ-সেবকের স্নেহময় ও আশাপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহাদেরই উপরে পতিত রহিয়াছে, তাঁহারা হৃদয়ে অনুভব করিবেন যেন এক অশীরীরী আত্মা তাঁহারই প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়া বলিতেছেন !

"যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায় তাহাতে জীবন কর দান !
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান,
এক পথে এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা-নিশান।"

সূত্রাবলি

১ Printed Parliamentary papers relating to the Affairs of India : General, Appendix I Public (1832), pp. 395-483.

২ Ibid, pp. 396, 397.

৩ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'রেইস এণ্ড রায়তে' মাদ্রাসার ইংরাজী বিভাগের এই সময়ের অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"Nobody would learn English. The English classes presented the spectacle of empty benches in front of the solitary teacher. A few intelligent boys like the late Syad brothers Azamooddeen Assan & Zainuddin Hossein, in their day, ornaments of the service, and Abdool Luteef broke through the trammels of prejudice and turned a new leaf in the annals of the College. The present generation has no idea of the interest with which the experiment was watched by Govt. and philanthropic Europeans, and what *eclat* marked the annual exhibitions and what *Kudos*was given to the Syuds, and at a subsequent year, to Abdool Luteef at the close of their academic career for their poficiency in English in special. They were lionised. They became *ipso facto* members of society and had the Entree to the best house. The highest officials delighted to be their patrons.'

অর্থাৎ...কেহই ইংরাজী শিখিতে চাহিতেন না। ইংরাজী শিখিবার শ্রেণীগুলিতে ছাত্রশূন্য বেঞ্চের সম্মুখে শিক্ষক মহাশয়কে একাকী বসিয়া থাকিতে হইত। আজামুদ্দিন আসান, জৈনুদ্দিন হোসেন এবং আবদুল লতিফ প্রমুখ কয়েকটি প্রতিভাবান ছাত্রই প্রথমে কুসংস্কার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নূতন পথে অগ্রসর হন। গভর্নমেণ্ট ও সদাশয় ইংরাজ কিরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া ইহার ফল পর্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন তাহার বর্তমান সময়ে অনুভব করা দুরূহ। তাঁহাদের কৃতকার্যতার পর সকলেই তাঁহাদিগকে সম্মান ও আদর করিতে লাগিলেন।

৪ সার উইলিয়ম হাণ্টার Statistical Gazetteer of the Hoogly District) নামক গ্রন্থে হুগলী মাদ্রাসার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে আবদুল লতিফের এই আন্দোলনের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন :

In 1861, Maulvie Abdul Latif in a pamphlet regarding the reorganisation of the Arabic department of the Hughli college, attributes one of

the causes of the non attendance of Muhammadan pupils to the discontinuance of granting free board & lodging to poor scholars, as was provided for by the original trustees, & which is looked upon as an essential part of the gratis education for poor Muhammadans. Subsequently, the Maulvie's suggestion that the system should be again introduced of allowing free board and lodging was adopted.'

৫ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের 'কলিকাতার ইতিহাস' (সুবলচন্দ্র মিত্রের অনুবাদ)।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সুলেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সূচনা

বাঙলা মাসিক পত্রে সাধারণত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য এবং তাহার স্রষ্টাদের সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়া থাকে। আজি যাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আমরা মনস্থ করিয়াছি, তিনি কখনও বাঙলা ভাষায় কোন রচনা লিখেন নাই এবং বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার আলোকপাত হয় নাই। সেইজন্য এই বিষয়টির আলোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সংজ্ঞা কি? বাঙালি যে ভাষায় নিজ মনোভাব প্রকাশ করে তাহাই বাঙলা ভাষা এবং সেই ভাষার যে রূপায়িত মূর্তি বাঙালির মনের সহিত মিলিত হইয়া বাঙালির জীবনে দেয় আনন্দ, বাঙালির প্রাণে দেয় বল, বাঙালির মনে জাগায় আশা, বাঙালির চিত্তে প্রবাহিত করে নূতন ভাব ও চিন্তাধারা, বাঙালির কর্ণে বর্ষণ করে সুধা, বাঙালির নয়নে প্রতিফলিত করে সৌন্দর্য, বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য যদি আমাদের আলোচনার উপযুক্ত বিষয় হয়, তাহা হইলে কেবল বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে তাঁহারাই কেবল আমাদের নমস্য নহেন, যাঁহাদের জন্য বাঙালি জাতি আজিও জীবিত আছে, যাঁহারা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বাঙালির আশা, আকাঙ্ক্ষা নির্ভীকভাবে গভীর মন্দ্রে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, অভিনব চিন্তা ও ভাবের প্রভাবে বাঙালির দেশকে প্লাবিত করিয়াছেন, তাঁহারা পরোক্ষভাবে বাঙলা সাহিত্যের স্রষ্টাগণকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙলা সাহিত্যের পিতামহস্থানীয় তাঁহারাও আমাদের চিরবরেণ্য। শম্ভুচন্দ্রকে আমরা এইরূপ বাঙালি জাতির অন্যতম স্রষ্টা বলিয়া বিবেচনা করি, এবং সেই জন্য তাঁহার কীর্তিকথার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে। প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থসমালোচনাদির দ্বারাও তিনি বাঙলা সাহিত্যের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিতে সহায়তা করিয়াছেন।

জাতির অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে বাঙালি মাত্রেরই তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা কর্তব্য। বিশেষ কারণে, আমার পক্ষে ইহা শুধু কর্তব্য নহে, অবশ্যপালনীয় ধর্ম। তিনি ছিলেন পরমপূজ্যপাদ পিতামহ, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরম অনুগত

স্নেহভাজন সাহিত্য শিষ্য, আজীবন সুহৃদ এবং প্রতিভামুগ্ধ চরিতকার। আমরা বাল্যকাল হইতে শম্ভুচন্দ্রের নাম শ্রদ্ধা করিতে উপদিষ্ট হইয়াছি। যৌবনকাল হইতে তাঁহার রচনাদি পাঠ করিয়া রসগ্রহণ করিয়াছি, উপকৃত হইয়াছি।

অসীম পাঠানুরাগ ও সর্বশাস্ত্রে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব রাজনীতিক জ্ঞান ও সত্যকথনে অসীম অকুতোভয়তা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তিনি একদিকে বজ্রাপেক্ষা কঠোর, অপরদিকে কুসুমাপেক্ষা কোমল ছিলেন। উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় যে চরিত্র ফুটাইবার নহে, আমি সে চেষ্টা পাইব না। যেমন প্রাচীন কীর্তি-চিহ্নগুলি নিরক্ষর গাইড বা পথিপ্রদর্শকেরা দেখাইয়া দেয়, পণ্ডিতগণ তাহা হইতে সেই কীর্তির মূল্য নিরূপণ করেন, আমিও সেইরূপ আজ 'সময়-সাগর-তীরে' তিনি যে 'পদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাহা দেখাইবার চেষ্টা পাইব, পাঠকগণ উহা হইতে শম্ভুচন্দ্রের অবদানের মূল্য নিরূপিত করিবেন।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা ১৮৩৯-৫৭

শতবর্ষ পূর্ণ হইল ১২৪৬ বঙ্গাব্দে ৮ মে ১৮৩৯ কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে বরাহনগরে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন একটি স্মরণীয় দিবসে ২৫ বৈশাখ যে দিবসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (২২ বৎসর পরে) জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া বাঙালির নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শম্ভুচন্দ্রের পিতা মথুরমোহনের রাধাবাজারে একটি বিলাতি পণ্যদ্রব্যের বিপণি ছিল এবং তাঁহার আয়ে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। শম্ভুচন্দ্র ব্যতীত তাঁহার আর কোনও সন্তান ছিল না।

স্থানীয় পাঠশালায় এবং ফ্রি চার্চ মিশন স্কুলে শম্ভুচন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন পাঠশালায় প্রবিষ্ট করাইয়া দেন তখন মথুরমোহনের পুত্রকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ফ্রি চার্চ স্কুলের কোন ছাত্রের প্ররোচনায় শম্ভুচন্দ্র স্বয়ং ইংরাজী শিক্ষা করিতে উৎসুক হন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত স্কুলের ৪জন ছাত্র খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করায় শম্ভুচন্দ্রকে উক্ত বিদ্যালয়ে যাইতে নিষেধ করা হয় এবং স্থানীয় হিন্দুসমাজে আন্দোলনের ফলে স্কুলটিও অনতিবিলম্বে উঠিয়া যায়। অতঃপর কাশীপুরে গৌরদাস বসাক[১] পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে কিছুদিন বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র কলিকাতার গরাণহাটা নামক পল্লীতে ঁগৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত 'ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী' নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয় সেকালে রক্ষণশীল হিন্দুনেতৃগণ দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হইত এবং এই বিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষাদানে হিন্দু কলেজের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই বিদ্যালয় হইতে বাঙলা গদ্যের অন্যতম পিতা

অক্ষয়কুমার দত্ত, হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানে শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণদাস পালকে সহপাঠীরূপে পাইয়াছিলেন। রসরাজ অমৃতলাল বসুর পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু তখন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মতিলাল শীল, আশুতোষ দেব, রাজেন্দ্র দত্ত, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরিমোহন সেন, কৃষ্ণমোহন মল্লিক প্রভৃতি হিন্দুনেতৃগণ একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের সংকল্প করিলেন। পাঠকগণ হয়ত অনেকে অবগত নহেন যে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসের প্রথম যুগে গভর্নমেণ্ট ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের জন্য কোনও ঔৎসুক্য বা চেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা কেরানি প্রসবের জন্য তদানীন্তন আদালতের ভাষা শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা এবং প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার জন্য প্রধানত খৃষ্টান মিশনারী ও এদেশীয় ব্যক্তিরাই উদ্যোগী হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ হিন্দু নেতারাই কয়েকজন ভারতহিতৈষী ইউরোপীয়ানের সহযোগিতায় স্থাপিত করেন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। গভর্নমেন্ট হিন্দুকলেজের কর্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ইচ্ছামত পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলে হিন্দু নেতারা জাতীয় কর্তৃত্বাধীনে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করেন। অক্রূর দত্ত বংশীয় রাজেন্দ্র দত্ত এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি তৎকালে বণিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডিত্যের জন্যও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গার্হস্থ্য পাঠাগারের ন্যায় লাইব্রেরী কলিকাতায় অতি অল্পই ছিল। আমি সেই লাইব্রেরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। মতিলাল শীলের একটি ফ্রী স্কুল ছিল। উহার জন্য শীল মহাশয় যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। রাজেন্দ্রবাবু উক্ত বিদ্যালয় প্রস্তাবিত কলেজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মাসিক ৪০০্ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া লন। তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহার্থ অনেক টাকা দিতেন।

৩ মে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেট্রোপলিট্যান কলেজ নাম দিয়া এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর জেমস্ কলভিনের সমক্ষে বড়বাজারে সিঁদুরিয়াপটীতে এই বিদ্যালয়ের দ্বার প্রথম উন্মুক্ত হয়।

বিদ্যালয়-এর শিক্ষক নির্বাচনে সম্পাদক রাজেন্দ্র দত্ত, বা 'রাজা বাবু' যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্বে গভর্নমেন্ট শিক্ষাপরিষদের সভাপতি মাননীয় জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন চরিত্রদোষের জন্য হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনকে কর্মচ্যুত করিয়াছিলেন। রিচার্ডসনের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি এদেশে খুব কমই আসিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, সুকবি, সুলেখক সুবক্তা ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক তখন ভারতবর্ষে আর ছিল কিনা সন্দেহ।

সেক্সপীয়রের আবৃত্তি করিতে ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। লর্ড মেকলে একবার বলিয়াছিলেন যে, "আমি ভারতবর্ষের আর সমস্ত কথা বিস্মৃত হইতে পারি কিন্তু রিচার্ডসনের সেক্সপীয়র আবৃত্তির কথা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না।" রিচার্ডসন এমনভাবে ছাত্রগণকে ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষা দিতেন যে তাঁহারা ইংরাজী সাহিত্যের রসে বিভোর হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহারা অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যের সেবা করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিতেন। হিন্দু কলেজে রিচার্ডসনের ছাত্রগণের মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৈলাসচন্দ্র বসু, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, আনন্দকৃষ্ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, শশীচন্দ্র দত্ত, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি অনেকেই ইংরাজী গ্রন্থাদি লিখিয়া বা ইংরাজী বক্তারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজেন্দ্র দত্ত রিচার্ডসনকে মাসিক ৪০০ টাকা বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। বিখ্যাত ইংরাজ ব্যবসায়ী জন পামারের পুত্র কাপ্তেন পামার (যিনি পিতার এক ইঙ্গ ভারতীয় কর্মচারীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সমাজে কিছু অপদস্থ হইয়াছিলেন), 'মর্নিং ক্রনিকেলে'র সম্পাদক কাপ্তেন হ্যারিস, 'ফ্রি মেসন্স ফ্রেণ্ড' সম্পাদক উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক, ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত হন। উইলিয়াম মাষ্টার্স গণিতের অধ্যাপক এবং ডিলা নওজারেথ স্কুলবিভাগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন বাঙলার অধ্যাপক ছিলেন।

শম্ভুচন্দ্র ও কৃষ্ণদাস পাল এই নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয় ৫ বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিল কারণ বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া রাজা বাবুর অবস্থা পূর্বাপেক্ষা হীন হইয়া পড়ে। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয় হইতে অনেকগুলি প্রতিভাশালী ছাত্র বিনির্গত হইয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র ও কৃষ্ণদাসের অব্যবহিত নিম্নশ্রেণীতে পড়িতেন প্রথম বাঙালি চীফ জাষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। এবং অব্যবহিত উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন আচার্য কেশবচন্দ্র সেন। তাঁহাদের উপরে অর্থাৎ কলেজ বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়িতেন শীলস্ ফ্রী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল যদুনাথ ঘোষ, স্যর লরেন্স পীল প্রদত্ত সর্বোৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধের জন্য পদকপ্রাপ্ত পূজনীয় নীলমণি দে,[২] জয়গোবিন্দ লাহা প্রভৃতি।

শম্ভুচন্দ্র সহজেই রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্রমধ্যে গণ্য হন। রিচার্ডসন তাঁহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতেন এবং তাঁহার রচনাদি সংশোধিত করিয়া দিতেন। রিচার্ডসন তৎসম্পাদিত 'লিটারারী গেজেটে' এবং কাপ্তেন হ্যারিসও 'মর্নিং ক্রনিকেলে' তাঁহার রচনা মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত করিয়া উৎসাহিত করিতেন।

রাজাবাবুর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র শম্ভুচন্দ্রের সতীর্থ ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত শম্ভুচন্দ্রের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য জন্মে। তাঁহাদের মধ্যবর্তিতায় শম্ভুচন্দ্র

রাজেন্দ্র দত্তের বিপুল গ্রন্থাগার ব্যবহারের অপূর্ব সুযোগ পাইলেন। তিনি নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিতে লাগিলেন তাঁহার এই পাঠতৃষ্ণা ও জ্ঞানলাভাকাঙ্ক্ষা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।

প্রথম রচনা

সুরেশচন্দ্রের মধ্যবর্তিতায় এই সময়ে 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রের সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষের সহিত শম্ভুচন্দ্র পরিচিত হন এবং তাঁহার কাগজে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। এই কাশীপ্রসাদই বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরাজী কবিতা লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার একটি কবিতা পড়িয়া রিচার্ডসন বলিয়াছিলেন—

"Let some of those narrow minded persons who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant & vulgar contempt read this little poem with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign language but even in their own."

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার Gagging Act এর ফলে 'বেঙ্গল হরকরা'র ইংরাজ সম্পাদক ভর্ৎসিত হন, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র ইংরাজ সম্পাদক সৈন্যসাহায্যে কার্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হন, 'দূরবীণ' নামক উর্দু সংবাদপত্রের মুসলমান সম্পাদক কারারুদ্ধ হন। কাশীপ্রসাদ তাঁহার কাগজ বন্ধ করিয়া দেন, কারণ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল।

এই সময়ে শম্ভুচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট'—সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ, সহকর্মী হিন্দুপেট্রিয়টে'র প্রবর্তক, প্রথম সম্পাদক এবং প্রধান লেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের সহিতও পরিচিত হন এবং তাঁহাদের আহ্বানে মধ্যে মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' লিখিতে আরম্ভ করেন।

Causes of the Mutiny, 1857. সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রতিষ্ঠা চরম সীমায় উপনীত হয়। লর্ড ক্যানিং আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেন। শম্ভুচন্দ্রও এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিয়া Causes of the Mutiny by a Hindu of Bengal নাম দিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। তখনকার দিনে এদেশে পুস্তক প্রকাশ করা অসমীচীন হইবে বিবেচনা করিয়া বিলাতে ষ্টানফোর্ড কোংর দ্বারা উহা প্রকাশিত হয়। উহার ভূমিকা লিখিয়া দেন মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিস হইতে অপসারিত বিচারপতি মিস্টার ম্যালকম লিউইন। লিউইন সাহেব নাকি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে এদেশে হিন্দু ও

খৃষ্টানদের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে খৃষ্টানদিগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় এবং এই মন্তব্যই নাকি তাঁহার সিবিল সার্ভিস ত্যাগের কারণ। এই গ্রন্থখানির বিশুদ্ধ ইংরাজী দেখিয়া সকলে মনে করিয়াছিলেন উহা লিউইন সাহেবেরই রচিত এবং সেইজন্যই বোধ হয় কর্তৃপক্ষের তাদৃশ মনযোগ আকৃষ্ট করে নাই।

বিবাহ

এই বৎসরেই তিনি জোড়াসাঁকো নিবাসী রাধানাথ বটব্যালের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহের ফলে তাঁহার দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন— অভয়া ও অমাদিনী।

Calcutta Monthly Magazine, 1858.

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র ও কৃষ্ণদাস উভয়ে মিলিয়া, 'কলিকাতা মন্থলি ম্যাগাজিন' নামক একখানি ইংরাজী মাসিকপত্র বাহির করেন। তাঁহাদের বন্ধু প্রসাদদাস দত্ত উহার প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। উহার ৩/৪ সংখ্যা মাত্র বাহির হইয়াছিল। উহাতে রিচার্ডসনের Flowers and Flower gardens নামক গ্রন্থের একটি সমালোচনা পড়িয়াছিলাম।

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ উঠিয়া যাওয়ার পর শম্ভুচন্দ্র একটি ইংরাজ এটর্নির অফিসে আর্টিকেল্ড হন কিন্তু আইনের দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকিলেও সাহিত্যের প্রতিই তাঁহার সমধিক আকর্ষণ ছিল। এই সময়ে তাঁহার হাঁপানি রোগের সূত্রপাত হওয়ায় আইনচর্চাও রীতিমত চলিল না। তিনি হিন্দু পেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করিতে থাকেন। একবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে বন্ধু কৃষ্ণদাসকে গোপনে তাঁহার এই চেষ্টার কথা বলিলে কৃষ্ণদাস তৎপরতার সহিত তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছোট আদালতে বিচারপতি হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা যথাস্থানে সুপারিশ করাইয়া উক্ত পদটি স্বয়ং অধিকার করিয়া বসেন।

Mr. Wilson, Lord Canning & the Income Tax, 1860.

সিপাহী যুদ্ধের পর এদেশের রাজনৈতিক আকাশ মেঘশূন্য হইয়াছিল বটে কিন্তু দেশের আর্থিক অবস্থা অতিশয় সঙ্কটজনক হইয়াছিল। আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ কোটি টাকার অধিক হইয়াছিল। উচ্চ হারে সুদ দিয়া প্রভূত ঋণ করিয়া রাজকার্য চালাইতে হয়। প্রতি বৎসর ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিতেছিল।

ডিস্‌রেলি বলিয়াছিলেন ইংরাজ ভারতবর্ষে যুদ্ধকার্যে ও শাসনকার্যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত রাজস্ববিভাগে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারেন এরূপ অর্থনীতিবিদের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদে একজন সদস্যের পদ শূন্য হইলে সেক্রেটারি অব স্টেট স্যর চার্লস উড, রাজস্ববিভাগের কার্যে বিশেষজ্ঞ (স্যর উইলিয়ম উইলসন হণ্টারের মাতুল) স্যর জেমস উইলসনকে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজস্ব সচিবের পদ প্রদান করিয়া এদেশে প্রেরণ করেন। ব্যয়সঙ্কোচ ও আয়বৃদ্ধি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ইনি অস্থায়ীভাবে আয়কর (Income Tax)-এর প্রবর্তন করেন। এদেশে আয়কর নূতন, এবং তৎকালীন অবস্থায় এইরূপ করস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা লইয়া সাধারণ্যে আলোচনা হয়। কিন্তু সেই সঙ্কট সময়ে লর্ড ক্যানিং এবং সেক্রেটারি অব ষ্টেট উইলসনের অভিজ্ঞতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্পাদক কুলধুরন্ধর রবার্ট নাইট এই আয়করের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্যর চার্লস উডের ইংলণ্ডের সহকর্মী ও ব্যক্তিগত বন্ধু মাদ্রাজের গভর্নর স্যর চার্লস ট্রেভেলিয়ানও স্বীয় পদমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া ভারত গভর্নমেণ্টকে গোপনে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন না করিয়া প্রকাশ্যভাবে এই ট্যাক্সের প্রতিবাদ করায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হন,—যদিও পরে তাঁহাকে ভারতবর্ষে রাজস্বসচিবের পদে বরণ করিতে হইয়াছিল। শম্ভুচন্দ্রও এই সময়ে Mr. Wilson, Lord Canning & the Incame Tax নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া এই অপ্রীতিকর করের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তরুণ বয়স সুলভ উষ্মা লর্ড ক্যানিং এবং উইলসনকে ব্যক্তিগতভাবেও আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন, এদেশে শাসনকর্তা নিয়োগের পদ্ধতি—যে পদ্ধতিতে বিংশতি কোটি মানবের সুখদুঃখের নিয়ন্তা নির্বাচন প্রধানমন্ত্রীর উপর প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে—তাহা সমর্থন করা যায় না। লর্ড ক্যানিংকে কেন নির্বাচিত করা হইল জিজ্ঞাসা করায় এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে লর্ড পামারষ্টোন বলিয়াছিলেন "আহা হা, ওঁর বাপ আমাকে প্রথমে ক্যাবিনেটে স্থান দিয়াছিলেন।" এ সকল তারুণ্যজনোচিত অবিবেকিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও উহাতে শম্ভুচন্দ্র যে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই প্রণিধানযোগ্য মনে করিয়াছিলেন। তিনি আয়করের বিরুদ্ধে তিনটি যুক্তির অবতারণা করেন—

(১) আমাদের যে Magna Carta মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র, বিলাতের ব্যারণদের মত কেবল হুমকি দ্বারা আদায় করা হয় নাই পরন্তু রাজবিদ্রোহরূপ মহাপাপ অনুষ্ঠান করিয়া আদায় করা হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে এদেশের শাসন নীতির ভিত্তি হইবে Willing contentment of an obedient people. ইহাতে দেশের

জনমতকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে এইরূপ সূচনা করিতেছে। জনমত এইরূপ আয়করে অভ্যস্ত নহে এবং চাহে না।

(২) সিপাহী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এই অপ্রীতিকর করের বোঝা চপাইলে লোকের মনে স্বভাবতঃই ধারণা হইবে গভর্নমেন্ট প্রজাপীড়ক।

(৩) জনসাধারণের প্রতিনিধি যে গভর্নমেন্টে নাই তদ্দ্বারা প্রবর্তিত কর অত্যাচারের নামান্তর। Taxations without representation is tyranny. পুস্তিকাখানি হিন্দু পেট্রিয়টে হরিশচন্দ্র স্বয়ং সমালোচনা করিয়াছিলেন। 'হরকরা' সমালোচনা প্রসঙ্গে বোধহয় গ্রন্থকারকে বেত্রাঘাতের যোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। কারণ এই সময়ে শম্ভুচন্দ্রকে আমার পিতামহ একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—

3 July/60

My dear Shambhoo Baboo,

Many, many thanks for the pam: I was dying to see it after the Hurkaru's threat of a caning. For anything that unsettles the old dame's cranium is sure to be very clever—as indeed "her nain sel" confessed it. I shall go thro' the brochure carefully and let you know my mind on it. We really require an age of pamphlets to give paste to and help up our political education and I am glad you have set the example.

Yours very sincerely,
Grish Chunder Ghose

Mookerjee's Magazine, 1861

রাজেন্দ্র দত্তর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ শম্ভুচন্দ্রকে নিজ পরিবারস্থ ভাবিতেন। এই সময়ে উক্ত পরিবারস্থ শ্রীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমার পিতামহদেব তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন এবং তাঁহার সহিত দত্তদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। শম্ভুচন্দ্র এই সময়ে একখানি ইংরাজী মাসিক-পত্র প্রকাশ করিবার সংকল্প করেন। আমার পিতামহদেবের রচনাশক্তি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং প্রধানত তাঁহারই সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে Mookerjee's Magazine প্রকাশিত হয়। পিতামহদেবের রচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে একস্থানে শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—

There is in his sentences the very rush of the mountain-torrent, the hue of the setting sun, & the breath of the sea-breeze. তাঁহার রচনায় prose that passes into poetry, and poetry that passes into cloud and mist, so rich in fancy, so jubilant, full of animal spirits, so full of broad force—relieved by occasional touches of tenderness.

কিন্তু এই ম্যাগেজিন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কারণ রচনার যেরূপ উচ্চ আদর্শ অবলম্বিত হইয়াছিল, সেরূপ রচনা লিখিবার লেখক অধিক ছিল না। সুতরাং এই বৎসর মে মাসে যখন হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিলেন এবং তাঁহার নিরাশ্রয়া জননী ও সহধর্মিণীর তথা দেশের উপকারার্থ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় উহার স্বত্ব ক্রয় করিয়া শম্ভুচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রকে উহার সম্পাদন ভার দিলেন তখন তাঁহাদের পক্ষে ম্যাগেজিন চালনা অসম্ভব হইয়া পড়িল। শম্ভুচন্দ্র এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"So far from drawing out any new writers in the field, the contributors of the Hindoo Patriot were all the writers in Mookerjee's Magazine, which became as it were the Literary Journal of the weekly, to which it bore the same relation that the Calcutta Literary Gazette so long as it lived bore to the Bengal Hurkaru, and Englishman's Saturday Evening Journal now bears to the daily Englishman—the receptacle of the more purely literary articles of the same staff—my late lamented friend Babu Grish Chunder Ghose, since Editor of the Bengalee, and myself writing merely the whole of the numbers published, Babu Khetra Chandra Ghosh giving a translation of one of Madame George Sand's Novels, Babu Kashiprasad Ghosh, the veteran poet, some poems, and Babu Omesh Chunder Dutta of the Rambagan family, some stanzas from the French. Under these circumstances when, at the death of Babu Hurris Chunder Mookerjea, the Editorship of the Hindoo Patriot developed upon me, we (Grish Babu and myself) found it too much to keep up both. So, though most desirous of continuing the Magazine,—Grish Babu, as a suitable vehicle for the attractive, rolleking, aften brilliant always brimful of humour, writing in which he delighted, and I, in addition to the literary convenience, as my own property,—it had to be given up."

হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৮৭৯

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ শম্ভুচন্দ্রকে পেট্রিয়টের ম্যানেজিং এডিটর' নিযুক্ত করেন, কারণ আমার পিতামহদেবের পক্ষে গভর্নমেণ্টের সৈন্য সংক্রান্ত হিসাব বিভাগে উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ কার্যের উপর সংবাদপত্র কার্যালয়ের সর্বাধিক কার্য পরিদর্শন করা তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে লিখিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি পেট্রিয়ট প্রবর্তিত করিয়াছিলেন তাঁহাকেই স্বর্গগত বন্ধুর পরিবারের সাহায্যার্থ সম্পাদন ভার পুনঃগ্রহণ করিতে হইয়াছে—

The paper has reverted to those hands that first started it. But the hand of hands is, alas wanting! The reader will in vain seek for those brilliant political crushers which awed and astonished the local press and sent dismay into the factories. Providence in his own inscrutable wisdom has taken back to himself that spirit which flashed like a meteor over the country and disappeared as suddenly as it had burst upon the eye. The tear of friendship is not yet dry, and we are called upon to resume the pen which had been all but laid aside for the last three years in admiration of the talent, which raised the Hindoo Patriot to the position of a power in the realm. The public will perhaps excuse our shortcomings when we tell them that their forbearance is craved in the interest of the bereaved mother and the unfortunate widow of the remarkable man who devoted his fortune and his life to the service of his country. With his fast ebbing breath he loudly and repeatedly called for the last proof! "Don't print yet! Give me the last proof!" and Hurris Chunder Mookerjea died three minutes after with the Hindoo Patriot still upper most in his delirious thoughts! The gushing tear compels us to close the heart-reading scene, for we mean to proceed with our article manfully.

গিরিশচন্দ্র রাজকার্য করিতেন বলিয়া কখনও কাগজে নিজনাম সম্পাদক বলিয়া বিঘোষিত করিতেন না, হরিশচন্দ্র অফিসে তাঁহার সহকর্মী ছিলেন, তিনিও তাঁহার ভ্রাতার (হারাণচন্দ্রের) নামে হিন্দু পেট্রিয়ট কিনিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্র স্বীয় নাম Managing Editor বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিতে কোনও আপত্তি ছিল না। যখন,—

"অসময়ে হরিশ মলো লঙের হ'লো কারাগার
নীল বাঁদরে সোনার বাংলা কর্লে ছারখার"—

তখন ইঁহারাই পেট্রিয়টে প্রজাপক্ষ সমর্থন করিয়া পত্রখানিকে যথার্থ জনসাধারণের পত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্বত্ত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ ধনী হইলেও চিরদিন দরিদ্রের পক্ষাবলম্বী ছিলেন।

কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন রহিল না। কৃষ্ণদাস পাল (যিনি শম্ভুচন্দ্রকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার বেতনভোগী সহকারী সম্পাদকের পদ হইতে পূর্বে বঞ্চিত করিয়াছিলেন) এক্ষণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কতিপয় প্রতিপত্তিশালী সদস্যকে ঐ পত্রটিকে জমিদার সভার মুখপত্ররূপে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে উত্তেজিত করিলেন। তাঁহারা কালীপ্রসন্নকে বারংবার অনুরোধ করায় এবং কোনও কারণ বশত শম্ভুচন্দ্র পদত্যাগ করায় তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও পত্রখানি রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল

মিত্র ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এই কয়জন ট্রাস্টির হস্তে পত্রের সমস্ত স্বত্ব ও পরিচালন ভার ন্যস্ত করিলেন। কৃষ্ণদাস ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে উহার সম্পাদক হইয়া জমিদারদিগের স্বার্থরক্ষার্থ তাঁহার প্রতিভা বিনিয়োজিত করিলেন। ভোলানাথ চন্দ্র দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন :

> A man of the people by birth. he disappointed his nation by spending his energies in Zamindari harness.

আমার পিতামহদেব ঐ বৎসরেই প্রজাপক্ষ সমর্থনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ 'বেঙ্গালী' পত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সমাচার হিন্দুস্থানী ১৮৬২

এই সময়ে শম্ভুচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয়। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিবার আয়োজন করিলে শম্ভুচন্দ্র তাঁহার বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত মুঙ্গের পীর পাহাড়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। 'অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জন্মদাতা' রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই সময়ে অযোধ্যায় নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার জন্য একজন সুদক্ষ সহকারী সম্পাদক অন্বেষণ করিতেছিলেন। শম্ভুচন্দ্র উভয় পদের জন্য মনোনীত হন।

'সমাচার হিন্দুস্থানী' দুই বৎসর শম্ভুচন্দ্র কর্তৃক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরিচালিত হয়। আমার পিতামহদেব উহাতে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন এবং শম্ভুচন্দ্রও মধ্যে মধ্যে 'বেঙ্গলী'তে লিখিতেন। স্থানীয় ইংরাজ সম্পাদিত পত্র Oude Gazette শম্ভুচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপ ও শ্লেষবাণে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ হইত। ভারতের তৎকালীন রাজস্ব সচিব স্যামুয়েল লেং-এর নীতি ও কার্যে শম্ভুচন্দ্র অতি কঠোরভাবে সমালোচনা করিলেও তিনি 'সমাচার হিন্দুস্থানী' পত্রখানিকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং বলিয়াছিলেন যে it is conducted with great ability and moderation.

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পত্নীবিয়োগবিধুর লর্ড ক্যানিং এর ইংলণ্ডে মৃত্যু ঘটিলে রাজা দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যার অন্যান্য তালুকদারগণকে লইয়া লক্ষ্ণৌতে হিন্দুমতে তাঁহার শ্রাদ্ধ করেন—শম্ভুচন্দ্র উহাতে সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং ক্যানিং-এর স্মৃতিরক্ষাকল্পে উক্ত নগরীতে ক্যানিং কলেজ স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের মন্ত্রী

১৮৬৪ 'বেঙ্গলী'তে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে অযোধ্যার জমিদারগণের কিছু কিছু কুকীর্তি প্রকাশিত হইলে শম্ভুচন্দ্রকে উক্ত প্রবন্ধের লেখক বলিয়া সন্দেহ করা হয়

জমিদারগণের সহিত মনোমালিন্যের ফলে শম্ভুচন্দ্র পদত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের অনুরোধে মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব নাজিমের (নবাব ফরেদুন জা'র) প্রাইভেট্ সেক্রেটারি ও মন্ত্রণাদাতা হন (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ)। এই পদে তাঁহাকে অধিককাল থাকিতে হয় নাই, সভাসদগণের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হয় এবং তিনি কলিকাতায় পলাইয়া আসেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে।

এই সময়ে তিনি কৃষ্ণদাস পালের অনুরোধে পুনরায় হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিতে আরম্ভ করেন। বিবেকবিরুদ্ধ কিছু লিখিতেন না। তিনি বাল্যবন্ধু কৃষ্ণদাসকে যথার্থই ভালবাসিতেন। তাঁহাকে লিখিত কৃষ্ণদাসের পত্রাবলী তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে Bengal Past and Present এ সেগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি গ্রন্থকীট ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং পেট্রিয়টে গ্রন্থসমালোচনাদিতে তাঁহার নানাবিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। স্যর উইলিয়ম উইলসন হন্টারের একখানি গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি এত নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছিলেন যে স্যর উইলিয়ম স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে পরবর্তী গ্রন্থসমূহের অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হন। ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থাদি রচনাতেও শম্ভুচন্দ্র সাহায্য করিতেন। বাঙলার ইতিহাসের জ্ঞান তাঁহার অসামান্য ছিল এবং বাঙলার ইতিহাসের বহু বিস্মৃত তথ্য সম্বলিত তাঁহার নোটবইগুলির বহু খণ্ড আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলাম। ইহার যৎসামান্য অংশ বোধ হয় Calcutta Historical Society-র জর্নাল Bengal Past and Present-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিনি এই সময়ে কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমির অধ্যক্ষপদেও কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে হিন্দু হোস্টেলে অবস্থানকালে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, হিসাবদক্ষ শ্যামাচরণ দে, প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুধীগণ প্রায়ই তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে আলোচনা করিতেন।

কাশীপুর রাজ শিউরাজ সিংহ ১৮৬৮ ও রামপুরের নবাবের দেওয়ান ১৮৬৯

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় নবনিযুক্ত সদস্য কাশীপুর রাজ শিউরাজ সিং এর একজন প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রয়োজন হওয়ায় নবাব আবদুল লতিফের পরামর্শে শম্ভুচন্দ্র একবৎসর উক্ত কার্য করেন। পরে তিনি রামপুরের নবাবের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন ১৮৬৯। এইরূপে তিনি দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসনপদ্ধতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

Life of the Late Begum Secunder of Bhopal, 1869

অতঃপর তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ভূপালের বেগম সিকান্দ্রার জীবনী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। লণ্ডনের স্পেক্টেটর সম্পাদকীয় স্তম্ভে উহার সমালোচন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন উহার প্রণেতা "is a shrewed hard-hitting critic with no small political ability".

এই সময়ে তিনি কিছু কাল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দেশভ্রমণে বহির্গত হন এবং কানপুর, আলিগড়, শম্বর, বেরিলি, কনোজ, ফতেগড় প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পত্নীর অসুস্থতার জন্য কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

শম্ভুচন্দ্র হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র রীতিমত শিক্ষা করেন এবং রাজেন্দ্র দত্ত হোমিওপ্যাথি বিস্তারের জন্য বেরিনী সাহেবকে কলিকাতায় আনিলে লালবাজারে তাঁহার ডাক্তারখানা শম্ভুচন্দ্রের পাঠাগার হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কতকগুলি চিকিৎসিত কেস আমেরিকার পত্রাদিতে প্রকাশিত করিলে M.D. উপাধিপ্রাপ্ত এবং আমেরিক্যান ইনষ্টিটিউটের সদস্য মনোনীত হন। ভিষগাচার্য বলিয়া ডাক্তার উপাধি পাইলেও ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র বলিলে সাহিত্যাচার্য শম্ভুচন্দ্রকেই মনে পড়ে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁহার জ্ঞানের কণামাত্রের অধিকারী হইয়াও অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ লিটারেচার হইতেছেন কিন্তু শম্ভুচন্দ্রকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে গৌরবান্বিত করে নাই।

The Prince in India, 1871

ডিউক অব এডিনবরার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের বিবরণ এবং তদুপলক্ষে যে সকল চিন্তা মনে উদিত হইয়াছে তাহা এই গ্রন্থে শম্ভুচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেন। শম্ভুচন্দ্র তাঁহার বন্ধু কবিবর দীনবন্ধু মিত্র দ্বারা এতদুপলক্ষে 'রাজভক্তিশতদল,' বা Loyalty Lotus নামক যে অভিনন্দন গীতি রচনা করাইয়াছিলেন তাহাও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লণ্ডনের স্পেক্টেটর লিখিয়াছিলেন .

> He shows as keen an understanding of our own politics, when his subject happens to bring him into contact with them, as could any writer of our own.

Mookerjee's Magazine new series, 1872-76.

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র তাঁহার মুখার্জীর ম্যাগেজিনকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ঠিক এই সময়ে তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' প্রবর্তিত করেন।

পত্রসূচনাতে তিনি পুরাতন পর্যায়ের ম্যাগেজিনের Sole literary partner গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যথোচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া "A great Indian, but a geographical mistake" নামক একটি সুলিখিত প্রবন্ধে তাঁহার চরিতালোচনা করেন। উহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন 'God made Girish for a tribune of the people, and England permitted him to be no more than a clerk.' এবং বর্তমান শাসন পদ্ধতিতে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা গিরিশচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী রাজনীতিক, লেখক ও বাগ্মীর যে কেরানিগিরি ছাড়া গত্যন্তর নাই তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটি পিতামহদেবের বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বাঙালি বন্ধু এবং স্যার হেনরি কটন প্রমুখ ইংরাজ মনীষী উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ৪০ বৎসর পরে আমি পিতামহদেবের জীবনচরিত প্রকাশিত করিয়া স্যার হেনরি কটনকে লণ্ডনে পাঠাইলে তিনি ১৯ জানুয়ারী ১৯১২ তারিখ সম্বলিত একটি দীর্ঘ স্মৃতিকথা সম্বলিত পত্রের একস্থানে লিখিয়াছিলেন, How well too I remember Shumbhoo Chunder's article "a geographical mistake."

এবারে শম্ভুচন্দ্র অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। নবপর্যায়ের পত্রে আমার পিতামহদেবের এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের Posthumous অপ্রকাশিত রচনা ব্যতীত নিম্নলিখিত লোকগণের রচনা প্রকাশিত হয়—

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার দুইটি রচনার অনুবাদ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্যে' ১৩২৩ সালে আমি প্রকাশিত করিয়াছিলাম। একটির নাম "হিন্দুদর্শনের আলোচনা" অপরটির "নব্য বাঙালির স্বীকারোক্তি"।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র—'ভারতের হোমর', 'পর্বত নন্দিনী উমা' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—"প্রাচীন ভারতে বাল্যবিবাহ" সম্বন্ধে ইঁহার প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপুত হয় নাই।

ভোলানাথ চন্দ্র—ইনি 'Travels of a Hindoo' নামক গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুখার্জীতে দেওঘর প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার বাণিজ্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগিতাবাদ প্রভৃতি সূচিত হইয়াছে। স্বদেশীযুগের ৩০ বৎসর পূর্বে ইনি চরকা প্রচলন ও বিলাতী দ্রব্য বয়কটের প্রস্তাব করেন।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র—

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—ইঁহার ইংরাজী কবিতা এই পর্যায়ে ম্যাগেজিনেও প্রকাশিত হয়।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সংস্কৃত শ্লোকের কয়েকটি, ইংরাজী পদ্যানুবাদ করেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—(প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার)

নবকৃষ্ণ ঘোষ (রামশর্মা)—ইনি বহু গদ্যপদ্য রচনা লিখিয়াছিলেন। ইঁহার কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতা বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

প্রাণনাথ পণ্ডিত—

রাসবিহারী বসু—ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। "ভুবনেশ্বরী বা হিন্দু বিধবা" নামে একটী ধারাবাহিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

রমেশ দত্ত আই-সি-এস

সারদাচরণ মিত্র (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি)—

শশীচন্দ্র দত্ত রায় বাহাদুর (রমেশ দত্তের খুল্লতাত)—ইঁহার "কেরানির স্মৃতিকথা" অপূর্ব।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কয়েকটি ইংবাজী কবিতা প্রকাশ করেন।

রাখালদাস হালদার—

ডাঃ ভুবনমোহন সরকার

কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় (কুচবিহার রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ)

কৃষ্ণমোহন মল্লিক—ইনি ভারত গভর্নমেন্টের সেক্রেটারিয়টে কাজ করিতেন এবং মতিলাল শীলের পরামর্শদাতা ছিলেন। ইহার বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ ব্রিটিশনীতি সমর্থন করায় ভোলানাথ চন্দ্র দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উহার সমালোচনা করেন।

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ—

মাধবচন্দ্র শর্মা—

উমেশ চন্দ্র দত্ত—(ভাইস চেয়ারম্যান, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালটি)—ইঁহার কয়েকটি অনবদ্য ইংরাজী কবিতা প্রকাশিত হয়।

এতদ্ব্যতীত কয়েকজন উচ্চপদস্থ (ইংরাজ সিভিল ও মিলিটারি অফিসার), মাদ্রাজী ও গুজরাটি লেখকও এই পত্রে লিখিতেন।

The Baroda yellow Book, 1875

মাসিকপত্রের সাময়িক রচনা অনেক সময়ে স্থায়িত্বের দাবি রাখে না। শম্ভুচন্দ্রের একটি রচনা কিন্তু চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রেসিডেন্টকে বিষ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এই অপরাধে বরোদার গুইকোয়ার মালহর রাওকে লর্ড নর্থব্রুক সিংহাসনচ্যুত করেন। এই অভূতপূর্ব ঘটনায় সমগ্র দেশ স্তম্ভিত হয়। কেবল কৃষ্ণদাস পাল জনমত উপেক্ষা করিয়া লিখিয়াছিলেন আমরা ৫০ জন গুইকোয়ারকে হারাইতে প্রস্তুত কিন্তু একজন নর্থব্রুক হারাইতে প্রস্তুত নহি। অমৃতলাল তাঁহার হীরকচূর্ণ নাটকে কৃষ্ণদাসের এই জনমত বিরোধী অভিমতের জন্য তাঁহার প্রতি কটূক্তি করেন।

বাঙালি নাট্যসাহিত্যে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'গায়কবাড়'' এবং অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ নাটক' এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। শম্ভুচন্দ্র ২৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক প্রবন্ধে (মুখার্জীর ম্যাগেজিনের ৩ সংখ্যার সমগ্র অংশ পূর্ণ করিয়া) Baroda yellow Book প্রকাশিত করেন। উহাতে তিনি অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, রাজনীতিক জ্ঞান, ব্যবস্থাশাস্ত্রে অধিকার এবং দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্ভীক উক্তি সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। একজন ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছলেন :

> There is no pretence of loyalty in the Baroda numbeı of Mookerjee's Magazine. The intense hatred of British rule which breathes in almost every line of the pamphlet is even startling, accustomed though we may be to the diatribes of the more candid of the native organs of opinion. There is ability, force and bitterness in the bill of indictment drawn up against England, and it will doubtless serve its purpose of lashing into fury the enmity of many of our native fellow-subjects. We really admire the candour and boldness of the writer ; his language may be here and there exaggerated, but he has certainly hit not a few blots, and if he has done harm by exciting the passions of our foes, he has also done us good— just as a bitter tonic is more efficacious than a mere soothing syrup.

অনেকে মনে করিয়াছিলেন উহা কলিকাতার তৎকালীন প্রধান ব্যারিস্টার মন্ট্রিও সাহেবের লিখিত। জয়পুরের মহারাজ রামসিংহ, (যিনি মালহর রাওয়ের বিচারার্থ নিযুক্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং অন্যান্য হিন্দু কমিশনারগণের সহিত একমত হইয়া কেবল মালহর রাওকে নির্দোষী স্থির করেন নাই, তাঁহার পক্ষে অকাট্য যুক্তি সহকারে সমর্থন করিয়াছিলেন) এই প্রবন্ধের সুখ্যাতি শুনিয়া উর্দুতে অনুবাদিত করিয়া স্বয়ং পাঠ করেন এবং কলিকাতায় আসিলে দেওয়ান রায় বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা শম্ভুচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হন। শুনা যায় লর্ড নর্থব্রুকও প্রবন্ধটির রচনা কৌশলের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বরোদা সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখিবার পূর্বে তিনি 'ত্রিবাঙ্কুর' সম্বন্ধেও একটী নির্ভীক প্রবন্ধ লিখিযাছিলেন।

ইণ্ডিয়ান লীগ/এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স

এই সময়ে শম্ভুচন্দ্র শিশিরকুমার ঘোষের সহিত ইণ্ডিয়ান লীগ, এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন প্রথা ১৮৭৫ : স্যর রিচার্ড টেম্পল

পূর্বে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে সদস্যগণ গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্বাচিত হইতেন। স্যর রিচার্ড টেম্পল এই প্রতিষ্ঠানে করদাতাগণ কর্তৃক সদস্য নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তখন এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নির্বাচন প্রথার বিরোধিতা করেন কারণ উহার সদস্য ধনী জমিদারগণের পক্ষে গভর্নমেণ্ট দ্বারা মনোনীত হওয়া সহজসাধ্য ছিল। এখন অনেকে বিস্মৃত হইয়াছেন যে উক্ত সভার বেতনভোগী সহ-সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল নির্বাচন প্রথায় বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে এই প্রথা প্রবর্তিত হইলে খ্যাতনামা ব্যক্তিরা নির্বাচনের চেষ্টা করিবেন না। শম্ভুচন্দ্র ইণ্ডিয়ান লীগ দ্বারা একটি বিরাট জনসভা আহ্বান করেন এবং উহাতে নির্বাচনপ্রথা বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৪ হাজার করদাতার স্বাক্ষর সহ এক আবেদন স্যর রিচার্ডের নিকট প্রেরিত হয় এবং স্যর রিচার্ড নির্বাচন প্রথা আইন দ্বারা প্রবর্তিত করেন। কবি হেমচন্দ্র এই উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন :

ছেলাম টেম্পল্ চাচা, আচ্চা মজা নিলে।
ভোজং দিয়ে, ভোটিং খুলে, মিউনিসিপ্যাল বিলে।

উক্ত কবিতার পাঠকগণ জানেন ভোটারেরা অনেকে "কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীর্তি, বগলে যাহার, এলেমভরা 'ডি-এল' মারা পছন্দ আমার" বলিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অনেকে 'পরিপক্ক খাসা কালো জাম-'নিগরকুলে' কালচাঁদ ঐটি নেব হাম", "একতুরুপে টেক্কা মেরে, 'ব্যোম' করে বসেছে! 'অম্বল' থেকে 'অনারেবল', আর কে অমন আছে" বলিয়া কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার অনেক নির্বাচন প্রার্থীকে ভোট দিয়াছিলেন এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ যে নির্বাচিত হইবেন না এ আশঙ্কা অমূলক তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল।

নর্থব্রুককে অভিনন্দন পত্র দান (Immortal Ten), ১৮৭৬

এই সময়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার উদ্যোগে লর্ড নর্থব্রুককে অভিনন্দন পত্র প্রদান এবং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন কল্পে এক বিরাট সভা আহূত হয়। গায়কবাড়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নর্থব্রুক দেশবাসীর অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন এবং চিরাচরিত প্রথানুসারে তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্থাপনে জনসাধারণের কোন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায় জনমত উপেক্ষা করিয়া স্যর রিচার্ড টেম্পলকে সভাপতি করিয়া অভিনন্দন পত্র প্রদান ও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব দেশবাসী কর্ত্তৃক গ্রহণ করাইতে চাহেন। এমন কেহ নির্ভীক

নেতা ছিলেন না যে উহার প্রতিবাদ করেন। শম্ভুচন্দ্র ও তাঁহার নয়জন বন্ধু সভাস্থলে এক সংশোধন প্রস্তাব আনিতে চাহেন। স্যর রিচার্ড কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। উত্তরে বলা হইল উহা নর্থব্রুকের বন্ধু এবং অনুরাগীদের সভা। শেরিফ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, উহা সাধারণ সভা। তখন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন তাঁহারা সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবেন। কিন্তু উহার স্বপক্ষে কিছু বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাতে শম্ভুচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। কৃষ্ণদাস ইহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন "Immortal Ten", কিন্তু সুদূর বম্বে মাদ্রাজ হইতে অনেক সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন "আমরা Immortal Ten"-এর পক্ষাবলম্বী।

ভ্রমণ

ইহার পর তিনি কিছুদিন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যান। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কন্যার বিবাহোপলক্ষ্যে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

ত্রিপুরার দেওয়ান ১৮৭৭-৮১

এই সময় ত্রিপুরাধিপতি একজন অভিজ্ঞ দেওয়ান অন্বেষণ করেন। নানা দেশীয় রাজ্যে ঘুরিয়া শম্ভুচন্দ্র যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সহজেই উক্ত কার্য্যের জন্য মনোনীত হইলেন। পদের বেতন ৫০০ টাকা এবং অন্যান্য ভাতা প্রভৃতিতেও প্রায় ৫০০ টাকা পোষাইত। শম্ভুচন্দ্র উক্ত রাজ্যে ক্রীতদাসপ্রথা রহিত, গভর্ণর জেনারেলের এজেন্টের স্বতন্ত্র পদ রহিত এবং অন্যান্য শাসন সংস্কার সাধিত করেন। কিন্তু ত্রিপুরাধিপতি বিশুদ্ধ চন্দ্রবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না এবং সভাসদগণের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ত্রিপুরা যাতায়াতের ফলে আমরা শম্ভুচন্দ্রের একখানি মনোজ্ঞ ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ Travels in Bengal পাইয়াছি।

রেইস এণ্ড রায়ত ১৮৮২-৯৪

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি সুকবি গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বামী নরেশচন্দ্র এবং অক্রূর দত্ত বংশীয় অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি—যথা যোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির পরামর্শ ও পরিকল্পনা অনুসারে সুপ্রসিদ্ধ 'রেইস এণ্ড রায়ত' পত্রের প্রবর্তন করেন।

তখন কৃষ্ণদাস পালের হিন্দু পেট্রিয়ট জমিদারদিগের মুখপত্র বলিয়া যেখানে জমিদার ও প্রজার সংঘর্ষ বাধিত জমীদার পক্ষই সমর্থন করিত, তখন নরেন্দ্রনাথ সেনের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' সমাজের নব্যসংস্কারকগণের মুখপত্র বলিয়া রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ অবলম্বন করিত না। সিভিল সার্ভিস হইতে অপসারিত সুরেন্দ্রনাথের হস্তে তখনও 'বেঙ্গলী'র পূর্ব গৌরব ফিরিয়া আসে নাই, তখন শম্ভুচন্দ্র 'রেইস এবং রায়ত' উভয়ের প্রতি সমপক্ষপাতিত্ব সহকারে এই নূতন পত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেশের ইতিহাসে তাঁহার অপূর্ব জ্ঞান, ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য অধিকার, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অপূর্ব ভূয়োদর্শন তাহার পত্রখানিকে প্রসূত হইবামাত্র অমিত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। তাঁহার সাহিত্যগুরু গিরিশচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার রচনায় humour ছিল, উহাকে বাঙলা প্রতিশব্দ ব্যঙ্গ বা শ্লেষ বা রহস্য বলিলে বোধ হয় ঠিক হয় না। ইংরাজী রচনায় অতি অল্প বাঙালিই এই ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

উহাতে শম্ভুচন্দ্র ব্যতীত তাঁহার সহকারী ও পরে সম্পাদক যোগেশ চন্দ্র দত্ত, প্রতাপ রায়ের মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বরাহনগরের হেডমাস্টার ও মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব ভাইস চেয়ারম্যান সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকবি নবকৃষ্ণ ঘোষ বা রামশর্মা, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী প্রভৃতি নিয়মিতভাবে লিখিতেন।

এই পত্র প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরেই ইলবার্ট বিলের সেই মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। "গেল রাজ, গেল মান, হাঁকিল ইংলিসম্যান, নেটিভের কাছে খাড়া নেভার-নেভার" বলিয়া "ডাকিল বৃটিশ-বৃষ গাঁক্ গাঁক ডাক'। কৃষ্ণদাস গভর্নর জেনারেলের কৌন্সিলের অনারেবল মেম্বার, রায়বাহাদুর, সি-আইই। তাঁহার পক্ষে তীব্র ভাষায় জনমতের প্রতিধ্বনি তুলা সম্ভব নহে। এমন কি যখন সহযোগী বেঙ্গলী সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস হয়, যখন জনসাধারণ এত চঞ্চল হইয়াছিল যে ছাত্র (পরে বিচারপতি স্যর) আশুতোষ হাইকোর্টের জানালার কাঁচ ভাঙিয়া ছিলেন, তখনও তিনি বেশী কথা বলিতে পারেন নাই। শম্ভুচন্দ্র ও যোগেশ দত্ত স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথের মোকদ্দমার তদ্বির করিয়াছিলেন এবং শম্ভুচন্দ্রের অনুরোধে যোগেশ দত্ত তাঁহার জামিন হইয়াছিল। সুরেন্দ্রের কারাদণ্ডাজ্ঞা সংবাদ 'রেইসে' ব্ল্যাক বর্ডার দিয়া প্রকাশিত হয়। শম্ভুচন্দ্র রবার্ট নাইট প্রভৃতি সম্পাদকগণ জেলে সুরেন্দ্রনাথকে দেখিতে যান। কৃষ্ণদাস যান নাই। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময় শম্ভুচন্দ্রের তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যের সহিত প্রকাশিত হইত রামশর্মার শ্লেষপূর্ণ জ্বালাময়ী কবিতা। রামশর্মার ইংরাজী কবিতাগুলির একটি সংগ্রহ পুস্তক তাঁহার জামাতা হাইকোর্টের এডভোকেট দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু উহাতে রামশর্মার এই সকল কবিতা সম্ভবত ইচ্ছাপূর্বক পরিবর্জিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত

দুঃখের বিষয়, কারণ উহা কেবল সাময়িক কবিতা নহে, উহাতে কবির শ্লেষাত্মক কবিতা রচনার শক্তি চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

রেইস ও রায়তের শক্তি কর্তৃপক্ষগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুপণ্ডিত লর্ড ডাফরিন যখন বড়লাট, তখন তিনি শম্ভুচন্দ্রের সহিত সাগ্রহে পরিচয় স্থাপন করেন এবং প্রায়ই তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতেন—পরামর্শ লইতেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রথম সভাপতি W.C. Bonnerjee শম্ভুচন্দ্রকে "গুরুজী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহার নিকট শম্ভুচন্দ্রের পরিচয় পাইয়া কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিউম সাহেবও "গুরুজী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু হিউমের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও শম্ভুচন্দ্র কংগ্রেসের দলে ভিড়েন নাই, কংগ্রেসের তৎকালীন কার্যপদ্ধতিতে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই।

লর্ড ডাফরিনের শাসনকালে শম্ভুচন্দ্রকে পাণ্ডিত্যের জন্যও সংবাদপত্র দ্বারা জনসাধারণের সেবার জন্য উপযুক্ত উপাধি দ্বারা ভূষিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বিনীতভাবে জনসাধারণের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের সুযোগ পাইলে ধন্য হইবেন—এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৯১) এবং অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বরণ করা হয়।

তাঁহার শেষজীবনে তিনি দুইটি উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছিলেন। স্যর জন এলিয়েট একবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেশীয় জুরি প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং স্যর জন ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। সম্মতি সঙ্কট আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় তিনি নূতন আইনের পোষকতা করিয়াছিলেন।

মৃত্যু ১৮৯৪

৭ ফেব্রুয়ারীর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউমোনিয়া রোগে দেহত্যাগ করেন। এই বৎসরেই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এবং ঋষিকল্প ভূদেব লোকান্তরিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কবি গিরীন্দ্রমোহিনী 'সাহিত্যে' একটি মর্মস্পর্শিনী শোককবিতা লিখিয়াছিলেন।

"প্রতি দিবসের মৃত্যু অমরতা দিয়ে যাঁর
জীবন করেছে বিলেপন,
মরণে কি তাঁহার মরণ?"

—গিরীন্দ্রমোহিনী

আর সুকবি রামশর্মা লিখিয়াছিলেন—

"Weep on, my country! for the the loved dead—
The Scholar—critic—moralist servere--

The truth-teller, who scorned all coward fear—
The foe of cant, and ranting babbler's dread.
O, toll for him, the gifted and the brave!
For unto thee his gifts—his life he gave."

—Ram Sharma.

Essays of a Brahmin

তাঁহার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রচনাগুলির একটি চয়নিকা কবিলে ভাল হয় কিন্তু তাহা হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি চারিটি প্রবন্ধ Essays of a Brahmin নাম দিয়া ছাপাইতেছিলেন। প্রায় ছাপা শেষ হইয়াছিল। প্রথম প্রবন্ধটির বিষয় ছিল "গিরিশচন্দ্র ঘোষ"। তিনি বিস্তৃতভাবে পিতামহদেবের জীবনী আলোচনা করিবেন বলিয়া উপকরণাদি অনেকদিন হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত প্রবন্ধটি ঠিক জীবনী নহে। তাঁহার জীবনী উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের রাজনৈতিক অক্ষমতা কতদূর তাহাই আলোচিত হইয়াছিল। গ্রন্থের ফাইল কপি যোগেশ দত্ত মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম, এখন কোথায় বলিতে পারি না। বাঙলা ভাষায় তাঁহার জীবনীগ্রন্থ রচিত হয় নাই, ভূতপূর্ব সিবিলিয়ন সুলেখক এফ-এইচ-স্ক্রাইন কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার একখানি জীবনচরিত ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া কতকগুলি পত্র-সহ প্রকাশিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমি যখন পিতামহদেবের জীবনী ও রচনাবলী প্রকাশ করি— সে ও আজ প্রায় ৪০ বৎসরের কথা, তখন শম্ভুচন্দ্রের লাইব্রেরি হইতে অনেক উপকরণ পাইয়াছিলাম। কতকগুলি পত্র গ্রন্থ-প্রকাশের পর পাওয়া যায়, তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সেগুলি সযত্নে রাখিয়াছি। সেগুলি উভয়ের অকৃত্রিম সৌহার্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

সাময়িক সাহিত্যের স্রষ্টারা জীবিতকালে অতিমাত্রায় যশোলাভ করেন, তাঁহারা সমাজের জীবনে নূতন প্রাণস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া যান, নূতন চিন্তা, নূতন ভাব জাতির মনে সঞ্চারিত করিয়া যান, কিন্তু তাঁহাদের তিরোধানের পর আমরা অতি শীঘ্রই তাহাদিগকে বিস্মৃত হই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের কীর্তিকাহিনী স্মরণ করিলে উপকার আছে। আমাদের দুর্গম জীবনপথে তাঁহাদের প্রতিভা জ্যোতি ধ্রুবতারার ন্যায় গতিপথ নির্দেশ করিয়া দিতে পারে।

আজ তাঁহার কৃতকীর্তি স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাবনতহৃদয়ে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমার ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলাম।

সূত্রাবলি

১। ইনি তখন কাশীপুরে 'চৌকীদার' ছিলেন, পরে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন।

২। লেখকের মাতামহ এবং বোর্ড অফ রেভিনিউ-এর ভূতপূর্ব মেয়র কিরণচন্দ্র দে সি.আই.ই-র পিতা।

৩। যদুনাথ ঘোষ, মন্মথনাথ মল্লিক, প্রবোধচন্দ্র দত্ত, যোগেশচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, নরেশচন্দ্র দত্ত, ভানুচন্দ্র দত্ত ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচনা—

১. *Causes of mutiny* by a Hindu of Bengal. Edited by Malcolm Lewis Esq.. Late Judge of the Madras Sudder Court and Provincial Member of Council. London, 1857.

২ *Mr Wilson, Lord Canning and the Income Tax,* by Sombhoo Chunder Mookerjee Calcutta 1860.

৩ *The Career of an Indian princess*. Her Highness the Late Secundra Begum of Bhopal. K C S I , by Sambhu Chandra Mukhopadhyaya. Calcutta 1869.

৪. *The Prince in India, and to India*, by an Indian. A Description of His Royal Highness the Duke of Edinburgh's landing and stay at Calcutta, and a commentary on his visit and reception in India, and on his farewell address to India, given in extenso, with an inquiry into the political uses of princes and pageants, and the nature and condition of loyalty, particularly the loyalty of India, under Mogul and Briton, the Company and the Crown, by Sambhu Chundra Mukhopadhyaya, Calcutta and London 1871.

৫ *Independent Tipperah* Law reports. 1290 T E 1880 C.E. (Judgement of Sambhu Chunder Mookerjee, Minister Associate) Calcutta, 1880.

৬ *Travels and Voyages between Calcutta and Independent Tipperah*, by Sambhu C. Mookerjee. Calcutta. 1887.

পত্রিকা সম্পাদনা ঃ

১. *Calcutta Monthly Magazine* (1855) [কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে একত্রে]

২. *Smachar Hindusthani* (1862-63)

৩. *Mookerjee's Magazine* (1861, 1872-76)

৪. *Reis and Rayyet* (1882-94).
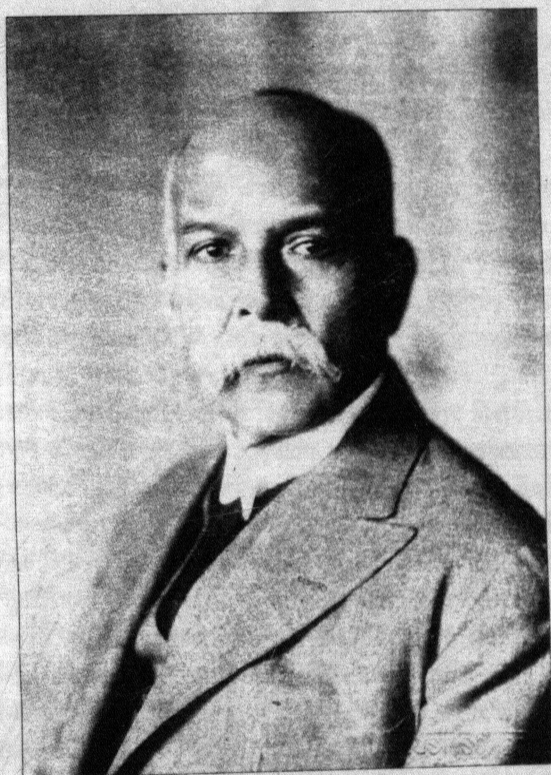
আশুতোষ চৌধুরী

স্বদেশব্রতী স্যর আশুতোষ চৌধুরী

বাঙলার গৌরবাকাশ হইতে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে ! যাঁহার নানাবিষয়িনী গভীর বিদ্যা, অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগ, অপূর্ব বদান্যতা, আন্তরিক স্বদেশপ্রেম ও মধুর চরিত্র তাঁহাকে তাঁহার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে এক গৌরবময় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই অজাতশত্রু, ধর্মভীরু, সত্যনিষ্ঠ কর্মবীর ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। স্যর আশুতোষ চৌধুরীর পরলোকগমনে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে।

পূর্বে রাজসাহী এবং এক্ষণে পাবনা জিলার অন্তর্গত হরিপুর নিবাসী অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৩ জুন দিবসে, আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষের পূর্বপুরুষগণ শাক্ত ছিলেন ; কথিত আছে ইঁহার একজন পূর্বপুরুষ—যাদবানন্দ চৌধুরী (যদু কীর্তনিয়া নামে সমধিক পরিচিত) শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম-সঙ্কীর্তনে মোহিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করত স্বীয় বাসগ্রামের নাম হরিপুর রাখিয়াছিলেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে ইঁহাদের অপর একজন পূর্বপুরুষ রামদেব সাঁওতাল রাজগণের দেওয়ান ছিলেন। মুসলমান সুবাদার তাঁহাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া নাটোর মহারাজের পূর্বপুরুযগণকে তাঁহাদের ভূ-সম্পত্তি অর্পণ করেন এবং দেওয়ান রামদেব মুসলমানগণ কর্তৃক দেব-মন্দির কলুষিত হইবে এই ভয়ে মন্দির হইতে শ্যামরায় ও মঙ্গলচণ্ডীর বিগ্রহ লইয়া গভীর রজনীতে সন্তরণে নদী পার হইয়া হরিপুরে আগমন করেন। এখনও চৌধুরী বংশে এই বিগ্রহদ্বয়ের পূজা হইয়া থাকে। সাঁওতাল রাজ-বংশীয়গণ নৌকাযোগে পলায়নের চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা না থাকায় বিলের জলে আপনাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দেহত্যাগ করেন। এই বিল এখনও সাঁওতাল বিল নামে খ্যাত।

আশুতোষের পিতা দুর্গাদাসের জননী কুমারী দেবী এবং নাটোরাধিপতি মহারাজ বিশ্বনাথ বাহাদুরের পত্নী কৃষ্ণমণি (পিতৃদত্ত নাম দয়াময়ী) সহোদরা ভগিনী ছিলেন। চতুর্দশবর্ষীয় এক পুত্রসন্তানকে হারাইয়া শোকাকুলা কুমারী দেবী কথঞ্চিৎ শান্তিলাভার্থ যৎকালে নাটোর রাজ-প্রাসাদে সহোদরা কৃষ্ণমণির নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে দুর্গাদাস জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় দুর্গাদাসের পৈতৃক

সম্পত্ত্যাদির অধিকাংশ হস্তান্তরিত হইয়া যায় এবং তৃতীয়া ভগিনী মৃন্ময়ী দেবীর সাহায্য না পাইলে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা অসম্ভব হইত। তৎকালীন জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর রাজসাহী কলেজের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক (পরে কলিকাতার ছোট আদালতের বিচারপতি) কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশে দুর্গাদাস কলিকাতায় আগমন করেন এবং হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনের নিকটে ইংরাজী সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিয়া সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দুর্গাদাস পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের আত্ম জীবনচরিত পাঠে দুর্গাদাসের হৃদয়ের উদারতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

"ছাতকের বসন্ত রায়" বাঙলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বাদশ ভূম্যধিকারিগণের অন্যতম। এই বসন্ত রায়ের অন্যতম বংশধর বাগের কালীরায় মহাশয়ের পরমাসুন্দরী কন্যা মগ্নময়ী দেবীর সহিত দুর্গাদাস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহের ফলে সর্বপ্রথমে এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠা হন—ইনিই বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিতা সুকবি শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী। অতঃপর দুর্গাদাসের প্রথম পুত্রসন্তান বঙ্গ-গৌরব আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর আশুতোষের অন্যান্য সহোদর প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র, কুমুদনাথ, প্রমথনাথ, অমিয়নাথ, এবং খ্যাতনামা চিকিৎসক কর্ণেল মন্মথনাথ চৌধুরী ও সুহৃদনাথ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষের লক্ষ্মী-স্বরূপিণী জননী যে যথার্থই রত্নগর্ভা তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাননীয়া শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী প্রণীত "পূর্ব কথা" নামক অতীব চিত্তাকর্ষক গ্রন্থের স্থানে স্থানে আশুতোষের শৈশব ও বাল্যজীবনের কতকগুলি ঘটনার মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে এই গ্রন্থ হইতে কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন :

আমার পাঁচ বৎসর কয়েক মাসের ছোট আশু, পিতা-মাতার প্রথম পুত্র। তাহার জন্মের পরেই বাপ-মার এমনি কঠিন পীড়া হইয়াছিল যে জীবন-সংশয। তাঁহারা যদিও ঈশ্বর কৃপায় আরোগ্যলাভ করিয়া উঠিলেন, তখন আবার নব-প্রসূত শিশুর জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। পরিবারস্থ সকলে যেখানে যে গণৎকার ওঝা ও বৈদ্য পাইতে লাগিলেন, তাহাকেই আনিয়া জীবন রক্ষার নানা প্রকার উপায় দেখিতে ছিলেন। ভাগ্য গণনায় উঠিয়াছিল যে শিশু অতি ভাগ্যবান ও ফাঁড়া যদি কাটাইয়া উঠে তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবনের ফলাফল বড় 'ইউনিক'। ঝাড়া, জলপড়া, সেকালের যাহা কিছু শিশু-চিকিৎসা ছিল, তাহাতেই শিশু সারিয়া শেষে বেশ সুস্থ সবলকায় হইয়া উঠে। আমাদের জন্ম মাতামহালয়ে ; ছয় মাস বয়সে, পিত্রালয়ে যাওয়া প্রথা। আশুকে লইয়া মাও সময় মতন হরিপুরে রওনা হইয়া

গেলেন। শুভ দিনক্ষণ দেখিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করা হইল। পুরাতন নিয়মানুসারে বাদ্য বাজাইয়া পূর্বে কাছারি বাড়িতে তুলিয়া গ্রামের গুরুজন সকলে দেখিলে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইত ও প্রধান প্রধান প্রজারা কিছু কিছু নজর সম্মুখে ধরিত। আশুরও তাহাই হইয়াছিল। শিশুর হাতে টাকা দিলে কখনও মুষ্টিবদ্ধ করিতে পারিত না, শুনিয়াছি। জীবনে তাহার প্রমাণও প্রত্যক্ষ।

আশুর জন্ম বৎসরেই আমাব জ্যেষ্ঠতাতপুত্র নবকুমার চৌধুরী ঠাকুর দাদাব প্রথম বিবাহ অতি সমারোহে হয়। পিতৃদেব সে বিবাহে সবই করিয়াছিলেন ও বাড়ির সকলে তাহাতে ভাবিয়াছিলেন, জ্যাঠা মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশনে খুব ধূমধাম করিবেন। কিন্তু নব-বধূর পাকস্পর্শের দিন আশুর মুখে ভাত দিবার প্রস্তাব শুনিয়া পিতা অভিমানে তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন, সে যাত্রা অন্নপ্রাশন রহিত হইয়া গেল।

* * * * *

ব্রাহ্মণ পুত্রের দশকর্ম রীতিমত না হইলে চলিতে পারে না। জাঁকজমকে অন্নপ্রাশন না হইয়াও আশুর মুখে ভবানীপুরের (নাটোব বাজের দেবস্থান) প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল এবং পিতৃদেব স্বয়ং নাম রাখিলেন "আশুতোষ" সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তানের অন্নপ্রাশন আশানুরূপ হইল না, তাহাতে মা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলেন না, বরং ভবানী দেবীর প্রসাদই তাঁহার আশীর্বাদ স্বরূপ পুত্রের মুখে দিয়া তিনি পবিতুষ্টি বোধ করিলেন।

আশুর পরে যোগেশ, তিন বৎসরের ছোট। এবার পিতৃদেব পিসি-মাতাদিগের হস্তে দ্বিতীয় পুত্রের অন্নপ্রাশনের ভার দিয়া বনগ্রামে কার্যস্থানে চলিয়া গেলেন। শাস্ত্রানুসারে জ্যেষ্ঠের উচিতমত 'নান্দিমুখ' 'বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ' না করিয়া অন্নপ্রাশন হইলে কনিষ্ঠের তাহা হইতে পাবে না। অগ্রে আশুর হইয়া ছোট ভ্রাতার মুখে ভাত দিতে হইবে। পুরোহিত মহাশয়েরা পাঁজি-পুঁথি খুলিয়া তাহার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন, আর গৃহে কুটুম্ব আগমনের ধূম পড়িয়া গেল। এ অন্নপ্রাশনে বড় আমোদ, যুগল কুমার লবকুশের ন্যায়। সাড়ে তিন বৎসরের আশুতোষ সর্বাঙ্গে গহনা ও লাল পোষাক পরিয়া চন্দন চর্চিত ললাটে ছোট পুঁটে বর সাজিয়া চিত্রিত পিঁড়িতে ভাত হইয়ে বসিয়া গেল যোগেশ নয় মাসের, জ্ঞাতি ক্রোড়ে রহিল। সম্মুখে পঞ্চ ব্যঞ্জন ও উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সব সজ্জিত দেখিয়া ক্ষুদ্র আশু সুবর্ণ অঙ্গুরীয় পরিয়া জ্ঞাতি হস্তে পরমান্ন খাইবার প্রতীক্ষায় না রহিয়া দিব্য খুসি মনে নিজ হস্তে অন্নপ্রাশনের অন্নব্যঞ্জন খাইতে লাগিল। এ কৌতুকাবহ দৃশ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ হাস্যধ্বনি হইতে লাগিল। রসনচৌকী নহবৎ বাদ্য থামিয়া গেল এবং আশু, যোগেশের অন্নপ্রাশনের গল্পটা পল্লীর চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আশুর

অন্নপ্রাশন সাড়ে তিন বর্ষে, ও হাতে খড়ি একেবারেই হয় নাই। তবুও মা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর কৃপায় কখন বঞ্চিত নহেন।

বাল্যকালে আশুতোষ প্রধানত তদীয় পিতৃদেবের নিকটেই বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন :

বনগ্রামে আমাদিগের রীতিমতন লেখাপড়া আরম্ভ হইল। পিতৃদেব স্বয়ং গুরু ও আমরা সব শিষ্য। প্রাতে স্কুল বসিত, সায়াহ্নে পড়া দিতে হইত এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশীল আশু সর্বোপরি থাকায় আমরা একটু ভীত থাকিতাম। পড়া দিবার ঐ সময় প্রায়ই মা আমার বেণীবন্ধন করিতেন ও রচনার কারুকার্যে বিলম্ব হইয়া যাইত। সেকালের খোঁপার নাম 'জিলাপী পাক, মোড়া এবং বিবিয়ানা'। কপালের ও কানের পার্শ্বের চূর্ণিত কুন্তলের বেণীর পারিপাট্যে দেরী হইবার কথা, ও তাহাতে আশুর নিকট আমার পড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইত। সেটা দণ্ডস্বরূপ মনে করিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতাম। ছোট ভাই-এর গুরুগিরি আমার ভাল লাগিত না, চক্ষের জলে সমস্ত বস্ত্র ভিজিয়া যাইত, রাত্রে আহার প্রায়ই হইত না, তথাপি পিতৃঠাকুরের কথায় অবাধ্য হওয়া তাঁহাকে অমান্য করা সাধ্যাতীত। নীরবে আশুর মাষ্টারী মানিয়া লইতাম। গদ্য পদ্য ভূগোল ইতিহাস ও লোহারাম শিরোমণির ব্যাকরণ সকল বিষয়ে তাহার সমকক্ষ ছিলাম, কেবল অঙ্কে নীচে থাকিতাম ও পরে ত্রৈরাশিক পর্যন্ত উঠিয়া সেইখানেই বিদ্যা থামিয়া গেল। ইংরাজী তখনও পড়িতাম না। আশু স্কুলে ভর্তি হইয়া নিয়ম মত অধ্যয়ন করিতে লাগিল। আমি গৃহের পাঠশালেই তেমনি রহিয়া গেলাম।

বনগ্রাম হইতে দুর্গাদাস যশোহরে স্থানান্তরিত হন। এই স্থানে আশুতোষের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করায় সকলে শোকে মূহ্যমান হইয়া পড়েন। কিছুদিন পরে যশোহর স্কুলে আশুতোষ ভ্রাতৃগণের সহিত প্রবিষ্ট হন। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন :

যশোহর স্কুলে ভ্রাতারা ভর্তি হইয়া পূর্বে যেমন রীতিমত পড়িতেছিল, তেমনি সব রহিয়া গেল। পিতৃদেবের আশ্রয়ে যাহারা ছিলেন, তাঁহারাও তেমনি তাহাদিগের গৃহপাঠের সাহায্য করিতে লাগিলেন। রাজসাহী জেলার একজন উপাধিধারী (M.A.B L.) যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক আশুকে ইংরাজী পড়াইতেন ও অন্য একজন ভদ্রলোক, কেরানিবাবু অঙ্ক কসাইতেন এবং কবি ঈশ্বর গুপ্তের বংশধর এক বৈদ্যরাজ সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। ক্রমে আমাদিগের গৃহশিক্ষকের পদ পিতৃদেব স্বয়ং আবার গ্রহণ করিয়া অতি পরিশ্রম সহ রাত্রিদিন আশুকে স্কুলের পাঠ্য পুস্তক বাদে অন্য সব সাহিত্য ইতিহাস পড়াইতে লাগিলেন ও দ্রুত উন্নতি দেখিয়া স্কুলে 'ডবল প্রমোসান হইতে লাগিল। তখন ষোল বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়ম ছিল, সেই জন্য তাহাকে তিন বৎসর বসিয়া থাকিতে হয়। সেই কয়েক বৎসর মধ্যে আশু অনেক পড়িয়া অনেক শিখিয়া একটা বিজ্ঞ বালক হইয়া উঠিল। 'বয়সে কি বিজ্ঞ হয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে' এ বাক্য তাহার পক্ষে খাটিয়াছিল।

যশোহরে অবস্থান কালে চৌধুরী পরিবারের সহিত কবিবর দীনবন্ধু মিত্র ও নবীনচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। দুর্গাদাসের বাসায় প্রায়ই তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুগণ সমবেত হইয়া কাব্যামৃত রসাস্বাদন করিতেন এবং প্রসন্নময়ী ও আশুতোষ সেই রসধারায় তাঁহাদের তরুণ হৃদয় সিঞ্চিত করিয়া লইতেন। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন :

প্রতি শনি রবিবারে আমাদের গৃহে সাহিত্যানুরাগী বন্ধুগণেব আসর জমিত, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের 'সদ্ভাব শতক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা, মৃণালিনী' নবীনেব নবজাত 'অবকাশ রঞ্জিনী' প্রভৃতিব আলোচনা আবৃত্তি চলিত। এই মজলিসের প্রধান ছিলেন রসজ্ঞ দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়। বটতলার 'কি মজার শনিবার' ও এখানে বাদ যাইত না। সে সব অশ্রুতপূর্ব ছড়া আজকাল শুনিতে পাই না। যেমন 'গঙ্গা যে ডার্টি রিভার হয় সে ফিভার, সে জলে আব কেউ নেও না,—একটা পুতুল গড়ে মন্ত্র পড়ে ফুল দিয়া আর ফুল (fool) হযো না।' আবার চাকুরী সন্তপ্ত হৃদয় কেরানির কবিতা, 'অসুখী ভিষক মদ্যপ অতি, অসুখী রূপসী বিধবা সতী—অসুখী যে জন যৌবনে জবা অসুখের শেষ চাকুরী করা।' বাহির বৈঠকখানায় যখন বাগেদ্বীর বাণী ও বীণা ঝঙ্কারে দর্শক এবং শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ ও উৎফুল্ল, তৎকালে অন্তঃপুরে লক্ষ্মী সহায় অন্নপূর্ণার রন্ধনস্থালী বিবিধ মিষ্টান্ন ও সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত—মা ও মাসীমা নিজেরাই অক্লান্ত শ্রম সহ স্বহস্তে সকল প্রস্তুত করিতেন। আমরা ভাই বোনে মিলিয়া দুই দিকে রসাস্বাদনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতাম। অন্দরে সব পরিবেশন শেষ হইলে আহারের জন্য বন্ধুগণ একত্র প্রীতিভোজনে বসিতেন সে সময়ে হাস্যোচ্ছাস ও আমোদজনক গল্পের লহরী বহিয়া যাইত। মিত্রজা এক একটা সবস গল্প বলিতেন আর চতুর্দিক হইতে উচ্চ হাস্যধ্বনিতে গৃহ কম্পিত হইয়া উঠিত। ইহার মধ্যেও ভোজনের কোনদিক কোনরূপ শৈথিল্য দেখা যাইত না। মাংসের গরম চপ পাতে পড়িবামাত্র উষ্টার সস্ (Worcester sauce) ঢালিয়া তাহা উপভোগ করিতেন।

একবাব শ্রীপঞ্চমীর বন্ধে আমাদিগের যশোহর ভবনে দীনবন্ধু বাবু লীলাবতীর নদের চাঁদের অংশটা (part) অভিনয় করিয়াছিলেন। নাটক অভিনয় আমরা পূর্বে কখন দেখি নাই ও তাহার কোন ধারণাও ছিল না। কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, কবির লড়াই. আখড়াই, হাফ আখড়াই, মনোহর সাই এবং ঢপের গান শৈশব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিলাম।

এ আমাদের নিকট নূতন দৃশ্য। গ্রন্থকর্তা স্বয়ং নদেরচাঁদ সাজিয়া হাব-ভাব সহকারে অভিনয় করিবেন শুনিযা আমরা সর্বাগ্রে রঙ্গস্থল অধিকার করিয়া বসিলাম। ক্রমে বৈঠকখানা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। পিসীমাতারা পর্যন্ত গবাক্ষে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখতে লাগিলেন। লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া যখন নদেরচাঁদ 'অয়ি হরিণ-নয়নে তুমি কি পড়ো' বলিতে যাইয়া যেই 'আই হরিণের সিং তুমি কি পড়ো' বলিয়া ফেলিল এবং অপসারিত চৌকীতে বসিতে যাইয়া ভূপতিত হইয়া চিৎকারস্বরে কাঁদিয়া 'মলাম রে মেরে ফেল্লেরে' বলিল তখন দর্শকমণ্ডলীর অট্টহাস্যে যশোর নগরী প্রকম্পিত হইতে লাগিল, তাহার প্রতিধ্বনিতে ভৈরবনদেও বোধ হয় উজান বহিয়াছিল। অভিনয় সমাপ্ত হইবামাত্র পিসীমাতারা পিতৃদেবকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও তিনি যাইবামাত্র তাঁহারা দুঃখিত ভাবে

বলিলেন, 'দুর্গা, দীনবন্ধুকে ভাই-এর মত স্নেহপাত্র মনে করি, সে ত খুব ভালই জানিতাম, আজিকার একি কাণ্ড? মাংস ভাজার (চপ) সঙ্গে মদ ঢালিয়া ঢালিয়া খাইয়া এখন ত মাতাল হইয়া রঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া মাটিতে পড়িয়া চেঁচামেচি করিতেছে ও লোকজন হাসাইতেছে, ইহাতে আমরা বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া তোমাকে সব বলিবার জন্য ডাকিয়াছি।' পিতৃদেব তাঁহাদিগেব কথায় উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, 'দীনবন্ধু মাংস ভাজার সঙ্গে মদ ঢালিয়া খান নাই, ও এক রূপ চাট্‌নী (sauce), মদ না, ইহাকে অভিনয় বলে মাতলামি নহে। বিলাতে কত বড় বড় লোক এই অভিনয় করিয়া রাজদরবাবে গণ্যমান্য হইয়া থাকে, কত অর্থ উপার্জন করে, বড় মানুষ হইয়া যায়। দীনবন্ধু রহস্যপ্রিয়, গুণী ব্যক্তি, এই জন্য তাঁর নিজের বই 'লীলাবতী' অভিনয় করিতেছেন।' এই শুনিয়া তাঁহারা ত খুশি হইলেন ও সুচতুর মিত্র মহাশযও পিতৃঠাকুর প্রমুখাৎ সকল অবগত হইয়া আমাদের গৃহে আবার নৈশ ভোজনের কথা তাঁহাদিগকেই বলিয়া খুব আপ্যায়িত করিলেন। সে রাত্রে আহারীয় একটু নূতন রকমে প্রস্তুত করা হইল—(নবান্নের নূতন তণ্ডুলের ফ্যান্‌সা ভাত ও যত প্রকার সিদ্ধ পোড়া তরকাবি, গব্য ঘৃত মিশ্রিত), তাই খাইয়া একবাক্যে সকলে বলিয়াছিলেন "পোলাও কোথায় লাগে, এ অমৃত।

যথাসময়ে শুভদিনে আশুতোষের উপনয়ন হয়। প্রসন্নময়ী ইহারও চিত্র তাঁহার সুনিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন :

আশু যোগেশের অন্নপ্রাশন যেমন একত্র হইয়াছিল তেমনি তাহাদিগের উপনয়নও এক সঙ্গে সম্পন্ন হয়। ছোট ভাই দুইটি এক পালকি চড়িয়া পুরাতন চাকর সহ হরিপুব যাইযা পৌঁছিলে সেখানে উৎসবের স্রোত বহিয়া গেল, আমিও তখন সেখানে ছিলাম। জ্যাঠা মহাশয় স্বয়ং আশুর গলায় যজ্ঞোপবীত ও কানে গায়ত্রী মন্ত্র দিলেন আর অন্য একজন জ্ঞাতি যোগেশের দীক্ষাগুরু হইলেন। জ্যেষ্ঠতাত আশুকে ব্রত ভিক্ষা স্বরূপ কয়েকখানি লাভজনক গ্রাম দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু পিতৃঠাকুর তাহা লইতে দেন নাই। তাঁহার দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল, ভাবীকালে পুত্র কৃতী হইয়া বংশগৌরব রক্ষা করিবে। উপনয়নের ভিক্ষায় পঞ্চখানি গ্রাম লইয়া পরে জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের সহিত মনোমালিন্য ঘটিতে পারে সেটা ইচ্ছনীয় নহে। ভূমি দানের নিয়ম, গঙ্গামৃত্তিকা মন্ত্রপূত করিয়া নবীন ব্রহ্মচারীর হস্তে দেওয়া তাহাতে রীতিমতন লেখাপড়া না থাকিলেও কিছু আইসে যায় না এবং ভবিষ্যৎ বংশানুক্রমে স্বত্ব রহিয়া যায়। মাঘ মাসের শীতে ব্রহ্মচারিবেশী ক্ষুদ্র দুটি বালক প্রাতঃস্নানান্তে যখন বেদপাঠ শিক্ষা করিত, তখন তাহাদিগের সেই শান্তিপূর্ণ দিব্য মুখ-কান্তি ও সৌম্য মূর্তি দেখিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রগতপ্রাণা পিসীমাতারা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। উপবীত ধারণের পূর্বে যদি অসময়ে মেঘ গর্জন হয় তাহাতে উপনয়ন অসিদ্ধ হইয়া থাকে। ভ্রাতাগণের যজ্ঞোপবীতের দিনে হঠাৎ ঘন মেঘগর্জন ও বৃষ্টিপাতে সব আবার তিনদিন পর নূতন করিয়া করিতে হইয়াছিল। বর্ষার জল ঝড় ও মেঘের ডাকে কোন ক্ষতি নাই, অকালে তাহা হইলেই গোল। এই কারণে আশুর উপনয়নও অন্নপ্রাশনের ন্যায় দুইবার হয়।

উপনয়নের এক বৎসর আশুরা পূর্ণমাত্রায় ব্রহ্মচারি থাকিয়া কাহারো অন্ন-জল ও অখাদ্য স্পর্শ করিত না। রীতিমত একাদশী পালন ও মৌনভাবে বসিয়া আহার করিত। বাড়ি হইতে যশোহর প্রত্যাবর্তন কালে রন্ধনের ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। রাত্রি প্রভাত হইবার আগেই আমাদেব পালকি স্কন্ধে বাহকগণ গ্রাম্য তাল-লয়ে গীত গাহিতে গাহিতে চলিতে আবম্ভ করিলে আমরাও ঊষার মোহিনীমূর্তি দর্শনে ও বিহঙ্গের সঙ্গীতে জাগিয়া উঠিতাম। কত গ্রাম কত প্রশান্ত মাঠ-ঘাট অতিক্রম করিয়া দ্বিপ্রহর বেলায় কোন এক নদীতীবে ছায়াময় অশ্বত্থ বৃক্ষতলে পালকি নামাইয়া স্নানাহাবের আয়োজন হইত। ব্যবস্থা সব ভৃত্য ঈশ্বর দাস করিয়া দিত, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। ভ্রাতারা স্নাত দেহে গরদ পরিয়া আহারে বসিয়া যাইত ও শিবেব নন্দীরূপ ঈশ্বর দাস দূরে দাঁড়াইয়া অন্য জাতির গমনাগমন বন্ধ জন্য পাহারা দিত। তাহার ত্রিসীমায় কাহারো ছায়াপাত হইবার হুকুম ছিল না, এমনি কড়া প্রহরী। তিন দিবস পথের মুক্ত বায়ুতে রহিয়া সুস্থ ও সবল শরীরে ভ্রাতাগণ সহকারে যৎকালে আমরা যশোহর পৌছিলাম, আমাদিগকে দেখিয়া পিতা মাতার এবং অন্য পরিজনবর্গের মনে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসাধ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজত্ব লাভেও এমন পূর্ণ সুখ তাঁহাদিগের নিকট স্পৃহনীয় ছিল না।

যশোহর হইতে দুর্গাদাস কৃষ্ণনগরে বদলী হন। এই স্থানে অবস্থিতিকালে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, রামতনু লাহিড়ী এবং মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিবারের সহিত চৌধুরী পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আশুতোষের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অপ্রাপ্ত বয়সের জন্য আশুতোষ তিন বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। বিদ্যানুরাগী আশুতোষ এই সময় আলস্যে অতিবাহিত করেন নাই। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন :

অপ্রাপ্ত বয়সের জন্য আশুর প্রবেশিকা পরীক্ষায় কালবিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সেই কয়েক বৎসব কলেজ লাইব্রেরির কাগজ-পত্র গ্রন্থ সব তাহাকে অমনি পড়িতে দিত ও দয়ালু প্রিন্সিপাল মিঃ রো বালকের প্রতিভার মর্যাদা বুঝিয়া সাপ্তাহিক ছাত্র সভার অধিবেশনে তাহাকে প্রবন্ধ লিখিতে দিতেন, তাহা অদ্যাপি কালেজ ক্যালেণ্ডারে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেই সভার শাখা সমিতি প্রতি রবিবারে আমাদিগের গৃহে বসিত। বঙ্গ-সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তক সেখানে পাঠ আলোচনা ও সেই সব গ্রন্থের সমালোচনা প্রবন্ধাকারে লিখিত হইত। সভায় সকল সভ্যই ছাত্র এবং আমিই একমাত্র মহিলা সভ্য ছিলাম। মাইকেল, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল ('স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়', কবিতার রচয়িতা) শেলী, বাইরণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিগণের কবিতা মুখস্থ, তাহার অনুকরণ বা কথায় কথায় অনুবাদ করা হইত, ভারত-সঙ্গীত, ভারত-বিলাপ আবৃত্তি চলিত। পিতৃদেব আমাদিগকে সমবেত আত্মীয়গণের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া তাহা বলাইতেন এবং তাঁহারাও একবাক্যে প্রশংসা করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। এই পারিবারিক সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় উপন্যাস, সঞ্জীববাবুর 'কণ্ঠমালা' ও পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী এবং জ্ঞানী অক্ষয়কুমার দত্তজার 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ

বিচার' প্রভৃতির চর্চা ও দুরূহ শব্দের অর্থ করিয়া অধ্যয়নে আশাতীত ফল পাইয়াছিলাম।
এই কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে কিশোর বয়স্ক আশুতোষ সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। তিনি সাধারণীতে লিখিবার জন্য প্রসন্নময়ীকে অনুরোধ করিতে কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন "তাঁহার সেই আগমনে আমরা অপার আনন্দানুভব করিয়াছিলাম।

যথাসময়ে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এক সঙ্গে বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষা দেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন।

এই সময়ে কোনও সান্ধ্য-সম্মিলনে বাঙলার তৎকালীন শাসনকর্তা স্যর এশলি ইডেনের সহিত দুর্গাদাসের সাক্ষাৎ হয়। আশুতোষও সেই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। স্যর এশলি আশুতোষের সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীত হন এবং কোনও কাযকর্ম গ্রহণ করিতে তিনি ইচ্ছুক কি না জিজ্ঞাসা করেন। দুর্গাদাস সবিনয়ে উত্তর দেন, "উহাকে দাসত্ব করিতে দিব না, বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিস্টর করাইয়া আনিব।"

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আশুতোষ বিলাত যাত্রা করেন। আশুতোষ যে জাহাজে বিলাতে যান, সেই জাহাজে রবীন্দ্রনাথও দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন এবং সমুদ্রপথে উভয়ের প্রথম আলাপ হয়। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন :

> আশুর বিলাত যাত্রার সমুদ্রপথে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম আলাপ পবিচয়। ঐ একই জাহাজে তিনি ও তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুত সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীও যাইতেছিলেন। একে স্বদেশীয় তাহাতে উভয়েই সাহিত্যানুরাগী, কাজ কাজেই আত্মীয়তাটা শীঘ্র গাঢ়তর হইয়া উঠে এবং সেই বন্ধুত্বের ভাবি ফল সুখজনক কুটুম্বিতায় পরিণত হয়। ভ্রাতার প্রবাস পথের অধিকাংশ পত্রই রবীন্দ্রনাথের কথায় পূর্ণ হইয়া আসিত।

ইংলণ্ডে গিয়া আশুতোষ কেম্ব্রিজে সেনট জন্স্ কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গণিতে সম্মানের সহিত বি.এ উপাধি লাভ করেন এবং পর বৎসর ব্যবস্থাশাস্ত্রে ট্রাইপস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সাহিত্যানুরাগের জন্য সহপাঠিগণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন এবং কলেজের মাসিকপত্র "ঈগল"-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। কয়েকবৎসর তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত এই পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণকে লইয়া তিনি 'মজলিস' নামক একটি সভারও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং অবসর কালে তিনি ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের চর্চা করিতেন। এই সময়ে রচিত আশুতোষের Savonarola নামক একটি ইংরাজী কবিতা অনেক সাহিত্যরসিক ব্যক্তির নিকট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। কেম্ব্রিজে তাঁহার সহপাঠীগণের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

আশুতোষ যখন কেম্ব্রিজে পড়িতেন, তখন তাঁহার বাল্যবন্ধু 'আর্যগাথা'র কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সিসিটারে কৃষিবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। উভয়েই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন বলিয়া প্রায়ই দুই বন্ধুতে মিলিত হইয়া সাহিত্য চর্চা করিতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলালেরও যৌবনকালে ইংরাজী কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইবার আকাঙক্ষা হইয়াছিল। আশুতোষই "পর ধন লোভে মত্ত" কবিকে "বিফল তপ" পরিহার পূর্বক মাতৃভাষার সেবায় উদ্বোধিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও চরিতকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে এই প্রসঙ্গে আশুতোষ লিখিয়াছিলেন :

> বিলাতে সে (দ্বিজেন্দ্রলাল) প্রথম সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করে। তখনও তাহার প্রতিভার তেমন কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। বরং তাহার লেখা লইয়া কত হাসি-ঠাট্টা করিয়াছি। তাহাতে সে কিন্তু কখনও রাগ বা দুঃখ করিত না। যেটা যথার্থ ভাল হয় নাই, মানিয়া লইত। তাহার দরুন সে ভাল লিখিবে সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করিত। তখন আমিও সাহিত্য চর্চা করিতে ভালবাসিতাম। দ্বিজুকে শেলী ভক্ত আমিই করি। ফরাসী সাহিত্য তাহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। ক্রমে সে কিছু ফরাসীও শিখিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে এই সময়েই তাহার অত্যন্ত অনুরাগের উদয় হয়। একদিন হঠাৎ ইংরাজী কবিতা লিখিয়া লইয়া আমার কাছে উপস্থিত। আমি বলিলাম—'বাঙালির ছেলে ইংরাজী কবিতা লিখিবে কি? তাহার কবিতা আমার ভাল লাগিল না। তাহা কেন ভাল হয় নাই, বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিছুদিন ধরিয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিল ; শেষে আর ইংরাজী কবিতা লিখিব না বলিয়া চলিয়া গেল কিন্তু তার পরেও সে লুকাইয়া লুকাইয়া লিখিত। বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া 'Lyrics of Ind' বলিয়া একখানি কবিতা পুস্তক ছাপায়। দ্বিজু কেমন অসঙ্কোচে পুস্তকখানি আমায় আনিয়া দিয়াছিল, তাহা এখনও মনে পড়ে। সে জানিত যে, আমি তাহাকে পুনরায় কবিতা লিখিতে বারণ করিব। বইখানি দিয়া, আমি কোন কথা বলার আগেই বলিল—পড়ে দেখে গালাগালি দিও।' আমি বলিলাম—'না পড়িয়াই দিব।' যদিও Lyrics of Ind' এর মধ্যে সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে, তবু আমি সর্বদাই তাহার দোষ দেখাইয়া তাহাকে জ্বালাতন করিতাম। সে কখনও কিন্তু এক মুহূর্তের তরেও সেজন্য কোন মুখ-ভার করে নাই।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আশুতোষ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী, হেমেন্দ্রনাথের সরস্বতী-প্রতিম দুহিতা প্রতিভা দেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম আইন অপেক্ষা সাহিত্যের দিকেই আশুতোষের বেশী ঝোঁক ছিল। 'ভারতী'তে আশুতোষ পাশ্চাত্য কবিগণের এবং দেশের রাজনীতিক প্রশ্নাদির যে আলোচনা করেন তাঁহাতে তাহার অপূর্ব পাণ্ডিত্যের ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' আশুতোষই যথোচিত পর্যায়ে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধারযোগ্য :

"দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার জন্য যখন যাত্রা করি তখন আশুর সঙ্গে জাহাজে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্. এ পাশ করিয়া কেম্ব্রিজে ডিগ্রি লইয়া ব্যারিষ্টর হইতে চলিতেছেন। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত কেবল কয়টা দিন মাত্র আমরা জাহাজে একত্র ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল পরিচয়ের গভীরতা দিন-সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। একটি সহজ সহৃদয়তার দ্বারা অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন যে, পূর্বে তাঁহার সঙ্গে যে চেনাশোনা ছিল না সেই ফাঁকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।

"আশু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তখনো ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ের ব্যূহের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া ল-য়ের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। মক্কেলের কুঞ্চিত থলিগুলি পূর্ণবিকশিত হইয়া তখনও স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত করে নাই এবং সাহিত্যবনের মধুসঞ্চয়েই তিনি তখন উৎসাহী হইয়া ফিরিতেছিলেন। তখন দেখিতাম সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনের ভিতরে যে সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার মধ্যে লাইব্রেরি শেলফের মরক্কো চামড়ার গন্ধ একেবারেই ছিল না। সেই হাওয়ায় সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিঃশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন্ একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।

"ফরাসী কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই সকল লেখায় তিনি ফরাসী কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমল-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক্ দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলির মূল কথা।

"আশু বলিলেন, তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব। তাঁহারই 'পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।"

অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে আশুতোষ শীঘ্রই ব্যারিস্টরিতে অসাধারণ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট সাংসারিক উন্নতি ঘটিল বটে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, কারণ অপূর্ব সাহিত্যানুরাগ সত্ত্বেও আশুতোষের অনন্যসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন লইয়া বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হইল না। আশুতোষ তাঁহার

বিরলপ্রাপ্ত অবসরকাল মৌলিক রচনায় নিযুক্ত না করিয়া প্রধানত গ্রন্থপাঠেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে তাঁহার কৃতিত্ব কিরূপ ছিল বর্তমান প্রবন্ধে তাহার পরিচয় প্রদান করিবার স্থান নাই। প্রথম শ্রেণীর ব্যারিস্টরের পরিশ্রমসাধ্য কার্যের উপর, তিনি স্বেচ্ছায় দেশহিতকর নানাবিধ অনুষ্ঠানের সহিত আপনাকে ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন। আশুতোষ 'বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন' নামক সভার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন এবং সভা হইতে দেশের কল্যাণকর নানাবিধ সৎকার্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় তিনি এই সভা হইতে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করিয়া যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা পাঠ করিয়া লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন যে, বিপক্ষ হইতে এরূপ সুলিখিত অথচ তীব্র প্রতিবাদ পত্র তিনি আর প্রাপ্ত হন নাই।

আশুতোষ কংগ্রেসের একজন প্রধান সভ্য ছিলেন এবং অনেকবার উহার অধিবেশনে বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানে আহূত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে আশুতোষ সভাপতি পদে বৃত হন। সভাপতির আসন হইতে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহার প্রারম্ভেই বলেন,—"পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই।" এই বাক্যটি এখন এদেশে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত হইয়াছে। এক বৎসর ধরিয়া ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদকগণ এই বক্তৃতার আলোচনা করিয়াছিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। আশুতোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। সে সময়ে রাজনীতিকগণের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হইয়াছে, নরম ও গরম দলের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। দেশের সেই সঙ্কটকালে স্থিরপ্রজ্ঞ আশুতোষ একতার উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আশুতোষ 'স্বদেশী'র পক্ষপাতী ছিলেন। রাজনীতিক লাভ হউক আর না হউক, সকলের স্বদেশীয় বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হওয়া উচিত ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। স্বদেশীয় শিল্প বিদ্যার উন্নতি এবং জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য আশুতোষ আজীবন চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা বিধায়িনী সভার কোষাধ্যক্ষ, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অন্যতম অধ্যক্ষ এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কিছুকাল উহার সভাপতি ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে তিনি বহুদিন ২৫০্ টাকা মাসিক সাহায্য দিয়াছিলেন। আশুতোষ রিপন কলেজের অন্যতম ন্যাসরক্ষক ছিলেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণকল্পে ২০০০্ টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি পাবনা কলেজের উন্নতিকল্পে এক সহস্র টাকা, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটকে ৫০০্ টাকা, ফেডারেশন হল নির্মাণার্থ ২৫০০্ টাকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র ছাত্রগণকে তিনি মাসে অন্যূন ২০০্ টাকা দান করিতেন। তাঁহার নিকট কোনও প্রার্থী বিফলমনোরথ হইত না।

আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স মহোদয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে আশুতোষ হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন। বারিস্টাররূপে আশুতোষ এই সময়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছিলেন ; বিচারপতির পদ গ্রহণ করায় তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হয়। তাঁহার স্বদেশীয়গণের জন্য একটি অধিকার লাভ করাই তাঁহার এই পদ গ্রহণ করিবার কারণ। তাঁহার পূর্বে কোনও ভারতীয় ব্যারিস্টারকে বিচারপতি নিযুক্ত করা হয় নাই কিংবা অরিজিন্যাল সাইডে (আদিম বিভাগে) বিচার করিতে দেওয়া হয় নাই। বলা বাহুল্য ৮ বৎসরকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে সর্ববিষয়ে দেশীয়দিগের বিচার করিবার যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া তিনি দেশবাসীর গৌরব বর্ধিত করিয়াছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে তিনি বিচারপতির আসন হইতে অবসরগ্রহণ করিয়া পুনরায় বারিস্টারি আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য নির্বাচিত হন। যখন বাসন্তী দেবী প্রভৃতি মহিলাবৃন্দকে অবরুদ্ধ করা হয়, তখন আশুতোষ গভর্নমেন্ট-অনুসৃত নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাসন্তী দেবীকে মুক্ত করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, আশুতোষ মাতৃভাষার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। একবার মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতিসভায় সভাপতিরূপে তাঁহাকে আধুনিক গুরুচণ্ডালী ভাষার নিন্দা ও সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার প্রশংসা করিতে শুনিয়াছিলাম।

আশুতোষ বহুবিধ রচনা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার সুযোগ না পাইলেও, তিনি যে মাতৃভাষার উন্নতিকামী ছিলেন এবং উহার চর্চা করিতেন, তিনি যে বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ছিলেন ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এই জন্য ১৩২০ সালে দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীতে আশুতোষ সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতিরূপে আশুতোষ একটি সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধারযোগ্য :

"নিজের দেশের কথাকেও বিলাতী চেহারা দেওয়া হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট বাজারে পরের জিনিষ লইয়া বেচাকেনা করে, তাহাদের পক্ষে ভাঁড়ানই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য পণ্যজগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করতে চাও, বিলাতী সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর। বুঝি, কথার অভাব পড়ে, ভাষাতে নূতন ভাব বিকাশের সহিত নূতন কথার প্রয়োজন। France এর Academy যেমন নতুন কথার নতুন ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে, আমাদিগের পরিষদেরও সেইরূপ কর্তব্য। একবার বসিয়া বাঙলার অভিধান ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। আর সহ্য করিতে

পারি না আধ আধ ভাষা—সে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজকাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়াছাড়ি দেখিতে পাই—মুখানি, আলা, দিঠি ইত্যাদি। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইব, তরুলতা জাতিযুথী সোনার থালা, সাঁজের বেলা, জোছনা রাতি সবই অতি সুন্দর ; কিন্তু এই সৌন্দর্য উপভোগে ক্লান্তি কি কখনও হয় না? স্বীকার করি বাঙালি কবি এই সৌখীন কাব্য-জগতে অদ্বিতীয়। বাঙলা ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্যজগতে নাই। বাঙালির মুক্তার হার গাঁথা সহজ। তবে জোছনা দেখিতে দেখিতে মনে হয়—বলি, আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে? রাহুর পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদি চন্দ্রকে গ্রাস করিলেন, তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না। আমরা এই অবসরে গঙ্গাস্নান করিয়া লই—আঁধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় নাকি—কি কারণে 'মহাকাব্য' লিখিতে বসিয়া বাঙালি কবি লিখিতে পারিলেন না? তোড়জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে বাঙালি তলওয়ার লইয়া বেহাত হইয়া পড়েন। মাতৃদুগ্ধ পিপাসু বালিকার হৃদয়ের দুলাল দুধে আলতা দেওয়া সরস ভাষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেই রাইরাজা। আমাদের কবি শৈশব যৌবনের মিলনের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ, সন্ধিস্থলে মোহমুগ্ধ হইয়া কতদিন যাপন করিবে? তোমাকে মদন-মনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না, এই বেশে তুমি অতি সুন্দর, স্বীকার করি ; আমার বিশ্বাস যে, তুমি অন্য বেশেও সুন্দর। তোমার মত ধীশক্তি জগতে বিরল ; তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে ; তুমি সরস্বতীর বরপুত্র। তবে রতি-মন্দিরে দিনযাপন করিও না। সহস্র নির্ঝর প্রসূত মন্দাকিনী বারি-বিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে।

"সুকুমার সাহিত্যে বাঙালির বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে সুকুমার সাহিত্য, যে সাধনার কথা আমি বলিলাম তাহার উপযোগী নয়। যেমন চন্দ্রালোক সুন্দর। প্রচণ্ড সূর্যালোকও সুন্দর। চন্দ্রালোকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উদ্ভবের জন্য রৌদ্রতেজের প্রয়োজন।"

আশুতোষ কিছুকাল সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

এই স্থানে একটি ব্যক্তিগত কথা উল্লেখ করিব। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গাব্দে) 'মানসী ও মর্মবাণী'তে আমি রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিতের আলোচনা করিতেছিলাম। একদিন আমার কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে আশুতোষ আমার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শুনিয়া আনন্দিত

হইলাম। কিছুদিন পরে সেই বন্ধু আমাকে নিমন্ত্রণ করেন কিন্তু অসুস্থতাবশত আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসমর্থ হই। পরে একদিন শুনিলাম ঐদিন আশুতোষ আমার সহিত আলাপ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে স্যর আশুতোষের সহিত কয়েকবার আমার সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার শিষ্টাচার ও অমায়িকতায় আমি মুগ্ধ হই। আমার অপর একজন শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিতের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলে, আশুতোষ সানন্দে ঐ অনুরোধ পালন করিতে স্বীকৃত হন এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও যথাসময়ে প্রতিশ্রুত ভূমিকাটি প্রেরণ করেন।

তিনি যে কিরূপ মাতৃভাষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এই ঘটনায় তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম।

প্রায় দুই বৎসর হইল আশুতোষ তাঁহার প্রিয়তমা সাধ্বী সহধর্মিণীকে হারান। এই দুর্বিষহ শোক তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যে সহ্য করিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি কয়েক মাস হইল চিকিৎসকগণের পরামর্শে ওয়াল্‌টেয়ারে বায়ু পরিবর্তনার্থ গমন করিয়াছিলেন। কয়েক মাস পূর্বে তাঁহার পরম স্নেহময়ী জননীকে হারাইয়া আশুতোষ আরও কাতর হইয়া পড়েন। দ্রুতগতিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। কলিকাতায় বালিগঞ্জের বাটীতে তিনি পুনরানীত হন। এই স্থানেই চিকিৎসকগণের সকল চেষ্টা এবং আত্মীয় স্বজনদিগের প্রাণপণ সেবা বিফল করিয়া ৯ জ্যৈষ্ঠ ২৩ মে (১৯২৪ খৃষ্টাব্দে) শুক্রবার প্রাতে চিরানন্দময় আশুতোষ আনন্দলোকে চলিয়া গেলেন। দেশের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি, এমন কি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত, শ্মশানে আশুতোষের মৃতদেহের অনুগমন করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছিলেন।

আশুতোষ কর্তব্যপরায়ণ সন্তান, প্রেমময় স্বামী এবং স্নেহশীল পিতা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহও অতুলনীয় ছিল। দেশের অলঙ্কারস্বরূপ ভ্রাতৃগণ আশুতোষের অভিভাবকত্বেই কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন ; ইঁহাদিগকে আশুতোষের সজীব কীর্তিস্তম্ভ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। আশুতোষের দ্বিতীয় ভ্রাতা বিখ্যাত রাজনীতিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নাম বাঙলাদেশে কাহার অপরিচিত? তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী কেবল খাতনামা ব্যারিষ্টর নহেন, তিনি প্রসিদ্ধ শিকারী। তাঁহার "ঝিলে জঙ্গলে শিকার" নামক গ্রন্থ বোধ হয় বাঙলা ভাষায় এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ গ্রন্থ। চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর নাম আধুনিক পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত। তাঁহার মৌলিকতা, সূক্ষ্মসমালোচনাশক্তি এবং অননুকরণীয় সরল 'বীরবলী' ভাষা তাঁহাকে আধুনিক লেখকগণের মধ্যে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে। আশুতোষের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ লেফটেনান্ট কর্নেল মন্মথনাথ, ডাক্তার সুহৃদনাথ এবং ব্যারিস্টার অমিয়নাথ নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। আশুতোষ চারিজন সুযোগ্য পুত্র—শিল্পী

আর্যকুমার, ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার, ক্রীড়াজগতে সুপ্রসিদ্ধ শিবকুমার ও বার্লিনে শিক্ষার্থী দেবকুমার এবং একটি মাত্র কন্যা শ্রীমতী অশোকা দেবীকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী লীলা দেবী বাঙলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

আশুতোষ অত্যন্ত ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহুকাল আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি ছিলেন এবং উক্ত সমাজের উন্নতিবিধানে আজীবন যত্নশীল ছিলেন। শিল্প ও সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতির জন্যও আশুতোষের আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইত এবং এই বিষয়ে তাঁহার সুযোগ্য সহধর্মিণীর সহিত বহু প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। আশুতোষ তাঁহার চরম পত্রে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহার সযত্ন সংগৃহীত মূল্যবান পুস্তকগুলি, সঙ্গীতসঙ্ঘকে পাঁচহাজার টাকা ও বাদ্যযন্ত্রাদি এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গ্রন্থাগারের জন্য পাঁচহাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

বাঙালি ব্যারিস্টারদিগের মধ্যে বোধ হয় আশুতোষই সর্বপ্রথমে দেশীয় ধুতি ও চাদর পরিধানপূর্বক প্রকাশ্য সভাদিতে যোগদান করিয়া, দেশীয় পরিচ্ছদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আশুতোষ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গভীর দেশানুরাগ, মধুর চরিত্র ও উদার হৃদয়ের কথা বহুদিন বঙ্গবাসীর স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি জীবন-প্রভাতে আশুতোষের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল তাহারই প্রথম পংক্তিদ্বয় আজ স্মরণ হইতেছে :

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই!"

আশুতোষ জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মৃত্যু আজি তাঁহাকে অমরতা দান করিয়াছে। তাঁহার গৌরবময় জীবনের স্মৃতি চিরদিন তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে জীবিত থাকিবে।

নির্ঘণ্ট